ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭

পাণ্ডুলিপি ঃ অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী

শ্রীসন্তোষ বাগচি

বন্ধুবরেষু

দেশের নাম বিলাত নয়। ইংলণ্ড বলাও ঠিক হবে না। সরকারী ভাবে বললে বলা উচিত—ইউনাইটেড কিংডম। অথবা —গ্রেট ব্রিটেন। উননব্বুই হাজার আটত্রিশ বর্গমাইলের এই দ্বীপপুঞ্জকে অতঃপর 'গ্রেট' বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, তবে শোনা যায় দ্বীপবাসীদের এখনও আন্তরিক বিশ্বাস তাদের দেশের চতুঃসীমা স্বয়ং 'ঈশ্বর কর্তৃক সুনির্দিষ্ট !'

সে দেশের আর এক ডাকনাম ইদানীং—'লিটল ইংল্যাণ্ড।' ছোট্ট দেশ, কিন্তু মস্ত রানী। রানীর নাম—দ্বিতীয় এলিজাবেথ ;— হার মোস্ট গ্রেসাস ম্যাজেস্টি, এলিজাবেথ ২, বাই দি গ্রেস অব গড, কুইন অব দি ইউনাইটেড কিংডম অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়র্ল্যাণ্ড, অ্যাণ্ড হার আদার পজেশনস অ্যাণ্ড টেরিটোরিস, হেড অব কমন-ওয়েলথ, ডিফেণ্ডার অব ফেথ, সভারেন অব দি ব্রিটিশ অর্ডারস অব শিভ্যালরি·· ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর নামেই জয়ধ্বনি— 'গড সেভ দি কুইন।' দেশের টাকায় তাঁর ছবি, ছবি ডাক-টিকিটে। সরকারী খামের ওপরে লেখা থাকে 'অন হার ম্যাজেস্টিস সার্ভিস।' মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজদূত, রাজকর্মচারী সবাই 'হার ম্যাজিস্টি'র সেবক। তাঁর 'ইচ্ছা'ই সব। অথচ তিনি নাকি শাসন করেন না, রাজত্ব করেন মাত্র! তবু রানী যখন রাজধানীতে অনুপস্থিত তখন শহরের মন নাকি কেমন-কেমন করে। বাকিংহাম

প্যালেসে ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে দেখলে তবেই দেশের মন দেশে ফেরে।

রানী সাহেবার প্রধান উজির তখন জেমস হ্যারল্ড উইলসন। এই মুহূর্তে অবশ্য সে আসনে উপবিষ্ট অন্য মানুষ,—এডোয়ার্ড হীথ। উইলসন দল পরিচয়ে 'শ্রমিক'। সেকালে হলে বলা যেত—'রাউণ্ডহেড', কিংবা 'হুইগ।' ইওর্কশায়ারের জনৈক কেমিস্ট-তনয় উইলসন একুশ বছর বয়সে অক্সফোর্ডের 'ডীন' হয়েছিলেন। মন্ত্রী হয়েছিলেন প্রথম একত্রিশ বছর বয়সে। উত্তর চল্লিশে প্রধান-মন্ত্রী। তিনি কথা বলেন কম। যা বলেন তাও অক্সফোর্ডের ভঙ্গীতে, অর্থাৎ চিবিয়ে চিবিয়ে, আধো আধো ভাষায়। সুতরাং, সব সময় নাকি বোঝা যায় না, সত্যিই তিনি—হুইগ, অথবা ছদ্মবেশী-টোরি! পাইপের ধোঁয়া সংশয়কে নাকি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন—উইলসন অঙ্ক জানেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বে সেটা ইদানীং গুরুতর ব্যাপার। কেন না, নেপলিয়ন যাঁদের বলেছিলেন 'দোকানীর জাত', আজও তাঁরা মুখ্যত তাই। জনৈক লর্ড সরাসরিই কবুল করেছিলেন—'না, লেবার পার্টির নৈতিকতাবোধ নিয়ে আমাদের চলবে না; কেননা আমরা ব্যবসায়ীর জাত, আদর্শবাদ আমাদের পক্ষে সৌখিনতা।' কেউ কেউ অতএব দেশের ভেতরেও পরিবর্তনে অনিচ্ছুক ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ছোট থেকে বড় হওয়া উত্তম কথা, কিন্তু বলি, সবাই যদি বড় হয়ে যায় তবে খনিমজুর, বাস ড্রাইভার, পয়ঃপ্রণালী সাফাইকারী এসব জোগাবে কে?' বেকার সমস্যার মীমাংসায়ও সকলে সমান উৎসাহী ছিলেন না। কেননা, 'দেখা গিয়েছে হাসপাতাল বাড়ালেই রোগী বাড়ে, পাগলের হাসপাতাল বাড়ালে পাগল বাড়ে। সুতরাং, বেকার ভাতা দিতে শুরু করলে বেকারও বাড়বে। তার চেয়ে লাখ কুড়ি বেকার দেশে রেখে দেওয়া ভাল, তাতে ধর্মঘটের সম্ভাবনা কমবে।' বস্তি উপলক্ষে

আর একজনের উক্তি—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুনিয়ায় বৈপরীত্যের প্রয়োজন আছে, এতদ্দেশে সেটা বস্তিই দেখাতে পারে।' এইসব বিশ্বাসীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করে শ্রমিকদল নতুন দেশ গড়ে তুলছেন। দেশে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট।' সে-স্টেটের পুরোভাগে তখন উইলসন। রানীমায়ের সাড়ে পাঁচ কোটি প্রজা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

প্রজারা জাতি পরিচয়ে ইংরাজ। অন্তত বাইরের মানুষ তাই জানেন। কে প্রকৃত ইংরাজ, কে স্কচ,—এসব গোত্রবর্ণ ক্রমে বোঝা যায়। ইংরাজকে আমরা দীর্ঘ দু'শ বছর ধরে দেখেছি। কিন্তু ভারতের ইংরাজ আর বিলাতের ইংরাজ নাকি ঠিক এক বস্তু নয়। কে একজন বলেছিলেন—দেশের বাইরে ইংরাজ মহাকাশচারীদের মত। মহাকাশচারী যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় থাকেন না, ঠিক তেমনিই স্বদেশের বাইরে ইংরাজও সর্ব নিয়ম নীতির উর্ধে। বন্যরা যেমন বনে, সাহেব মেমরা দর্শনীয় তেমনই ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে,—আপন দেশে।

হার্লে স্ট্রীটের হাসপাতালে একজন সার্জন জনৈক ইংরেজের মাথা খুলে তার মধ্যে যা পেয়েছিলেন 'মেজর টমসন' সগৌরবে বিশ্ববাসীর হাতে সে-ফর্দটি তুলে দিয়ে গেছেন। তাতে ছিল : হার ম্যাজেস্টির কিছু রণতরী, একখানা ওয়াটার প্রুফ, একটি রাজমুকুট, এক পেয়ালা চা, একটি পরদেশ, একজন পুলিসম্যান, প্রাচীন এক গল্ফ ক্লাবের নিয়মাবলী, ভূমধ্যসাগরীয় টাইমটেবিল, এক বোতল স্কচ হুইস্কি, একজন গার্ডসম্যান, একজন হাসপাতাল নার্স, একটি ক্রিকেট বল, কিছু কুয়াশা, এমন একটুকরো জমি সেখানে কখনও সূর্য অস্ত যায়না···এবং কালো মোজা পরিহিতা একটি স্কুল বালিকা।

এ-ফর্দ, বলা নিষ্প্রয়োজন, পরিবর্তিত। যে-জমিতে সূর্য অস্ত যায় না—তা আজ ইংরাজের মাথায় খুঁজে পাওয়া ভার। সাম্রাজ্য নেই, তার বদলে এসেছে নতুন এক শব্দ,—কমনওয়েলথ। সেটা

ঠিক কী বস্তু, ইংরাজ নিজেও তা জানে না। একজনের পরামর্শ—'রাশিয়ানরা চমৎকার লড়িয়ে। আমাদের উচিত রাশিয়াকে ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ-এর সদস্য করে নেওয়া। তাতে রুশ বীরত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।' এম্পায়ার সম্পর্কে কিন্তু ইংরাজের ধারণা ছিল অনেক স্পষ্ট। 'ঈশ্বরের পরেই মানব কল্যাণের ভরসা এম্পায়ার,—সাম্রাজ্য।' জনৈক যাজকের উক্তি: বাইবেল যেমন ঈশ্বরের রচনা, সাম্রাজ্যও তেমনই। তবে বাইবেল লিখতে শ্রীভগবানের যত সময় লেগেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে ঠিক তত সময় ব্যয় করতে হয়নি,—এই যা। অনেক 'সৎ' ইংরাজেরও নাকি বিশ্বাস, সাম্রাজ্য 'অন্যমনস্ক ভাবে' হাতে তুলে নেওয়া। ওঁরা মার্কস-লেনিনকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না; ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ—এ সবের কী তাৎপর্য ওঁদের মাথায় নাকি তা ঢোকে না। মেজর জেনারেলের ডানস্টারভিল-এর বক্তব্য: বস্তুত দেশে দেশে আমাদের যত জমিদারী জিম্মাদারী তা আপনা থেকেই কোলে এসে আছড়ে পড়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য হাত বাড়াতে হয়েছে, কিন্তু সে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে। সেই সাম্রাজ্য বেহাত হয়ে গেছে। ইংরাজ কি এখনও অন্যমনস্ক? অন্তত ওঁরা নিশ্চয় এটা জেনে গেছেন—'এম্পায়ার বিল্ডিং'-এর কাজে ছেলেদের আর 'কলোনি'তে পাঠানো যাবে না।

তা সত্ত্বেও ইংরাজ এখনও নাকি ইংরাজ,—রাজার জাত। ওঁরা বিশ্বাস করেন—'ঈশ্বর ইংলিশম্যান।' এবং তিনি বিশ্ব-ক্রীড়ায় রেফারি নন, বস্তুত হোম টীমের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। ঈশ্বর যখন কোনও কঠিন কাজ করিয়ে নিতে চান তখন প্রিয় ইংরাজদের হাতেই অর্পণ করেন সে-দায়িত্ব। তবে তাঁর সম্পর্কে মনে যে আদৌ কোনও খটকা নেই সাহেবরা বুক ঠুকে তা বলতে পারেন না। একজনের প্রশ্ন: আদম এবং ইভ দু'জনেই ফর্সা ছিলেন, তবে কালোরা এল কোথা থেকে?

সে যা হোক, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ইংরাজ এখনও আর সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র। পাঁচজনের ভিড়েও তাঁকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না। ফ্লানেলের ছাঁট দেখেই নাকি বোঝা যায় তিনি ইংরাজ কিংবা অ-ইংরাজ। সনাক্তিকরণের অন্য উপায়গুলোও নাকি এখনও সমান কার্যকর। গোঁড়ামি, বনেদীয়ানা, দেশপ্রেম, নিয়মনিষ্ঠা, ক্রিকেট এবং চা-আসক্তি—এখনও সমান তেজী নাকি এই সব লক্ষণ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ইংরাজ এখনও চা পান করেন। ইচ্ছে করলে বাংলা-আসাম-সিংহলের বাগিচার সব চা ওঁরাই নিঃশেষ করে দিতে পারেন। এক খাদ্য খবর,—'নিউজ'; আর এক এই চা। ভোরে চা, ব্রেকফাস্টে চা, লাঞ্চে চা, অফিসে চা, চায়ের সময় চা, শোয়ার সময় চা। গড়ে সাহেব মেমদের জীবনের চার বছর কাটে নাকি চায়ের পেয়ালার সামনে। ক্রিকেটের নেশাও সমান তীব্র। তীব্র ফুটবলের আকর্ষণ। হেরে গেলে মন খারাপ, জিতে গেলে আনন্দে আত্মহারা। ক্রিকেট উপলক্ষে, এমন কি—কোন্‌টা ক্রিকেট, কোন্‌টা নয়, সে জ্ঞানও সব সময় থাকে না। যথা: দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে এম-সি-সির ক্রীড়া বাসনা। উইলসন পর্যন্ত কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন—এটা ক্রিকেট নয়।

গোঁড়ামি, বনেদীয়ানা—এ সবেও ঘাটতি নেই। অনেক ইংরাজের বিশ্বাস অ্যারিস্টোক্র্যাসি বস্তুটি প্রাকৃতিক। একজন টোরি নায়ক বলেন—আশেপাশে লাখপতিরা আছে শুনলে আমার খুব ভাল লাগে। তিনি সুখ্যাত ইনক পাওয়েল। লক্ষপতিরা তাঁর কাছে 'মনোরম সূর্যাস্তের মত, দেখেও সুখ!' আর একজনের কথা,—কতজন দশলাখপতি আছে তা-ই গুণে আমি বলব এই শহর বা ওই কাউন্টির অবস্থা কেমন! অ্যারিস্টোক্র্যাটদের রীতিনীতি আলাদা। সে-সব যথা সময়ে বলা যাবে। আপাতত দু'একখানা নমুনা। লর্ড হিউম-এর

ধাত্রী সগর্বে জানিয়েছেন—স্যার অ্যালেক-এর বয়স যখন এক বছর তখন থেকেই তাঁকে ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করা হচ্ছে! আর এক বনেদী সাহেব, ডানকান স্যাণ্ডসকে তাঁর বাবা একুশতম জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন একজন ভারতীয় ভৃত্য! লেডি লিনলিথগো ভারতযাত্রার আগে একশ' ঘণ্টা কাটিয়ে ছিলেন নাকি ওয়েস্ট এণ্ড-এ, ওস্তাগরের ঘরের আয়নার সামনে। পোষাকে ভারত জয়ের বাসনা ছিল তাঁর। সে সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লুপ্ত একথা বলা যায় না।

'কর্ণেল ব্রাম্বল' এখনও আছেন, বই কি। উক্ত কর্ণেলের কাছে ফরাসীরাও ছিলেন নাকি 'নেটিভ।' লণ্ডনের বিমান বন্দরের অবশ্য 'এ্যালিয়েন' এই শব্দটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদেশীরা একালে—'ভিজিটার', 'ট্যুরিস্ট',—পাউণ্ড শিলিংয়ের খুব টানাটানি পড়লে কখনও কখনও 'ডিস্টিঙ্গুইশড ফরেনারস'। অবশ্য কালোদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা নাকি ইদানীং সবাই 'ইমিগ্র্যাণ্ট' বলে গণ্য! তবে বাহ্যিক ব্যবহারে তারতম্য ঘটলেও সাদাকালো নির্বিশেষে পরদেশী নাকি ব্রিটেনে বরাবরের মতই পরদেশী। জর্জ মিকেস-এর নায়িকার মতই অনড় ব্রিটেনের জাতীয়তাবোধ। মেয়েটি তাঁর হাঙ্গেরিয়ান প্রণয়ীকে বলেছিল—তোমার কাছে আমি বিদেশিনী? —সে কেমনতরো কথা? বিদেশী তো তুমি, আমি ইংরাজ।—বুদাপেস্টে হলেও তাই বলতে পারতে কি?—কেন পারব না? উত্তর দিয়েছিল নাকি মেয়েটি,—ট্রুথ ডাজ নট ডিপেণ্ড অন জিওগ্রাফি! এদেশে যা সত্য, হাঙ্গেরীতেও তা-ই সত্য। এমন কি বোর্নিওতেও তার কোনও নড়চড় হয় না।

'কর্ণেল ব্রাম্বল'-এর মত আছেন এখনও ডেভিড লো'র 'কর্ণেল ব্লিম্প' এবং অন্য 'জেণ্টলম্যান' বা ভদ্রজনেরা। ডরসেট আর কর্ণওয়াল-এর শান্ত পরিবেশে ভূতপূর্ব সাম্রাজ্য সেবকদের সংখ্যা

হয়তো আজ গোনাগুনতি, কিন্তু অন্যভাবে বেঁচে আছেন তাঁরা এখানে ওখানে সর্বত্র। তাঁরা এখনও মানুষের চেয়ে কুকুরের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন বেশী, এবং দৈবাৎ কখনও মানুষের কাছে মুখ খুললে আলোচনা প্রধানত আবহাওয়া-সংক্রান্ত রাখতে পারলেই খুশী। নিঃশব্দ আহারের মত, নিঃশব্দ কথোপকথনেও ইংরাজের এখনও জুড়ি নেই। গোরাদের দেশে অভাব নেই সনাতন-পন্থী গোঁড়ার। তাঁরা এখনও নতুন চকচকে কিছু দেখলে সন্দেহের চোখে তাকান, মনে মনে ভাবতে চান—মেকি। প্রয়োজনের চেয়ে কোনও বিষয়ে বেশী জানা তাঁদের কাছে অবান্তর, অতএব—অসঙ্গত এবং অশোভন। সুতরাং—বিশেষজ্ঞ মানেই 'বিপজ্জনক।' ওঁরা যুক্তিবাদী হতে চান, কিন্তু কিছুতেই সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন না? ওঁদের এখনও নাকি বিশ্বাস 'সতী' একমাত্র সেই মেয়েরাই যারা হিম-শীতল, এবং পরস্ত্রীগমন নামক ব্যাপারটা কিছুতেই দিবাভাগে সংঘটিত হতে পারে না।

ওঁরা বাগান করতে ভালবাসেন। কৃষিকর্ম এবং পশুপালনেও ওঁদের বিলক্ষণ উৎসাহ। দেশপ্রেমেও ওঁরা অতুলনীয়। ট্রাফলগারের যুদ্ধে নেলসনের ধ্বনি ছিল-- 'ইংল্যাণ্ড এক্সপেক্টস দ্যাট এভরিম্যান উইল ডু হিজ ডিউটি।' ওঁরা এখনও সে আহ্বানে সাড়া দিতে রাজি, শুধু জানেন না এই মুহূর্তে কর্তব্য কী। ফাঁকা আওয়াজে ওঁদের আস্থা কম, নিজের হাতে সে-মাটিতে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াতে পারলে তবেই ওঁদের কাছে কোন নতুন দ্বীপের অস্তিত্ব। আপাতত সে সুযোগ অনুপস্থিত। তবু দেশপ্রেমিকদের কথা মনে রেখেই হয়তো আপৎকালে খেলার মাঠে কাতর-বার্তা লিখিত হয় স্কোরবোর্ডে: ইংল্যাণ্ড ইন ডেনজার। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আর্তনাদ— 'ইংল্যাণ্ড'স ডেসপারেট পজিশন।' দ্বিতীয় ছত্রে চিরকালের ইংরাজকে টেনে তোলার চেষ্টা: ইন স্পাইট অব ৬-৩ বি প্রাউড অব ইংল্যাণ্ড!

ওঁরা দেশকে ভালবাসেন। দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও ওঁরা শ্রদ্ধাশীল। বিশেষত সেই অলিখিত কানুনগুলো সম্পর্কে। সব সময় 'কারেক্ট' থাকা চাই,—নির্ভুল; এবং সব সময়—'ফেয়ার।' ইংরাজ খুনীকেও যদি কেউ সাহস করে বলে বসেন—এটা 'আনফেয়ার', নিতান্তই অসঙ্গত, তবে নাকি তার হাতের পিস্তল খসে পড়বে। ওঁরা অতএব নবকাল সম্পর্কেও যথাসাধ্য 'ফেয়ার' থাকবার চেষ্টা করছেন। কর্ণেল ব্লিম্প বলেছিল—'গ্যাড, সার, রিফর্মস আর অল রাইট এজ লং এজ দে ডোণ্ট চেঞ্জ এনিথিং।' এঁদেরও একই বক্তব্য; বিশ্ব যদি পালটে গিয়ে থাকে তবে সেটা বিশ্বের দায়িত্ব, ব্রিটেন তো আর তার জন্য নিজেকে পালটাতে পারে না। একজন সরাসরি বলে দিলেন—আমরা দশমিক প্রথা গ্রহণ করব কেন, ওই ব্যবস্থা যারা অঙ্কে কাঁচা তাদের জন্য। আমাদের বাস কনডাক্টারও জানে কয় পেনিতে এক শিলিং!

তবু পালটাচ্ছে। শুধু পাউণ্ড-শিলিং-পেনস এর ধারাপাত নয়, অতি দ্রুত পালটাচ্ছে গোটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জীবনধারা। এমন কি সাহেবদের দৃষ্টিভঙ্গীও। না-তাকিয়ে মনে মনে মেয়েদের দেখা যে দেশে চিরাচরিত প্রথা, নিজের চোখে দেখে এলাম সে দেশে সাহেবরা সরাসরি মেমদের দিকে তাকাচ্ছেন। এবং একথা অস্বীকার করার উপায় নেই,—মেমরাও ইদানীং সত্যিই দর্শনীয়!

দর্শনীয় শুধু মেয়েরাই নন, পুরুষেরাও। তাদের কথা পরে। 'লেডিজ ফার্স্ট',—মেয়েদের কথাই আগে বলি।

মাথায় এলো চুল আর থেলো-টুপি, অঙ্গে বেঢপ গাউন, পায়ে সমতল-তল-বিশিষ্ট জুতো চাপিয়ে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী যে মেমরা থপথপ এই কলকাতার পথে হেঁটে বেড়াতেন তারা আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। হঠাৎ দেখলে চেনাই যায় না যেন। ওঁরা এখন ফরাসী মেয়েদের মত পোষাক পরেন, আমেরিকান মেয়েদের মত প্রসাধন করেন। তাতেও খুশি না হয়ে নিজেরাই মিনি-স্কার্ট চালু করেন। টুপি বিদায় নিয়েছে, হাই-হিল এসেছে, নানা ছাঁদে ছাঁটা হচ্ছে সোনালি চুল। আর প্রসাধনী? তার কথা না তোলাই ভাল। একালের ইংরাজ মেয়ের রূপের ঝাঁপিতে নাকি থাকে: ক্লিনীং লোশান, তুলো, টিস্যু, টুথব্রাস, টুথপেস্ট, নেল ব্রাস, সাবান, নানা সাইজের খান তিন কাঁচি, নানা ধরণের কিছু ট্যাবলেট, আইলোশান, আই বাথ, ভিত্তি স্থাপনোপযোগী স্নো, পাউডার, একটি আয়না, একটি চিরুণী, মেক আপ ব্রাশ, আই শ্যাডো, ম্যাসকারা, আরও গোটা দুই বুরুশ, লিপস্টীক, লিপ ব্রাশ, কলনের জল, জামা-কাপড়ের বুরুশ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক সময় এই সাজ ঘরটি নাকি ওঁরা বহন করেন হাতের ব্যাগে!

মেমরা একালে শুধু তন্বী, ফর্সা আর দীর্ঘা নন, ওয়েলফেয়ার স্টেটের কল্যাণে তাঁদের দৃষ্টি এবং দন্তরাজিও উজ্জ্বলতর।

কালিদাসের নায়িকা যেন,—তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা। 'শ্যামা' কিন্তু কালো নয়, সংস্কৃতে 'শ্যামা' নাকি উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। বিবিজান চলে যান লবেজান করে—এ উক্তি একালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্তত সাহেবদের তা-ই অভিমত। তাঁরাও আর না-তাকিয়ে পারছেন না।

পালটে গেছেন সাহেবরাও। হয়তো প্রাণের দায়েই। তাঁরাও আজ অঙ্গে তুলে নিচ্ছেন ইতালির স্যোয়েটার, ভিয়েনার জ্যাকেট, সুইস জুতো। পাইপের ফাঁকে ফাঁকে মুখে তাঁদের ফরাসী সিগারেট।

দর্শনীয় তার পরেও অনেক। সবই অন্যরকম, সবই নয়নাভিরাম, সবই চমকপ্রদ। অতএব ওঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসে বলে না দিলে চট করে বোঝার কোন উপায় ছিল না। সার সার মোটর, নাইলন-এর ফিতের মত মসৃণ পথ, সবুজ পারক, অজস্র টিউলিপ, সাজানো কাউনসিল হাউস; মিনি-স্কার্ট, কটন-শার্ট, গালে গাল ঠেকিয়ে হাঁটা, অনুচ্চ স্বরে আন্তরিক ভদ্রতা; হাসি, করতালি, স্বাস্থ্যবান নর-নারীর মিছিল। শুধু কি তাই? আন্ডার গ্রাউনড-এর দেওয়ালময় চোখ-মাতানো বিজ্ঞাপন, দোকানে দোকানে কেনাকাটার পরব, 'পাব'-এ পিপে পিপে বীয়ার, পাড়ার মুদি-দোকানে চাল-ডাল-তেল, মাছ-মাংস-ডিম, রুটি-মাখন-চীজ—যত খুশি। তার ওপর শেষ রাত্রি অবধি গীটার বাদ্য, আলো-আঁধারে মায়াবিনীর খেলা, ফাঁকা লাইট-বাস-এ চড়ে, উষ্ণ ঘরে ফেরা। পাউণ্ড সত্যিই সুন্দর ছাপা,—হাফক্রাউন বেশ ওজনদার। গরিব দেশের আগন্তুক, কোন মতে ডাল-ভাতে মানুষ তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করে না। জানা ছিল বটে ব্রিটেন আর তেমনটি নেই, সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে আজ বেশ কিছুদিন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা ছিল—ব্রিটেন এখনও একটি জীবিত ওয়েলফেয়ার স্টেট। সেখানে ২৫০ লক্ষ লোক যদি কাজ করেন তবে তার মধ্যে ৯০ লক্ষ গড়ে সপ্তাহে রোজগার করেন প্রায়

২৫ পাউণ্ড। দেশের তিন ভাগের এক ভাগ কর্মী নিজের ফ্ল্যাটে থাকেন, নিজের গাড়িতে চলা ফেরা করেন, শতকরা ৮০ জনের ঘরে টেলিভিশন-সেট আছে, শতকরা ৫০ জনের ঘরে আছে ওয়াশিং মেশিন, ২৫ জনের নিজস্ব ফোন। ওঁরা প্রত্যেকে গড়ে বছরে ২২৫ পাঁইট বীয়ার পান করেন। (চীয়ারস!) আরও জানা ছিল, দ্বীপপুঞ্জব্যাপী বেকারি নামে মাত্র। দেশে এমন এলাকাও আছে যেখানে ১০০ বেকারের সামনে ১৫৪টি কর্মখালি ঝুলছে। সুতরাং, মনে মনে ওয়েলফেয়ার স্টেট-এর নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতেই আমি ব্রিটেন এর মাটিতে পা ঠেকিয়েছিলাম। 'ফেয়ারওয়েল স্টেট' শব্দটা তখনও আমল দিইনি।

বাদ সাধলেন ওঁরাই। প্রতি তিন পা অন্তর প্রশ্ন—কী, কেমন দেখলে?—আশা আছে কোনও? সাংবাদিক, হোটেল মালিক, ল্যাণ্ডলেডি তথা বাড়িওয়ালী, চেম্বার অব কমারস প্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারী—সকলের এক জিজ্ঞাসা। ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা কেমন, 'ফেমিন'-এর অবস্থা কী, চাইনীজরা আবার আসবে কিনা—ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে সে-ই এক কথা,—আমাদের কেমন দেখছ? আবহাওয়া নয়, নিজের বাগান অথবা কুকুর নয়, সাহেব নিজের দেশের কথা জানতে চান বিদেশীর কাছে। যেন শয্যাশায়ী মুমূর্ষু রোগী ঘরে, ডাক্তার এসেছেন দেখতে! এ চমক কখনও কখনও চরমে। 'সানডে টাইমস'-এ মজাদার প্রবন্ধ—'ব্রিটেন-এর দাম কত?' পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন বন্ধু ইংরাজ সাংবাদিক।—কী, কিনতে চাও বুঝি! তারপরই দীর্ঘশ্বাস,—হ্যাঁ, আজ যে কেউ তা পারে!

অতএব বাধ্য হয়েই অন্যভাবে তাকাতে হল। এবং তাকানো মাত্র সে যেন সত্যিই এক অন্য কোন ব্রিটেন। আমার মনে হল কাউনসিল হাউস ঘিরে সার সার ইটের রঙের ভিক্টরীয় বাড়িগুলো আমি মনোযোগ দিয়ে দেখিনি, যে পাঁচজন সাংবাদিক বন্ধুর বাড়ি

গিয়েছি তাঁদের মধ্যে তিনজনের নিশ্চয় টেলিভিশন নেই,—একজনের ঘরে এখনও চিরাচরিত ফায়ার প্লেস কেন? আরও মনে পড়ল সেদিন 'পাব'-এ যে বুড়ো কলকাতার একটি সিনেমা হল-এ 'পিকচার' দেখার গল্প বলছিল সে হাসছিল না, দোকানের সামনে একজন বুড়ি আমাকে থামিয়ে একটা সিগারেট চেয়েছিল, এবং অনেক ভদ্রতা শেষে একজন একদিন একটি শিলিংও চেয়েছিল। ইসট এণ্ড হঠাৎ আমার কাছে এণ্টালির 'বস্তি', সেখানে এখনও লোকেরা যুদ্ধের আমলে তৈরি 'অস্থায়ী' কুটিরে বাস করে দেখে আমি দুঃখিত। কলকাতার বস্তির তুলনায় অবশ্য সেগুলো স্বর্গ।

সূর্যালোকের আশ্চর্য ক্ষমতা সত্যকে গোপন করার। কিন্তু জুনের ঝকঝকে রোদ্দুরে চলতে চলতে আমার মনে হল, গ্লাসগো বিবর্ণ, কারখানার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও মিডল্যানড এখনও 'ব্ল্যাক কান্ট্রি'—শেফিলড-এর ইস্পাতের কারখানাগুলো বড়ই সেকেলে। মিশ্র ধাতু তৈরীর আধুনিক কারখানাটি চমকপ্রদ অবশ্যই, কিন্তু বাদ বাকি ইস্পাত নগরী কেমন যেন ধূলি মলিন,—শহর ছায়া ছায়া, বিষণ্ণ। সমালোচককে সেখানেই থামানো গেল না। প্রভূত সৌজন্য, আতিথেয়তা এবং বদান্যতার পরেও কয়লার এঞ্জিন-এ টানা রেলগাড়ি আমাকে দুঃখিত করেছে, ট্রেন-এর সময়-জ্ঞানহীনতা কখনও কখনও বিস্মিত করেছে। এবং তামাম ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে আসার পর মনে হয়েছে—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে কিছুক্ষণ হেঁটে এলাম। দু'পাশে অগুণতি বাগানবাড়ি, অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি;—একদা এখানেই শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল বটে, কিন্তু সে কর্মশালা এখন ক্লান্ত,—অবসন্ন। এই ব্রিটেন, অথবা চেল্‌সি কিংবা সাউথ কেনসিংটন-এর উজ্জ্বল আলো ঝলমল জীবন—সত্য কোনটি? মাইকেল স্যানকস-ই ('দি স্ট্যাগন্যানট সোসাইটি') কি সত্য? ব্রিটেন কি সত্যিই যে কোন সময়ে ক'টা বুদবুদ তুলে সমুদ্রে ডুবে যেতে পারে?

স্যানকস বলেছেন 'ইট ইজ গে, ইট ইজ ম্যাডলি অ্যামিউজিং.

অ্যানড ইট ক্যারিস উইথ ইট দি স্মেল অব ডেথ।” অন্যরা এর সমর্থনে অঙ্ক জোগাড় করেছেন প্রচুর। তার মধ্যে কয়েকটি শুনে রাখা ভাল। ব্রিটেন উৎপাদন বলে আজ অনেকের চেয়েই হীনবল। ১৯৬০ থেকে ’৬৫ সনে মারকিন দেশে উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ, পশ্চিম জারমানীতে ২৯ ভাগ, ইতালিতে ৪০ ভাগ, আর ব্রিটেন-এর মাত্র—১৮ ভাগ।

শুধু কি তাই? একজন মারকিন শ্রমিক যখন এক টন ইস্পাত তৈরি করেন, ব্রিটেন-এ তখন শ্রমিক লাগে তিনজন। যন্ত্রশিল্পে একজন ক্যানাডিয়ান সমান ২·৫২ জন ইংরাজ। বন্দরে কী একটা কাজ হবে। টেণ্ডার দাখিল করার সময় ইংরাজ ব্যবসায়ী হিসাব করে দেখলেন তাঁর লোক দরকার ১ লক্ষ ১০ হাজার। টেণ্ডারটা তিনি পাননি, পেয়েছেন মারকিনীরা। কারণ ওঁরা হিসাব করেছেন তাঁদের শ্রমিক চাই ৩৯ হাজার। জাহাজের বাণিজ্যও এভাবে আমেরিকানদের কাছে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কারণ নিজেদের ফারম-এর তুলনায় ওঁদের দাবি ৩ থেকে ৫ গুণ কম। তা হবে বই কি! ব্রিটেন-এ একটি সাত-ইউনিট-এর রটারি প্রেস চালাতে লোক চাই ১৯ জন,—সুইডেন-এ ৫ জনই যথেষ্ট।

অন্যান্য শিল্পেও নাকি একই অবস্থা। ব্রিটেন-এ একজন মোটর কারখানার শ্রমিক বছরে গড়ে যেখানে ৫·২টি মোটর উৎপাদন করেন, জারমানিতে সেখানে গড় উৎপাদন ৫·৬টি, আমেরিকায় ১১টি। প্রতিটি শিল্পে অহেতুক বেশি লোক। লিভারপুল-এ এখনও নাকি শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা ‘ওয়েলটিং’ চালু আছে। চারজন যখন কাজ করেন অন্য চারজন তখন পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেন। লণ্ডন ডকে আগে যে কাজে ১৪ জন লোক লাগত, নতুন ব্যবস্থার ফলে এখন অনায়াসেই ৪ জনে তা করতে পারেন। কিন্তু শ্রমিকরা তাতে রাজি নন—যন্ত্রের পরও তাঁরা ১৪ জনই চান। অক্সফোরড-এর বিশেষজ্ঞ অ্যালেন

ফ্ল্যানডারস বললেন—ব্রিটেন-এর শিল্পে আজ শতকরা ৪০ জন শ্রমিকই শাকের আঁটি, বাড়তি।

একজন রসিকের মতে এ অবস্থার জন্য দায়ি আর কিছু নয়, ইংরাজের স্বভাব। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা,—এসব নীতিকথা মাত্র। ইংরাজেরা আসলে কাজের সময় বিশ্রাম করে, এবং বিশ্রামের সময় কাজ করে। অফিস বা কারখানার সময়টুকুতে তারা শক্তি এবং উৎসাহ সঞ্চয় করে ছুটির দিনের জন্য। ছুটির দিনে না ঘুমিয়ে দিনভর তারা উঠোনে গর্ত খুঁড়ে, আগাছা কাটে, গলফ খেলে, বেডরুম নতুন করে সাজায়, তারপর বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে বলে—এবার একটু বিশ্রাম দরকার। আবার সেই কাজের সময় ছুটির বাসনা!

শাদা চোখে এসব ধরা পড়ে না। দোতলা বাসে একজন কণ্ডাকটার, পানশালায় একজন পরিচারিকা, বিস্তীর্ণ পথের ওমাথায় দাঁড়িয়ে একজন মাত্র পুলিশ। দেশের নানা অঙ্গনে বেপরোয়া পরিশ্রমের নজীর অজস্র, কিন্তু ব্রিটেন-এর আসল হৃদপিণ্ড শিল্পলোকে নাকি স্পষ্টতই জরার লক্ষণ। শেফিলড-এর বিখ্যাত রুপোর কারখানায় গিয়েছিলাম,—দেখতে এখন একটি বড় কামরাশালা মাত্র। উলের কারখানায় কাজ করছেন মেয়েরা; ওভারশিয়ার নিজেই বললেন—মন্থরতা স্বাভাবিক, শীত এখনও অনেক দূরে,—উলের চাহিদা বাড়বে তো সেই শীতে।

শুধু বাড়তি শ্রমিক নয়, শ্রমিকের রোজগারও বাড়ছে। যে বছর দেশের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা মাত্র ১ ভাগ, শ্রমিকদের মাইনে বেড়েছে সে বছর শতকরা ৯ ভাগ। আমেরিকার একই সময়ে শ্রমিকের রোজগার বেড়েছে না কি ২'৮ ভাগ! তারপরও ব্রিটিশ কর্মীর মনে অসন্তোষের অন্ত নেই। যে কোন উপলক্ষে সে তার 'অধিকার' প্রতিষ্ঠার নামে লড়াইয়ে নামতে রাজি। সব সময় যে বাড়তি মাইনের জন্য এমন নয়। ক্যানটিন-এ চা ভাল হচ্ছে

না, সুতরাং একদিন হরতাল হয়ে গেল! ফোরম্যান একজনকে গালমন্দ করেছে—সে বাবদে বন্‌ধ। 'পাব'-এর বালিকা প্রচলিত প্রথা ভেঙে দু' পাঁইট-এর চেয়ে বেশি বীয়ার পান করেছিল, মালিক তাকে বিদায় করেছে; শুনে সবাই একবাক্য: হ্যাঁ, জুলুমবাজি বই কি! সুতরাং, ভাটিখানায় কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের 'বুনোবেড়ালের' হল্লা বা আকস্মিক খুচরো ধর্মঘটের কথা অনেক শুনেছি। তারই মধ্যে চোখের সামনে হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল—বিরাট কাণ্ড, 'সীমেনস স্ট্রাইক,'—নাবিক ধর্মঘট। সেটা ১৯৬৬ সনের কথা।

—তুমি কি ১৪ পাউনড-এ ৫৬ ঘণ্টা কাজ করবে? দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে 'হ্যানডবিল বিলি করছেন সুবেশ তরুণ-তরুণী!—এ অন্যায়। নাবিকেরা ১৪ পাউণ্ড এ কাজ করতে রাজি, তারা ৪০ ঘণ্টার সপ্তাহ চান এই যা!—টেলিভিশনে সওয়াল করলেন উইলিয়াম হোগারথ। ট্রাফলগার স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটকে আশীর্বাদ করে গেলেন—বৃদ্ধ বারট্রাণ্ড রাসেল। তুমুল কাণ্ড। পঞ্চান্ন বছরে প্রথম নাবিক ধর্মঘট। দ্বীপ-এ জাহাজীদের হরতাল। আড়াই হাজার জাহাজ, ৬৫ হাজার নাবিক জড়িত এর সঙ্গে। খাদ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও আলু ট্যমাটোর দর শতকরা ১০ ভাগ বেড়ে গেছে। জনসাধারণ তবুও নিশ্চিন্ত। দর কমাবার পক্ষে কাগজগুলোই যথেষ্ট। কোন 'দম দম দাওয়াই'-এর দরকার হল না। কাউকে গ্রেফতার করতে হল না। কমিটির রিপোরট-এর জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হল না। সওয়াল জবাব বৈঠক, কয়েকটি বিচক্ষণ চাল,—ধর্মঘট যথাসময়ে শেষ হল। ৪৫ দিন পরে লড়াই সাঙ্গ। সব আশা পূরণ না হলেও শ্রমিকরা শতকরা ৫ ভাগ বাড়তি মাইনের প্রতিশ্রুতি পেলেন।—'ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!'

লড়িয়ে দার্শনিক রাসেল বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু ইউনিয়ন

বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবেও। ব্রিটিশ শ্রমিকের কাছে ইউনিয়ন একটি পবিত্র শব্দ। ৯৯ লক্ষ শ্রমিকের চোখে সেরা দুর্গ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরাট বাড়িটি। সেখানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে মনে হয়েছে শুধু কিছু কল আর কারখানা নয়, দেশের প্রধান দল থেকে শুরু করে সমুদয় ক্ষমতার আদি তাঁদের হাতে। কথাটা একদিক থেকে সত্য। কিন্তু তবুও পুরো সত্য নয়। চাবি, ওঁরা যাকে বলেন 'অন্য শ্রেণী', তাঁদের হাতেও আছে। 'এসটাব্লিশমেনট' তথা ক্ষমতার পীঠস্বরূপ গতকালের উপরতলা আজ ক্ষয়িষ্ণু হলেও এখনও রীতিমত সমর্থ সম্প্রদায়। থেকে থেকে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ বোধ হয় অন্যভাবে সে খবরটাই জানিয়ে দিয়ে যায়। দেশের আজকের মন্দার দায় অনেকের মতে তাঁদেরও। অন্তত ট্রেড ইউনিয়ন নায়কেরা তা-ই বলেন। 'শ্রমিকেরা আলসে'—এ উক্তি তাঁরা সত্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—অলস জীবন যাপন করছেন আজ মালিকপক্ষ। তাঁরা বিলাসী, তাঁরা আরামপ্রিয়, তাঁরা পরিবর্তনের কথা ভাবতে চান না, ভাবতে ভয় পান।

অনেক বুদ্ধিজীবী পর্যবেক্ষকেরও তা-ই অভিমত। একজন একটি কোম্পানির ডাইরেক্টারদের 'লং হার্ড ডে'র বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়: দামী পানীয়; অপ্রাসঙ্গিক আড্ডা, দীর্ঘ খানা এবং বিশৃঙ্খল আলোচনা-গবেষণা ছাড়া ওঁরা কাজ করেন অতি সামান্য। ৫ লক্ষ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর অধিকাংশই 'ম্যানেজার' হিসাবে আধুনিক শিক্ষাহীন 'জেনটলম্যান ব্যবসায়ী' মাত্র। যতটুকু না খাটলে নয়, তার বেশি কেউ খাটতে চান না। পচন, এতএব যদি দেখা দিয়ে থাকে, তবে দুই অঙ্গেই। একটি জাতীয়-দৈনিকের শ্রমিক-বিশেষজ্ঞ হেসে বলেছিলেন—যদি বল ব্রিটেন আত্মহত্যা করছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিও এটা একটা যুগল-আত্মহত্যার 'কেস্'।

শ্রমিক আর মালিক। মালিক আর শ্রমিক।

শুনে মনে হতে পারে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর রাজত্বে প্যাট্রিসিয়ান আর প্লিবিয়ান—শুধুই দুই তরফ। মোটেই তা নয়। ইংরাজ-সমাজ এখনও বাইজেন্টাইন নক্সার মত,—বহুবর্ণ। অষ্টাদশ শতকে এক বিদেশী ব্রিটেন বেড়াতে এসে মন্তব্য করেছিলেন—ইংলিশম্যান-দের হাতে সবসময় একটি নিঁখুত দাড়িপাল্লা থাকে। তিনি সেটিতে প্রত্যেকের কুল, গোত্র, পদমর্যাদা এবং অর্থবল ওজন করে তার পরেই সাব্যস্ত করেন এই বিশেষ লোকটির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা সঙ্গত।

আপার, মিডল, আর ওয়ার্কিং-ক্লাসই নয়, হিন্দুর মত ইংরাজ সমাজও বিভক্ত অগুনিত বর্ণ এবং গোত্রে। একজন গবেষকের মতে প্রথমটির সংখ্যা যদি ১২০, তবে দ্বিতীয়টির সংখ্যা গুণে দেখ, যোগফল কমপক্ষে ৪১৩! শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও উত্তম, মধ্যম, অধম আছেন। মধ্যবিত্তের মধ্যেও উচ্চ, নীচ, মধ্য ছাড়া আছেন 'লোয়ার-মিডল-আপার অব লোয়ার-আপার-মিডল!' কুলীনদের মধ্যেও একই কাণ্ড। ক'জন বলতে পারবেন কোনও ব্যারণের দ্বিতীয় পক্ষ যদি কমনার দুহিতা হন তবে তাঁকে কী বলে সম্বোধন করা উচিত!

এসব ব্যাপারে সবাই অতিশয় হুঁশিয়ার। সাধারণ মানুষও ব্যতিক্রম নন। রিপোর্ট লিখতে গিয়ে আমি এক মহিলাকে

'ওম্যান' বলে উল্লেখ করেছিলাম। পরদিনই দফতরে ক্রুদ্ধ চিঠি, —আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।—আই অ্যাম এ ইয়ং লেডি, ওয়েল এডুকেটেড অ্যাণ্ড রিফাইণ্ড, অ্যাণ্ড এ হাইব্রো অব দি ফার্স্ট ওর্ডার। ওই কাগজের অফিসে থাকা কালেই আর একদিন একটি চিঠি দেখেছিলাম, লেখক জানতে চাইছেন—ব্যাপার কী বলুন তো? ইনকাম ট্যাক্সের জন্য যখন আমার নামে চিঠি আসে তখন লেখা থাকে 'মিস্টার', কিন্তু সুপারট্যাক্সের বেলায় লেখা হয়—'এস্কোয়ার'।—এটাই কি সরকারী নীতি? আর একজনের জিজ্ঞাসা—আমি কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছি? আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন—কিছুদিন ধরে আমি আমার ডাক্তার এবং সলিসিটারকে তাঁদের ডাকনাম ধরে সম্বোধন করছি।

সত্য বটে এখনও ব্রিটেন-এ 'ডেব্রেটস'-এর বিখ্যাত কুলপঞ্জী 'Debretts' Peerage Baronettage Knightage Companionage…' ছাপা হয়। তিন হাজার দুই শ' দুই পাতার সেই বিরাট বইয়ের ছয় পাউনড ওজন। হয়ত সমাজে তাঁদের ভার এবং ধার এখনও থেকে থেকে অনুভূত হয়। কিন্তু বাইরের দর্শকের কাছে আজকের ব্রিটেন-এ তাঁরা একান্তভাবেই অদৃশ্য। অনেক লর্ড তাঁর প্রাসাদের দরজা খুলে দিয়ে জনতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। আড়াই শিলিং দর্শনী দিলে যে কেউ তাঁর শোয়ার ঘরে উঁকি দিতে পারেন। এমন কি এই সামান্য বঙ্গসন্তানও এ ধরনের গোটা দুই প্রাসাদ দেখতে পেরেছে। অনেক লর্ড উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উপাধি ছেড়েছেন। হয়ত আরও কেউ কেউ ছাড়তে পারলে আনন্দিত। কেননা, দিন পালটাচ্ছে;—এমনকি 'বিটল'রা পর্যন্ত 'এম বি ই' হয়ে গেছে। ব্যারণ-এর মেয়ে দোকানীর ছেলের সঙ্গে সানন্দে ঘর করছে। রাজকুমারী অ্যান ষোলয় পড়ে বলেছিলেন—অক্সফোর্ড নয়, কেম্ব্রিজ নয়, আমি যাব সাসেক্স য়ুনিভার্সিটিতে! সাসেক্স রেড-ব্রিক য়ুনিভার্সিটি,

অতি-আধুনিক, অকুলীন। কুড়িতে পৌঁছে তিনি জানাচ্ছেন-- যাঁরা নানা ব্যাপারে প্রতিবাদমুখর তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। তিনি বিদ্রোহীদের পছন্দ করেন। রাজকুমারীও টুপি হু'চক্ষে দেখতে পারেন না, আর দেখতে পারেন না নাকি তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালদের। প্রথম দর্শনে যার-তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু প্রকৃত বড় ঘরের সেয়ানা মেয়ে তিনি, বলেছেন—বিয়ে করব তাঁকেই যিনি রাজকীয় জীবন যাত্রায় অস্বস্তি বোধ করবেন না!

সত্যিই দিন পালটে গেছে। মোটর গাড়ি এখন আর বড়মানুষির চিহ্ন নয়। কারখানার শ্রমিকের ছুয়ারেও তা দাঁড়িয়ে আছে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, তারও আর পূর্ব মাহাত্ম্য নেই। সেখানে নানা পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। ১৯২০ সনে অক্সফোর্ড-এ পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র ছিলেন ৩০০ জন, ১৯৬৬ সনে সংখ্যায় তাঁরা ২২০০। ৭০-এ নিশ্চয় আরও বেশী। গ্রামার স্কুল গৌরব হারাচ্ছে, পাবলিক স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক হচ্ছে। শেফিল্ড-এর কাছে একটি আধুনিক 'কমপ্রিহেনসিভ স্কুল'—সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম। হেডমাস্টার মশাই বললেন--আমি যখন স্কুলের বাসে চড়ে ওয়েকফিল্ড-এ গ্রামার-স্কুলে পড়তে যেতাম তখন পাড়ার লোক তাকিয়ে থাকত। আমাদের পাড়া থেকে আমিই ছিলাম একমাত্র ছাত্র। আর আজ? প্রত্যেকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। সেখান থেকে অনেকেই যাবে কলেজে। পুরানো শ্রেণী বিন্যাস অতএব আজ ভিক্টোরীয় নীতিকথার মতই পুরানো ব্যাপার। সমাজের সর্ব অঙ্গনে এখন শ্রমজীবি আর নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরের ছেলেদের ভিড়। লর্ড-লিবারেল-যাজক-পুরোহিতের হাত থেকে ক্রমেই তাঁরা ক্ষমতার চাবিগুলো নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। এই নব্য সর্বব্যাপ্ত লিবারেলিজমের ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ইংরাজ

তরুণ যেমন আজ সোনার জলে লেখা সাইনবোর্ড থাকা সত্ত্বেও রাজা পঞ্চম জর্জ-এর ভূতপূর্ব ক্ষৌরকারের দোকানে ঢুকতে ইতস্তত করে না, তেমনই অজ্ঞাতকুলশীল কৃষ্ণবর্ণ সাংবাদিকের সঙ্গে করমর্দনেও হাত অবশ বোধ করে না। এই সৌখিনতা এবং উদারতার জন্য প্রয়োজন যে আর্থিক এবং মানসিক বলের দুই-ই আজ তাঁদের আছে। 'আমি কোন কলেজে যাইনি'—একথা বলতে কোন ইংরেজ সাংবাদিককে আমি তোতলা হতে দেখিনি। অক্সফোর্ড-এর তরুণ শিক্ষক সগর্বে বলেন—'আমি খনিমজুরের ঘরের ছেলে!'

পাবলিক স্কুলের দুয়ার সকলের জন্য খুলে দেওয়ার প্রস্তাব শুনে যাঁরা আঁৎকে উঠে বলেন—সব মেয়ের গলায় যদি হীরের হার শোভা পায় তবে আর সে গহনার মান থাকবে কি?—তাঁরা আজ অবশ্যই সংখ্যালঘু। অস্টিন হুপকিন্সন-এর মত আজ যদি কেউ হাঁক দিয়ে বলেন—আমি অটোক্র্যাট; কেননা, জন্ম, শিক্ষা এবং বুদ্ধিতে আমিই স্বাভাবিক নায়ক, তবে তিনি অনিবার্যভাবেই হাসির উপলক্ষে পরিণত হবেন।

সমাজে ভাঙা-গড়ার কাজ সমানেই চলেছে। অতি দ্রুত তালে। আগে যে প্রাচুর্য ছিল শতকরা ২০ জনের দখলে, এখন তা ৮০ জনের করতলগত। এখনও যাঁরা বাকি,—তাঁরাও উঠতে চাইছেন। অক্সফোর্ড-এর একজন গবেষক বলেছিলেন—দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্য তাই আজ আরও প্রকট। যে প্রাচুর্য '৪০-এর যুগে এদেশের প্রাপ্য ছিল, সত্তরের দশকে তা নিয়ে চলবে কেন বল?

কারণ যাই হোক, ঘরের সরকার থেকে শুরু করে বিদেশের বান্ধব—সবাই একবাক্যে বলেন, ব্রিটেন-এর স্বাস্থ্য ভাল নয়। ভাল যাচ্ছে না। বাণিজ্যে ঘাটতির অঙ্ক বাড়ছে। ১৯৬৪ সনে ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্ব চালু রাখার জন্য অন্যদের ৩ বিলিয়ন ডলার

ঋণ দিতে হয়েছে, '৬৫ সনে আরও ১ বিলিয়ন। '৬৬র জুন মাসে ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেণ্ট আর এগারটি দেশকে আবার ১ বিলিয়ন দিতে হল। কেননা তার আগের পনের মাসে পাউণ্ড-এর দর নাকি কখনও এত নীচে নামেনি। তার ওপর নাবিক ধর্মঘট। ৪৫ দিন প্রবল লড়াইয়ের পর ধর্মঘট যেদিন ভাঙল ব্রিটেন-এর অবস্থা তখন আরও সঙ্গীন। ক'দিনের মধ্যেই শোনা গেল পাউণ্ড-এর দাম আবার পড়ছে। পতন এবার একুশ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। তহবিল থেকে একমাত্র জুন মাসেই খোয়া গেছে সোনা আর বৈদেশিক মুদ্রায় ১৩৭ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং, আবার ধার কর। উইলসন বেপরোয়ার মত চেষ্টা করলেন ইদানীংকার অন্যতম বিষণ্ণ গ্রীষ্মকে উত্তপ্ত করতে।

প্রথমে এল 'প্রাইসেস অ্যাণ্ড ইনকাম বিল'। কেউ বছরে শতকরা সাড়ে তিন ভাগের বেশি মজুরি বাড়াতে পারবেন না। কোন ট্রেড ইউনিয়ন সে চেষ্টা করলে জরিমানা হবে ৫০০ পাউণ্ড। তাতেও হাওয়া অনুকূল হল না। ব্যাঙ্ক রেট বাড়ানো হল, সেই সঙ্গে বে-সরকারী ব্যাংক-এর মজুতের পরিমাণও। তারপরও শোনা গেল তহবিলের অবস্থা গুরুতর। সুতরাং, বাধ্য হয়েই এবার হাতে তুলে নিতে হল ব্যয় সংকোচের খড়্গ—এল বিখ্যাত 'ফ্রীজ' বা চাপ চাপ বরফের দিন। যে করে হোক, খরচ কমাতেই হবে। সব রকমের খরচ। দেশের ভেতরে এবং বাইরে—সর্বত্র। শুধু তাই নয়, সরকারের সঙ্গে জনতাকে হাত মেলাতে হবে,—ছ'মাসের মধ্যে মজুরি, দাম বা মুনাফা কিছুই বাড়ানো চলবে না। স্বেচ্ছায় সবাই যেন এ ব্যবস্থা মেনে নেন। উইলসন আবেদন জানালেন। করুণ আবেদন : এ দেশ আমাদের এবং তোমাদের সকলের ; দেশবাসী আপনারা বিবেচনাশীল হোন। ক্রয়-কর আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল। গাড়ি থেকে শুরু করে রকমারি গৃহস্থালী জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল। প্রমোদ-ভ্রমণকারীদের টাকা বেঁধে দেওয়া হল, ডাক

খরচ বেড়ে গেল এবং আরও নানা-খরচে কাটাকুটি। এ ঘটনা যখন ঘটে আমরা তখন স্কটল্যাণ্ড-এ। মুখে মুখে বিষাদের ছায়া, যেন আবার যুদ্ধে নেমেছে দেশ। অনেকেই আহত। তাঁদের কথা—লেবার গবর্নমেণ্ট এমন নির্দয় হতে পারে আশা করিনি।—তবে না উইলসন অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত?—দূর বাজে কথা, মন্তব্য করলেন আর একদল। নগদ পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স ঘটিত ব্যাপার! অনেকেই অতএব ক্রুদ্ধ, মর্মাহত। বাজেট-এর পরদিন সকালে আমাদের দেশে রোয়াকে-রান্নাঘরে আলোচনার মতই কথাবার্তা। ভাবনায় দেশ যতখানি, তার চেয়ে বেশি নিজেদের পকেটের ভবিষ্যৎ! তা হলেও রসবোধ খোয়াতে রাজী নন গৃহস্থ। একজন বললেন—এসব টাকাপয়সার ব্যাপার স্কচদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল।

'প্রাইসেস অ্যাণ্ড ইনকাম বিল'-এর বক্তব্য শুনে দলের অন্যতম বলবান সদস্য ফ্রাঙ্ক কাজিন মন্ত্রিসভা ছেড়ে আবার ট্রেড ইউনিয়নের পুরানো দফতরে ফিরে এসেছিলেন। 'ফ্রীজ' প্রস্তাবে ব্রাউন বাঁকলেন। ট্রেড ইউনিয়নে আলোড়ন। তার ওপর থেকে থেকে দলে নানা উপলক্ষে বিদ্রোহ। সরকারের ভিয়েৎনাম নীতির বিরুদ্ধে শতেক এম-পি সংঘবদ্ধ। পার্লামেণ্ট-এ শ্রমিক টোরির ব্যবধান তখন ('৬৬ সনের নির্বাচনের পর) ৯৭টি আসন। অথচ দল স্পষ্টতই তিনভাগে ভাগ হয়ে আছে। দক্ষিণপন্থীরা বেজার। সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারছেন না, বাঁচার পথ কমন-মার্কেট-এ ঢোকার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন না। বামপন্থীরা শুধু ভিয়েৎনাম-এ আমেরিকাকে সায় দিয়ে চলার জন্য ক্ষুব্ধ নন, তাঁদের আরও নানা অভিযোগ। সরকার 'সুয়েজ-এর পূব' থেকে সরে আসতে চান না, পারমাণবিক বোমার খেলা বন্ধ করতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না, ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ করতে পারছেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মধ্যপন্থীদের বক্তব্য: উইলসন একটি সাচ্চা উদ্দেশ্যমূলক সরকার চালাতে পারছেন না। তার ওপর কাগজে কাগজে বক্রোক্তি (যথা: 'ফ্রীজ—প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অতিমানব হিসাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'—নিউ স্টেটসম্যান।), ব্যঙ্গচিত্র, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এবং পার্টি সম্মেলনে সরকারী নীতির সরাসরি চ্যালেঞ্জ, হোটেলে বোমা, চার্চ-এ দুয়ো। তারই মধ্যে উইলসন অনড়। ভিয়েৎনাম উপলক্ষে কমনস-এর ঝড়ে তাঁকে দেখেছি, দেখেছি কমনওয়েলথ সম্মেলনের নৈরাশ্যময় দিনগুলোতেও। আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস তাঁর। তাঁর দৃঢ়তা অথবা বুদ্ধিমত্তায় 'সুয়েজ-এর পূবে' এখনও সরকারী নীতি, ভিয়েৎনাম-এ আমেরিকা প্রায় ন্যায়পন্থী রোডেশিয়া নামে প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্নটি থাকা সত্ত্বেও কমনওয়েলথ খান খান হতে পারেনি, এবং 'ফ্রীজ' প্রস্তাব বাধ্যতামূলক করার পরও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিজের আসন টলেনি। উইলসন কি সত্যিই ব্রিটেন-এ জনগণমন অধিনায়ক?

জনসন ওঁকে চার্চিল-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিছু কিছু কাগজ তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছে। কেউ কেউ রামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর স্মৃতি মথিত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—শ্রমিকনেতা হিসাবে তিনি মাপে খুব বড় নন। অক্সফোর্ড-এ একটি আলোচনাচক্রে একজন অষ্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক প্রশ্ন তুলেছিলেন—নেহরু কি সোস্যালিস্ট ছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতনামা ইংরাজ অধ্যাপকের প্রশ্ন—হ্যারল্ড উইলসন কি সোস্যালিস্ট? লিবারেলরা উইলসন আর হীথ-এর ছবি পাশাপাশি রেখে জিজ্ঞাসা করছেন—'টোরি কে'? ওঁরা দু'জনের নাম দিয়েছেন—'রাজনৈতিক যমজ'। অক্সফোর্ড-এর লিবারেল ক্লাব খাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছে হ্যারল্ড উইলসন-এর। ওঁরা তাঁকে লিবারেল বলে স্বীকার করতে পর্যন্ত নারাজ।

গ্যালপ-ভোট নিয়ে দেখা গিয়েছিল শ্রমিক-সরকার জনপ্রিয়তার টোরিদের ওপরেই আছে। ব্যবধান কমপক্ষে শতকরা ১৮ ভাগ। ক'মাস পরে আবার মেপে দেখা গেল হাওয়া পাল্টাচ্ছে। শ্রমিক দলের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ছে। টোরিদের প্রতি লোকেদের আগ্রহ বাড়ছে, সেই সঙ্গে লিবারেলদের দিকেও। তা হলেও কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন না, উইলসন-এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। 'গার্ডিয়ান'-এর একজন ভাষ্যকার বলেন—আসল কথা, তোমাদের দেশের মতই আমাদের চিন্তায় নানা বৈপরীত্য। উইলসন তারই প্রতীক মাত্র। জেরাল্ড স্কারফ যখন উইলসন আঁকেন (স্কারফ 'ডেইলি মেল'-এর তরুণ ব্যঙ্গচিত্রকর) তখন তিনি মোটেই বাড়িয়ে আঁকেন না, ব্রিটেন-এর সেটাও এক চেহারা। বিশ্ব চষে বেড়াবার পরও আমরা প্রথমে গৃহস্থ; প্রগতি আমাদের নেশা হলেও আসলে আমরা ঐতিহ্যবাদী—সনাতনপন্থী। সিসিল কিং বলেন—সরকারী নায়কদের দোষ এই, ওঁরা সোজাসুজি মেঘের দিকে আঙুল তুলতে পারেন না—সঙ্গে সঙ্গে রুপালী ঝালরের মিথ্যা গল্প ফেঁদে বসেন।

আকাশে মেঘ ছিল না, তা নয়। কিন্তু রূপালী ঝালরও যে ছিল হ্যারল্ড ইউলসন তা প্রমাণ করেছেন গত ক'বছরে। '৭০-এর জুনে আবার দলকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনে নেমেছেন তিনি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ না-হলেও অনেকখানি পরিবর্তিত। দেশের আর্থিক অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি ঘটেছে। বাণিজ্যে ঘাটতির বদলে উদ্বৃত্ত। তহবিলে প্রচুর অর্থ। উন্নতির লক্ষণ নাকি হ্যারল্ড উইলসনের জনপ্রিয়তায়ও। '৭০-এর প্রথম দিকে গ্যালপ-পোলে তিনি লাফে লাফে এগিয়ে গিয়েছেন, এবং তারপর নিজেই এগিয়ে গেলেন ভোটারের দিকে। নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়েছিল ওয়াটরলু বার্ষিকীর দিনে, জুনের ১৯ তারিখে। হ্যারল্ড উইলসন যদি এ ওয়াটারলুতে হেরে যান তবে বলার কিছু নেই। জিতলে

একটি কূটপ্রশ্ন উঠতে পারে। কনজারভেটিভদের সমর্থক ডেউলি এক্সপ্রেস একবার লিখেছিল—কনজারভেটিভরা দরকার হলে নিজেদের নীতি সম্পূর্ণ পালটে নিয়ে সরকার হাতে রাখেতে পারেন, সমাজতন্ত্রীদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই যতদিন না তাঁরা এই নমনীয়তা দেখাতে পারছেন। উইলসনের নেতৃত্বে শ্রমিক দল কিন্তু সে নমনীয়তাও দেখিয়েছিল। কখনও কখনও সত্যিই মনে হত—ওঁরাও টোরি।
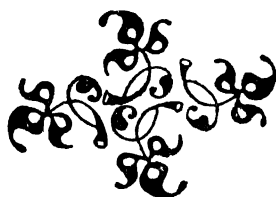
আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের মেলা।

কালো মেঘ আজ শুধু কারখানা ডক আর সওদাগরী হাউস-এর মাথার ওপরে নয়, ছায়া তার সমাজের নানা অঙ্গনে। বিদেশীর চোখেও থেকে থেকে ধরা পড়ে তা। হঠাৎ রাস্তায় টেলিফোন-এর দরকার। কাছেই দাঁড়িয়ে লাল রঙের কুঠুরি; এগিয়ে যান, দরজায় জি-পি-ও'র সলজ্জ বিজ্ঞপ্তি—মাফ করবেন, দুর্বৃত্তরা ভেঙে দিয়ে গেছে! এক বছরে নাকি লক্ষ টেলিফোন এভাবে বিকল হয়েছে। ট্রেনে যান, সেই সুপরিচিত সাবধানবাণী; চোর, জুয়াচোর, পকেটমার নিকটেই আছে। হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্য দক্ষতা ব্রিটিশ-রেলওয়ের। কিন্তু বদ ছোকরাদের ঠেকাতে পারছেন না ওঁরা। রেলের একজন মুখপাত্র বলছিলেন—বছরে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হয় দুর্বৃত্তদের জন্য। পরিচ্ছন্ন নাগরিক হিসাবে ইংরাজের খ্যাতি জগৎজোড়া। অনেক ইংরাজকেই বলতে শুনেছি—সেটাও ইতিহাসের ব্যাপার। লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাসের ওপরতলার মেঝে কখনও কখনও কলকাতার ফুটপাথের মত; প্রস্রাবাগারগুলো বিকৃত ছবি আর কথায় চিত্রিত। শুধু কি তা-ই? স্যামুয়েল পিপস একদা লণ্ডন-এর রাস্তায় ঘোড়ারগাড়ি চালকের ব্যবহার দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন বলে বইয়ে পড়েছি, শহর থেকে ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্ট আসার চেষ্টা করে বিফল বিদেশী বন্ধু জানালেন—তিনি মর্মাহত।

এ-সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। প্রত্যেক দর্শকের তহবিলে ভদ্রতা, ভব্যতা, অভাবিত সহযোগিতা, আশ্চর্য সহানুভূতি ইত্যাদির সঞ্চয়ও অনেক। তবুও টুকরো টুকরো ক'টি মেঘের কথা মনে পড়ে গেল, কারণ ইংরাজরা নিজেরাই আজ তা দেখে ভাবিত, উদ্বিগ্ন। লণ্ডন-এ নামবার ক'দিন পরেই প্রকাশিত হল বিখ্যাত 'মুর' মামলার রায়। খুনের মামলা। ব্রাডি নামে এক তরুণ আর হিনডে নামে তার এক বান্ধবী তিনটি প্রাণ নষ্ট করেছে। তার মধ্যে দুটি শিশুর। গোটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে শিহরিত। আগের বছর পরীক্ষামূলকভাবে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। '৬৫ থেকে '৭০—পরীক্ষামূলক বিধান ছিল পাঁচসালা বন্দোবস্ত। '৭০-এর পাকাপাকি ভাবে বিদায় দেওয়া হয়েছে ফাঁসি কাঠকে। ঘটনাটা স্মরণীয়। বিশেষত দেশটি ব্রিটেন। গ্রামের পথে এখনও সেখানে দেখা যায় কাঠের ফাঁসি-মঞ্চ। এক সময় ফাঁসি দেওয়া আর ফাঁসি দেখা ইংরাজের কাছে ছিল নেশার মত। ১৮০০ সনেও দশ বছরের ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ওদেশে। পরের বছর তেরো বছরের মেয়েকে। প্রথম জনের অপরাধ ছিল নাকি মুরগি চুরি, পরের জনের চামচ! শহরে ফাঁসি-দেখা তৎকালে আমোদের পরব। জল্লাদদের খাতির তখন ফিল্মস্টারের মত। আর্থার কোয়েসলার লিখেছিলেন—ব্রিটেন সেই আজবদেশ যেখানে লোকেরা বাঁদিক ঘেঁসে গাড়ি চালায়, ইঞ্চি এবং গজের হিসাবে কাপড় মাপে, এবং 'মৃত্যু অবধি' মানুষকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে! সেই ব্রিটেনেই মৃত্যুদণ্ড আজ অতীতের ব্যাপার।

সে যাহোক, হাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল না, সুতরাং রায় দেওয়া হল ব্রাডিকে তিন দফা যাবজ্জীবন দণ্ড পোহাতে হবে, হিনডেকে ডবল। অর্থাৎ, একবার 'যাবজ্জীবনের' পর আরও একবার 'যাবজ্জীবন'!

আমরা ব্রিটেন ছাড়ার ক' সপ্তাহ আগে আবার চাঞ্চল্যকর খুন।

এবার একসঙ্গে তিন-তিনজন পুলিশ। গত পঞ্চাশ বছরে ২৪ জন মাত্র পুলিস খুনীর লক্ষ্য হয়েছেন। ব্রিটেনে পুলিস সাধারণত নিরস্ত্র। আমাদের দেশে অবশ্য নিরস্ত্র জনতার উপরও গুলি চলতে পারে, কিন্তু ওদেশে নিরস্ত্র পুলিসকেও সাধারণত কেউ আক্রমণ করে না। সেটা সভ্যতা বিরোধী, মানবতা বিরোধী। সুতরাং দেশ আহত। দাবি উঠল—মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনা হোক।

শুধু পুলিশ খুন নয়, দেশে অপরাধ সমানেই বাড়ছে। একটি সরকারী হিসাব বলে ১৯৩৮ সনের তুলনায় ব্রিটেন-এ গুরুতর অপরাধ আজ ৩ গুণ বেশি। হিংস্র আক্রমণ ইত্যাদির ঘটনা এ সময়ে বেড়েছে ৮ গুণ। মেপে দেখা গেছে তৎকালের অনুপাতে এ-সব অপরাধে তরুণদের অংশ আজ প্রায় ২২ গুণ বেশি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর দেওয়াল-জোড়া মানচিত্রগুলো নানা রঙের বোতামে নিশানে কণ্টকিত। এগুলো বর্ধমান অপরাধের ইঙ্গিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : এক দিকে চোর-ডাকাতের তৎপরতা যেমন বাড়ছে, অন্য দিকে পুলিশের অক্ষমতাও যেন তেমনই প্রকট হয়ে উঠছে। '৩৮ সনে যেখানে ওঁরা শতকরা ৫০ ভাগ অভিযোগের ফয়সলা করতে পারতেন, আজ সেখানে ৩৯ ভাগের বেশি নয়। এ-সব দেখেশুনেই কে যেন একজন মন্তব্য করেছিলেন : ব্রিটেন যেন আজ চোরের রান্নাঘর।

তবে হ্যাঁ, চোর, পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট—সবাই এখনও চিরকালের সেই ইংলিশমান।

গেরস্থের বাড়ির তালা ভাঙ্গতে গিয়ে ধরা পড়েছে এক চোর। সঙ্গে পাওয়া গেছে ভাঙ্গা একখানা ভিনদেশী ছুরি। ম্যাজিস্ট্রেট ছুরিখানা দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ ;—তোমার উচিত ছিল 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' মার্কা ছুরি জোগাড় করা। মনে রাখবে, পরদেশী ছুরি বলেই আজ এই দশা!

আর একবার আর এক বিচারপতি গম্ভীর ভাবে বললেন—

অভিযোগকারিনীর অন্যায় প্রশ্নাতীত। শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঘটনাস্থল থেকে যারা ছুটে পালায় তারা অপরাধী। তাহলেও এই একটি ক্ষেত্রে মিসেস-এক্সের উচিত হয়নি 'স্টপ ছ্যাট ম্যান' বলে চেঁচিয়ে ওঠা। তাঁর বলা উচিত ছিল—আপনারা কি অনুগ্রহ করে ওই পলায়মান ভদ্রলোককে থামাবার চেষ্টা করবেন? উনি আমাকে এইমাত্র অপমান করে গেলেন।—বস্তুত, দৈহিক নিগ্রহ।

এজাতীয় উপাখ্যান খবরের কাগজে নিত্যই ছাপা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—মাত্র পাঁচ পাউণ্ড ঘুষ দিয়ে যে ব্রিটিশ পুলিসকে বশ করতে চায় সে নিশ্চয় আহাম্মক!

সততা আর নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি হয়েও ব্রিটিশ পুলিস মূলত কিন্তু ইংরাজ। একজন 'ববি' আর একজনের নামে নালিশ করেছেন;—বে-জায়গায় গাড়ি রেখে কোথায় বসে আড্ডা দিচ্ছেলেন নাকি অন্যজন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অপরাধীর কৈফিয়ৎ—আমি দেখলাম কাছাকাছি কোথাও কোনও পুলিসম্যান নেই। আমার গায়ে ইউনিফর্ম ছিল। তাই অনেক ভেবে নিজেই নিজেকে স্পেশাল-পার্মিসান দিয়ে দিলাম।

জনসাধারণও অতএব ক্রমেই আরও সেয়ানা। লিভারপুলে এক স্কুলে ছোটদের পুলিস নিয়ে রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল। একটি ছেলে লিখেছে—'লিভারপুল পুলিস ইজ বাস্টার্ডস!' কাণ্ড দেখে মাস্টার মশাইয়ের চক্ষু চড়ক গাছ। খবর গেল থানায়। থানা কর্তৃপক্ষ চকলেট ইত্যাদি খাইয়ে বাচ্চাদের বোঝালেন—পুলিস আসলে খুব ভাল। কিছু দিন পরে আবার একই বিষয়ে রচনা লিখতে দেওয়া হল একই স্কুলে। সেই ছেলেটি এবার লিখল—'লিভারপুল পুলিস ইজ ক্যানিং বাস্টার্ডস!'

শুধু খুন-রাহাজানি-তালাভাঙা-ছিনতাই নয়, নৈতিকতায় ভাটার খবর অন্যখানেও। ১৯৫৬ সনে একটি সমীক্ষায় জানা

গিয়েছিল—ব্রিটেন-এ প্রতি কুড়িটি শিশুর মধ্যে একটি অবৈধভাবে জাত। মা বাবা বিয়ে না করে ফেললে প্রতি ৮টি শিশুর মধ্যে একটিকে তা-ই হতে হত, ইত্যাদি। নিনা এপ্টন নামে একজন মহিলা গবেষক বলেন—পরিস্থিতি এখন আরও খারাপ। ১৯৬২ সনে অবৈধভাবে গর্ভপাতে সাহায্য করায় ৯০ জন চিকিৎসকের সাজা হয়েছিল। পুলিসের হিসাব—সে বছর মোট গর্ভপাতের সংখ্যা ৬০৪। (মায়ের স্বাস্থ্য হেতু হলে গর্ভপাত ব্রিটেন-এ বে-আইনী নয়।) একজন মহিলা লিখেছেন—দেশে বছরের কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার বে-আইনী গর্ভপাত হচ্ছে। আইনের সংশোধন দরকার। কেন, সে বিষয়ে 'গার্ডিয়ান' কাগজে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন জনৈকা অবিবাহিতা জননী।

তরুণ তরুণীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক অভিভাবক নিজেরাই বলছেন—ছেলেমেয়েদের সরাসরি যৌনবিজ্ঞান পড়ানো দরকার; ওরা অজ্ঞ, অসহায়। খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে লেখা ওদের চিঠিপত্র অনেক সময় এই অজ্ঞতার কথাই বলে। একজন মেয়ে লিখেছে—আমরা কিচ্ছু করিনি, তবু আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে কেন? আর একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—সতর্কতা অবলম্বন করেছিলে তো? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর,—আলবৎ! প্রথমেই আমরা দেখে নিলাম মা বাড়ি আছে, কি নেই। আর একটি অতি-সতর্ক মেয়ে লিখেছে—জন আমাকে বলেছে কোনও ভয় নেই, সে নিয়মিত 'পিল' খাচ্ছে। মাঝে মাঝে আসে কাতর জিজ্ঞাসা—আমি যে ছেলেটিকে বিয়ে করতে চাই সে খুব ভাল ছেলে। কিন্তু সে বলছে প্রকৃত কুমারী ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না, এবং সে-জন্যই সে আমাকে পরখ করে দেখতে চায়…। এমতাবস্থায় আমার কর্তব্য কী? 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার'-এ জিমি খবরের কাগজে যে চিঠিটি পড়ে রেগে উঠেছিল সে ধরণের চিঠিও আসে প্রচুর;—আমার বয়ফ্রেণ্ড যা চায় আমি

যদি এক্ষুনি তাকে তা দিয়ে দিই তাহলে কি এর পরও তার কাছে আমার সমান সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। —ইত্যাদি।

যৌন শিক্ষার দাবি উঠেছে।

দেশে গর্ভপাত আইন সংশোধনের দাবিতে অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। দু'জন মহিলা চিকিৎসক অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে জন্মনিরোধক সাজসরঞ্জাম বিলির জন্য একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চার্চ কমিটি বসিয়েছিল সমাজের জন্য নৈতিক-বিধান রচনা করতে। রিপোর্ট দেখে কারও সন্দেহ নেই তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। ডেভিড স্টীল নামে পার্লামেণ্ট-এর এক সদস্য অতএব নিঃসঙ্কোচে বিল আনলেন—গর্ভপাত পুরাপুরি আইনসম্মত করা হোক। আইন আজ বহুলাংশে সংশোধিত, অনেক উদার।

নীতিবাদীরা বলেন—আমাদের স্খলনের ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ নয়, ওলফেনডেন রিপোর্ট দেখেছ? ব্রিটেন-এ আজ কমপক্ষে ১০ লক্ষ পুরুষ বিকৃত যৌনাচারী। অর্থাৎ সমকামী। এঁরা যৌনজীবনে অস্কার ওয়াইল্ড। রকম সকম যা ব্রিটেন হয়তো একদিন প্রাচীন গ্রীসে পরিণত হবে।

একশ' আণ্ডার-গ্রাজুয়েট-এর সঙ্গে কানে কানে কথা বলে জানা গেছে তাদের মধ্যে তিরিশ জনই সমকামী। এই রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে আইন চালু করার চেষ্টা চলছে। লরড-সভা ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়ে দিয়েছে এখন বাকি শুধু কমন্স।

মেয়েদের মধ্যে বিকৃত আচারও নাকি বাড়ছে। তবে তা নিয়ে এখনও ঢাক ঢাক গুড় গুড়। এ-ব্যাপারে ইংরাজ এখনও সংস্কার কাটাতে পারছে না। লেখক নাট্যকারদের বাদ দিলে বিশেষ করে এ ব্যাপারে দেশ এখনও ভিক্টরীয়। সমকামী মেয়েদের নিয়ে সচরাচর কেউ কথা বলতে চান না। ঘটনা শুনে ভিক্টোরিয়া নাকি বলে উঠেছিলেন—অসম্ভব। মেয়েরা কখনো এসব করতে পারে না। হার ম্যাজেস্টির কাছে স্বভাবতই বিষয়টা বিশদ করতে চাননি প্রবীণ

মন্ত্রিবর্গ। এখনও অবশ্য তাঁরা নীরব, কিন্তু ধীরে ধীরে মুখ খুলছেন অন্যরা। মাঝে মাঝে হাত ধরাধরি করে চার্চে হাজির হন দুই সখী,—আমরা বিয়ে করতে চাই। আমি যখন ব্রিটেনে তখন এধরণের একটি কাণ্ড হয়েছিল কোনও মফঃস্বল গির্জায়। মেয়ে দুটি ছিল ক্যাথলিক। স্বভাবতই যাজক পৌরহিত্য করতে রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন—তাজ্জব ব্যাপার, তোমাদের মহল্লায় কি কোনও ছোকরা নেই?

ওয়েলফেয়ার স্টেট-এর উদারতায় বাড়তি পাউণ্ড-শিলিং-এর খেলো পথের প্রতিটি বাঁকে। 'বিংগো' 'ক্যাসিনো'—আরও কত কী নাম। নাচের আলয়, জুয়াখেলার আসর। ১৯৬০ সন থেকে জুয়া খেলা দেশে আইনসম্মত। এককালে শোনা যেত জুয়ার পেছনে আশা বা নেশার মত আর একটি কারণ—ক্ষুধা। ব্রিটেন-এ আজ 'ক্ষুধা' প্রায় অপরিচিত শব্দ। তবুও জুয়ার নেশা বাড়ছে। ১১০টি দোকান আছে এমন একটি কোম্পানি দু' মাসে মুনাফা করেছে ২ লক্ষ পাউণ্ড। ব্রিটেন আজ বিশ্বের সব সেরা জুয়ার আড্ডা। ১৬ হাজার বেটিংশপ দেশে, তদুপরি আছে ১২০০ ক্যাসিনো, ২০০০ বিঙ্গো ক্লাব। অচল সিনেমা হলগুলো অধিকাংশই 'বিঙ্গো' হয়ে গেছে। ফুটবল পুল-এ প্রতি সপ্তাহে যোগ দেয় কমপক্ষে ৯০ লক্ষ লোক। প্রতি বছর জুয়ার জ্ঞাত আসরে হাত ফিরি হয় নাকি ৫ বিলিয়ন ডলার, এই খাতে সরকারী আয়—২৫০ মিলিয়ন ডলার!

হিসাবটা আমেরিকান কাগজ থেকে টুকে নেওয়া। তাই ডলারেই দিচ্ছি। টাকায় ভাঙিয়ে নিলে দেখা যাবে—কোটি কোটি টাকা। লটারি সমাজতন্ত্র শুধু এদেশেই নয়, ওখানেও দিব্যি চলেছে। তবে ওদেশে পাশাপাশি এই যা। বড়বাজারে যেমন বৃষ্টি নিয়ে এক হাত খেলা হয়ে যায়, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড-এ দেখেছি, ট্রেন আসতে এক মিনিট কি দু' মিনিট লাগবে, তাই নিয়ে দু'টি ছেলে

এক 'বব' বাজি ধরে বসল। একজন রসিক সাংবাদিক বন্ধুর মন্তব্য : ঘোড়দৌড় আর ফুটবল না থাকলে সান্ধ্য কাগজগুলোর কি হত তা-ই ভাবি।

জুয়া বেড়েছে। বেড়েছে এল-এস-ডি এবং আরও রকমারি রসায়ন-আসক্তি। ৪৯টি 'স্ট্রীপটীজ' ক্লাব এক রাজধানীতেই। সেহো-র পথগুলো 'মুক্ত' করা হয়েছে '৫৯ সনে, পথে রূপফিরি বা ছেলে-ধরা নিষিদ্ধ। সদ্য প্রকাশিত 'গাইড' বই-এ তাই-ই পরামর্শ : ইফ ইউ ওয়াণ্ট এ লেডি, রিং অন ডোরবেলস মার্কড মারি অর সাবরিনা; অ্যাণ্ড গুড লাক! এই 'পাতকের দেশকে' উদ্ধার করতে এসেছিলেন মারকিনী ত্রাতা—বিলি গ্রাহাম। কাগজে কাগজে তা-ই নিয়ে সে কি হাসাহাসি। সোহোয় গিয়েছিলেন গ্রাহাম। বিবস্ত্রপ্রায় একটি মেয়ে এসে আছড়ে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপর : বিলি, আমার মিনি-স্কার্টটি কেমন দেখছ তা-ই বল!

বয়স্করা দুঃখ করেন : আজকের ছেলেমেয়েদের ধর্মে আর তেমন মতি নেই। ব্রিটেন-এ শতকরা ১০ জন মাত্র আজ চার্চ-এ যান। ওয়েলস-এ নতুন গীর্জা খালি, ভক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে কার্টুন—'গড গো হোম!' ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে নতুন করে তর্ক করতে হচ্ছে ৬৩ বছরের প্রবীণ 'এম এম'-কে ;—ম্যালকম মাগারিজ। তাঁরও কথা—ভরসা এখন একমাত্র ঈশ্বর।

অথচ ইংরাজ নাকি চিরকাল ধর্মভীরু। আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ সারের এক কাউন্সিলার টমাস ডালির ছেলে হল সেবার। তাঁর সানন্দ ঘোষণা—'ইট ইজ এ মিরাক্যাল, এন অ্যাক্ট অব গড! আমরা সন্তানের জন্য নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করেছি, এ তারই ফল। —আমি আরও ছেলেপুলে চাই, সুতরাং আবার আমরা প্রার্থনা করব!' তামাক পাতার রহস্য নিয়ে ভাবিত আর এক বিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য—ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পিছনেই কোনও

গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিছুতেই এটা হতে পারে না যে, তিনি ধূমপানের মত অনিষ্টকর নেশার জন্য তামাক গাছ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিকদের উচিত তামাক সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা। সেই দেশেই প্রকাশিত হয়েছে নতুন বাইবেল। উদ্যোক্তা অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ। ১৯৬১ সনে ওঁরা আজকের ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন 'নিউ টেস্টামেন্ট,' '৭০-এ প্রকাশিত হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্ট। এক সময় বাইবেলে সামান্য এদিক ওদিক করলে জরিমানা গুণতে হত। নতুন বাইবেলে ইংরাজ লেখকগোষ্ঠী বেপরোয়া। 'দাউ মাস্ট কাম আন টু মি,'—এই বাক্যটি নতুন বাইবেলে রূপ নিয়েছে—'ইউ মাস্ট স্লীপ উইথ মি টু নাইট!' 'হার্লট'রা নতুন কেতাবে সাক্ষাৎ 'প্রস্টিটিউটস!'

ইউরোপে এ-সব খবর কোন খবরই নয়। অনেক ইরাজের চোখে ব্রিটেন-এও নয়। তাঁদের ভাবনা—সমাজের পটভূমি; দেশের অর্থনীতির কথা আগেই বলেছি। দেশের আয় কম, খরচ বেশি। যথেষ্ট লোক নেই। যারা আছে তাদের মজুরি বেশি। উৎপাদন-ব্যয়ও বেশি। ফলে রপ্তানি কম। বাজারও বহুলাংশে সীমিত। সুতরাং, উইলসন কোমরের বেল্ট কষছেন তো কষছেনই। রাজনীতিতেও মন্দ-হাওয়ার নানা ইঙ্গিত। স্কটল্যাণ্ড-এর কথা থাক। নদার্ণ আয়র্ল্যাণ্ডে অভিযোগ: পনের লক্ষ মানুষের বাস এই অঞ্চলটি আজ কার্যত 'জন বুল-এর রাজনৈতিক বস্তি'। চারজন ক্যাথলিক খুন হয়ে গেলেন একদিন। ফলে রানীর গাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হল ১২ পাউণ্ড ওজনের পাথরের চাঁই। ঘটনা সেখানেই থামেনি। '৬৯ সনের গ্রীষ্মে প্রবল দাঙ্গা হয়ে গেছে নদার্ণ আয়র্ল্যাণ্ডে—ক্যাথলিক আর প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে। ৭০-এর গ্রীষ্মে আবার। ক্যাথলিকরা সংখ্যাগুরু, প্রটেস্ট্যান্টরা লঘু; তবু ক্ষমতার চাবিকাঠি শেষোক্তদেরই হাতে। নানা ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য বৈষম্য। ফলে প্রবল উত্তেজনা, প্রভূত আলোড়ন। আলোড়নের

আর এক কেন্দ্রে এক তরুণী। তিনি বার্ণাদেত। মাত্র একুশ বছর বয়সে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঠাঁই করে নিয়েছেন তিনি '৬৯ সনে। সুদর্শনা, অনাথা, 'নীচ কুলোদ্ভবা' এই ক্যাথলিক তরুণী নিজের পোষাক এবং কথার জোরে প্রথম দিনই জয় করে নিয়েছিল পার্লামেণ্টের হৃদয়। সকলে দাবি জানিয়েছিলেন, স্পীকারের উচিত ওঁকে চুমু খাওয়া। স্পীকার তাতে রাজি হননি, কিন্তু করমর্দন করতে গিয়ে অনেকক্ষণ নাকি ধরে রেখেছিলেন তাঁর হাত। সেই সুকোমল হস্তটিই আজ নদার্ণ আয়র্ল্যাণ্ডে উদ্যত প্রটেস্ট্যাণ্ট আর পুলিশের বিরুদ্ধে।

ওয়েলস-এও নানা কাণ্ড। সেখানে 'অল প্যালিড কিমরুর' (ওয়েলস ন্যাশানালিস্ট পার্টি) পতাকায় ড্র্যাগন। দলের তরফ থেকে সবাইকে হারিয়ে পার্লামেণ্টে এসেছেন গিয়নফর ইভানস। তাঁর অনেক দাবির একটি : সবাইকে ওয়েলস ভাষায় কথা বলতে হবে। এখনও নাকি রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের চার ভাগের একভাগ প্রাচীন কেল্টিক ভাষায় কথা বলতে পারেন। ১৯৬৮ সনে জনমত খতিয়ে দেখা গেছে শতকরা ৫৯ ভাগ মানুষ স্বতন্ত্র আঞ্চলিক পার্লামেণ্ট চান। সেই ওয়েলস-এরই এক প্রাচীন প্রাসাদে '৬৯ সনের জুলাইয়ে সাড়ম্বরে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' হয়েছেন রাজকুমার চার্লস। ১২৮২ সনে শেষ স্থানীয় রাজা নিহত হয়েছিলেন ইংরাজ নৃপতি প্রথম এডোয়ার্ডের অনুচরদের হাতে। ক্ষুব্ধ ওয়েলসবাসীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—তোমরা আবার রাজা পাবে। এমন রাজা যিনি এখানেই জাত, এবং যিনি ইংরাজী জানেন না। এডোয়ার্ডের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ওয়েলস-এর রাজপ্রাসাদে। সেই তনয়কেই তিনি তুলে দিয়েছিলেন ওয়েলসবাসীর হাতে। তাঁকে খেতাব দেওয়া হয়েছিল 'প্রিন্স অব ওয়েলস।' সেই থেকেই এই প্রথা। চার্লস যত্ন করে ওয়েলস-এর ভাষা মুখস্ত করেছিলেন, রাজকীয় অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামও ছাপা হয়েছিল

ইংরাজীর সঙ্গে ওয়েলস-ভাষায়। তবু রানীর গাড়ির দিকে ডিমের-ঢিল, এখানে ওখানে বোমা বিস্ফোরণ, উৎসবের মধ্যে অতর্কিত মৃত্যু!

ব্রাইটন-এ আড্ডা বসেছে—ইংলণ্ডএর আর এক ধরণের জাতীয়তা-বাদীদের। সে দলের নাম—'রেসিয়াল প্রিজার্ভেশন সোসাইটি।' ব্রিটেনকে তারা সাদা রাখতে চায়। বৃহৎ দলগুলোর তুলনায় দেশের রাজনীতিতে এরা কিছুই নয়, অনায়াসে অবহেলা করা যায়। তবু কেউ কেউ ভাবিত, কারণ দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য আজ আর নাকি তত সবল নয়। 'পার্লামেন্টে-র জননী' নামে বর্ণিত ওয়েস্টমিনিস্টার নিয়ে বই লিখেছেন ইংরেজ এম-পি, সে বই-এর নাম—'পার্লামেন্ট 'অ্যাণ্ড মামবো জামবো'। তাই নিয়ে কথা পেড়েছিলাম; অন্য এক সদস্য বললেম—ও, হিউজেস-এর বইটির কথা বলছ?—ও কার জামাই জান? বিদ্রোহ-ই ওদের পারিবারিক ঐতিহ্য!

সেটা সত্য কিনা আমি জানি না। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ অনেকেই একমত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে-র সংস্কার দরকার। একজন সমালোচক দেখিয়েছেন, যদিও সময়াভাব, তবুও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বছরে সাড়ে তিন মাস ছুটিতে কাটায়। এক অধিবেশনে শুধু সেকেলে ভোট প্রক্রিয়ায়ই নাকি নষ্ট হয়েছে ৬৭ ঘণ্টা তথা ৪০ হাজার ম্যান-আওয়ার।

সন্দেহ কি পার্লামেন্টের জননীর বয়স হয়েছে। হাউস অব লর্ডস-এ তো বটেই, কমনস-এও অধিবেশন চলাকালে অনেকে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোন। হাউস অব লর্ডস এক আজব মেলা। সেখানে কারা আসেন, কী ভাবে আসেন, সে সব কথা পরে। শুধু দু' একটি খুচরো সংবাদ। এক লর্ড আর এক লর্ডের প্রশংসা করছেন: ইনি ত্রিগুনেশ্বর। ইনি জানেন কেমন করে শেয়াল মারতে হয়, কেমন করে বাজে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে হয়, এবং কেমন করে না-পছন্দ রক্ষিতাকে বিদায় জানাতে হয়।—এ ম্যান হু পজেসেস দিজ থ্রী কেয়োলিটিজ উড সারটেনলি হ্যাভ সামথিং টু

কনট্রিবিউট টু দি ওয়ার্ক অব দি হাউস। সার জর্জ হিউম নামে (এঁর বানান কিন্তু এইচ-ও-এম-ই নয়) একজন এম-পি বলেছিলেন, কমনস-এ ঘুমোতে দোষ নেই। আমার তো মনে হয় ওখানে জেগে থাকাই শক্ত। তাছাড়া পাবলিকের এটা বোঝা উচিত ঘুমন্ত এম-পি-রাও সমান উপকারী। স্কটিশ পীয়ার মর্টন সাহেব একান্নব্বুই বছর বয়সে দেহরক্ষা করলে 'টাইমস' তাঁর গুণাবলী কীর্তন প্রসঙ্গে লিখেছিল—পার্লামেণ্টে তিনি একটি কথাও বলেননি। বলা নিষ্প্রয়োজন, সার আইজাক নিউটন আর আর্ল অব মর্টন একমাত্র মৌন এম-পি নন, ঘুমন্ত এম-পি এখনও তুই কক্ষে অনেক। একজন লাইব্রেরিয়ান একবার বলেছিলেন—কখনও কখনও বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় জাগ্রত পাঠকের চেয়ে ঘুমন্ত পাঠকই শ্রেয়, কে জানে ব্রিটিশ ভোটারও হয়তো কখনও কখনও মনে মনে ভাবেন—কাম্য মৌনরাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে-সব কথাবার্তা চলে সব তার কাজের কথা নয়, সবটুকু শোনার মতও নয়। দিল্লিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে নিতান্তই নবীনা।

সময়ের সমান অপচয় হয়ে থাকে মধ্যযুগীয় নানা আচারেও। হাউস অব কমনস-এ স্পীকারের শোভাযাত্রা দেখবার জন্য ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকে কেন, অনুষ্ঠানটি স্বচক্ষে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। স্পীকার আসছেন শুনেই মার্শালরা ছুটে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেন,—স্পীকারকে করাঘাত করে ঢুকতে হয়। অধিবেশনের প্রথম দিনে নাকি তাঁকে ফিতে দিয়ে আসনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সেই কবে কোন দূর অতীতে একজন স্পীকার পালিয়ে গিয়েছিলেন তাই এই বন্দোবস্ত। ঘুরতে ঘুরতে হলের চৌকাঠে পা দিতেই হঠাৎ হুঙ্কার—হ্যাটস অফ, স্ট্রেনজারস। এম-পি ছাড়া ওবাড়িতে সবাই 'স্ট্রেনজার'—অচেনা আগন্তুক। রাত্তিরে সভাশেষে গোটা বাড়ি কাঁপিয়ে হাঁক—'হু গোওস হোম ?' এককালে পথঘাট যখন অন্ধকার ছিল,

বাঁকে বাঁকে যখন ডাকাতেরা ওঁৎ পেতে থাকত তখন সভাশেষে সদস্যরা দলবদ্ধ ভাবে বাড়ি ফিরতেন। এই হাঁক তারই স্মারক। সভাকক্ষটিও সেকেলে। উইলসন একবার বলেছিলেন—এতটুকু এক-একটি ড্রয়ার, তাতে দু-একটা কমলালেবু হয়ত রাখা যায়, কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্যের কাজ চলে না। ম্যাকমিলান বলেছিলেন—এখানে আসলেই মনে হয় স্কুলে এলাম, মনে হয় এক্ষুনি কেউ তাক থেকে একটা ব্যাট নামিয়ে আনবে, তারপর বসে বসে তেল মাখাবে। '৬৬ সনের নির্বাচন-পর পার্লামেণ্টে ৮৩ জন আনকোরা নতুন সদস্য। তাঁরা একালের রাজনীতিক। স্বভাবতই বিদ্রোহী। বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তাঁদের একজন। তারপর সহাস্যে একটা বন্ধ দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন—দেখ, তোমরা আবার এর নকল করতে যেয়ো না! ঘরটি শৌচাগার। দরজায় লেখা—'মেম্বার্স'; 'পুরুষ' বা 'মহিলা' নয়। পোষাক রাখার ঘরে ঢাল তলোয়ার রাখার জন্য বন্দোবস্ত। মাননীয় সদস্যদের কোমরে সেকালে তলোয়ার ঝুলত কিনা, তাই। সুতরাং দাবি উঠেছে—সংস্কার চাই।

হচ্ছেও।

সেণ্ট পলস-এর গম্বুজ ঘিরে লোহার খাঁচা। ক্রিস্টোফার রেন-এর অবিস্মরণীয় কীর্তিকে সারাই করা হচ্ছে। নতুন করে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ চলেছে অন্যত্রও। ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সংস্কারের চেষ্টা চলছে। কলকারখানায় নব-জীবনের সাধনা। পার্লামেণ্ট সম্পর্কে একাধিক কমিটি গঠিত হয়েছে। '৬৮ সনে আরও অনেক খর্ব করা হয়েছে লর্ড সভার ক্ষমতা। রোডেসিয়া সম্পর্কে সরকারী নীতিকে অনুমোদন করতে রাজি হননি মান্য লর্ডরা। সুতরাং, সরকার সিদ্ধান্ত নেন—উচ্চ কক্ষের ক্ষমতা কমাতে হবে। তাজ্জব ব্যাপার এই, লর্ডরা নিজেরাও সায়

দিয়েছন এই প্রস্তাবে। লর্ড-সভা একালে আরও অনেক বিস্ময়কর কাণ্ড করেছেন! সমকামকে আইনের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন, পার্লামেন্টে টেলিভিশন বসাতে মত দিয়েছেন। কিন্তু নিজেদের হাতে মৃত্যু পরোয়ানায় সাক্ষরের এই দৃষ্টান্ত অবশ্যই স্মরণীয়। প্রস্তাবের পক্ষে নাকি সেদিন ভোট পড়েছিল ২৫১, বিপক্ষে—৫৬।

পুলিশ-ব্যবস্থা মজবুত করার কথা ভাবা হচ্ছে; জুরির বিচার থাকবে কি না, ব্যারিস্টার আর সলিসিটার এক করে দেওয়া যায় কিনা, গাউন-পরচুলা অত্যাবশ্যক কিনা—ইত্যাদি নানা বিষয়ে তুমুল তর্ক হচ্ছে। কেম্ব্রিজ-এ কে যেন নতুন ছাঁটের গাউন বানাচ্ছেন। অক্সফোর্ড নিয়ে বিপ্লবাত্মক রিপোর্ট বের হয়েছে। ৯০০ পাতার বই, ১৭০টি সুপারিশ। শুধু ইস্পাত-শিল্পের জাতীয়করণ বিষয়ে নয়, শ্রমিক-সরকার কমিটী বসিয়েছেন পাবলিক স্কুলের ভবিষ্যৎ বিষয়েও ভাবতে। এদিকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো যথারীতি চালু; মনোপোল কমিশন নিষ্ঠাভরে কাজ করে যাচ্ছেন, ব্রিটেন-এর ইতিহাসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন প্রথম 'ওমবুডসম্যান'। আমাদের ভাষায়—'লোকপাল।' সন্দেহ নেই, ব্রিটেন এখনও জীবিত, এবং তার নায়কেরা যখন 'ডানকার্ক স্পিরিট'-এর কথা বলেন তখন অহেতুক স্লোগান আওড়ান না।

জীবনের একই লক্ষণ দেশের তরুণদের মধ্যেও। পাব-পপ-প্রগলভতা (তরুণেরা 'পাব'-ভক্ত নয়, তাদের প্রিয় 'কফি-বার') একমাত্র কাহিনী নয়, ভাল করে তাকালে দেখা যাবে, এই বেপরোয়া তরুণ-তরুণীর দল শিল্পে-সাহিত্যে এখনও সমাজ সৃজনশীল। রাজনীতিতে সব তরুণ কোনও কালেই সক্রিয় ভূমিকা নেয় না। এখনও না। বিশ্বব্যাপী ছাত্র-বিদ্রোহের হাওয়া অবশ্য এখানেও পৌঁছেছে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল '৬৯ সনের প্রথম দিকে। তরুণ বিদ্রোহী পাকিস্তানী

তারিক আলিরও অনেক ভক্ত। তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-এ বয়সের গড় হিসাব করলে দেখা যাবে—তরুণেরা সেখানে রীতিমত হাজির। 'ইয়ং লিবারেল', 'ইয়ং কনজারভেটিভ' 'ইয়ং লেবরাইট' ইত্যাদি ছাড়াও তাদের নানা সম্প্রদায়। ট্রাফলগার স্কোয়ার এবং হাইড পার্ক কর্ণার এখনও জমজমাট। শিল্প-সাহিত্যে তাদের উপস্থিতি আজ রীতিমত স্পষ্ট। ব্রিটেন-এ এখনও বছরে গড়ে নতুন বই ছাপা হয় ২০ হাজারের ওপর। লেখকদের মধ্যে একটা বিপুল অংশ বয়সে তরুণ। তাঁরা কেবলই 'উদ্ভট' অথবা 'মিষ্টি' আহ্লাদী কিতাব লেখেন না।

তারপর সিনেমা-থিয়েটার। একে অর্থাভাব, তার ওপর টেলিভিশন, সিনেমায় (অন্তত সংখ্যায়) দেশ কম-জোরি। কিন্তু থিয়েটার সর্বত্র। এক লণ্ডনয়েই সপ্তাহে গড়ে ৪০ থেকে ৫০টি নাটক অভিনীত হয়। ১৯১৯ সনে বার্নাড শ' লিখেছিলেন—জনসাধারণের কল্যাণে লণ্ডনে কোনও থিয়েটার নেই। আজ আর তা বলা চলে না। বিদেশীরা কেন ব্রিটেনে বেড়াতে আসেন তা জানতে গিয়ে দেখা গেছে কারণ ত্রিবিধ। এক, মানুষের আকর্ষণ ; দুই, এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের হাতছানি, তৃতীয়—থিয়েটার। একদিক থেকে ব্রিটিশ থিয়েটার পড়ন্ত, অন্যদিক থেকে বাড়ন্ত। এই শতকের তৃতীয় দশকে দেশে ভ্রাম্যমান থিয়েটার সম্প্রদায় ছিল ১৮০টি, ছয়ের দশকে তাদের সংখ্যা এক ডজনের বেশী নয়। একজন ওয়াকিবহাল বলছিলেন—গত পঞ্চাশ বছরে দেশে কমপক্ষে ৫০০ থিয়েটারে অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু গত দুই দশক ধরে আবার শুরু হয়েছে আলোর-যুগ। দেশ আবার যেন থিয়েটার পাগল। সব শহরেরই মনের কথা—থিয়েটার চাই। নিজস্ব থিয়েটার। জনসাধারণ অকাতরে অর্থ জোগাছেন থিয়েটারের জন্য। লোকসান হোক আপত্তি নেই, কিন্তু থিয়েটার চাই-ই চাই।

ব্রিটিশ থিয়েটারের পুরোভাগে দুই সম্প্রদায়। এক, রয়াল শেক্সপীয়ার কোম্পানি, দুই—ন্যাশন্যাল থিয়েটার। একটি জাতীয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ওঁদের অনেক দিনের। কথা উঠেছিল—শেক্সপীয়রের জন্মের তিনশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে তা প্রতিষ্ঠিত হোক। সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে একশ' বছর পরে, শেক্সপীয়রের ৪০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে,—১৯৬৩ সনের শরতে। জন্মবার্ষিকী পরের বছর। আগের বছর সাড়ম্বরে 'ওল্ড ভিক'-এ 'হ্যামলেট'-এর অভিনয় দিয়ে শুরু জাতীয় থিয়েটারের যাত্রা।

ন্যাশান্যাল থিয়েটার কেবল শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করেই দিন কাটান না। বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকারদের রচনা ছাড়াও ওঁরা বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করেন। অনেক সময় বিদেশী পরিচালকদের আমন্ত্রণ করেন—শেক্সপীয়রের নাটক পরিচালনার জন্য। নবীন নাট্যকারদেরও ওঁরা নিয়োগ করেন নাটক রচনার কাজে। পিটার সাফার, জন আনডেন, জন ওসবর্ণ—প্রমুখ আধুনিক নাট্যকাররা সে আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন। সম্প্রদায়ের এখন দুটি দল। এক দল দেশে বিদেশে অভিনয় করে বেড়ান, অন্য দল ওল্ড ভিক-এ দর্শকদের আপ্যায়ন করেন। ওল্ড ভিক ছোট্ট সেকেলে নাটমঞ্চ। শুনে এসেছিলাম ন্যাশন্যাল থিয়েটার নদীর ওপারে নতুন নাট্যশালা গড়বেন। বিখ্যাত এক স্থপতি তার ডিজাইন করছেন।

রয়াল শেক্সপীয়ার কোম্পানির আসর শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান স্ট্যাটফোর্ড-আপন্-অ্যাভন-এ। তবে লণ্ডনের অলডউইচ থিয়েটারেও ওঁরা অভিনয় করেন। স্ট্যাটফোর্ডে একনাগাড়ে অভিনয় চলছে সেই ১৮৭৯ সন থেকে। এমনকি ১৯২৬ সনে আগুনে স্টেজ পুড়ে যাওয়ার পরও অভিনয়ে ছেদ পড়েনি। নতুন মঞ্চ তৈরী হয়েছে ১৯৩২ সনে। ওঁদেরও একটি দল লণ্ডনে অভিনয় করেন। তবে এঁরা প্রধানত মঞ্চস্থ করেন আধুনিক নাটক। নাট্যকার কখনও দেশী, কখনও বিদেশী। আমি দেখেছিলাম ওঁদের 'ইউ' বা 'আস'। বিষয় ভিয়েৎনামের

যুদ্ধ। একাধারে নাটক, গণআন্দোলন, আলোচনা। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ব্যাপার। অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয়।

এর পরও আছে অত্যাধুনিক নাটকের জন্য ইংলিশ স্টেজ কোম্পানির রয়াল কোর্ট থিয়েটার। এখানেই প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার'। উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবন ('হু ইজ ফর টেনিস?') নিয়ে প্রথাগত নাটকের দিন যেন সেই থেকে ফুরলো। ব্রিটিশ নাটক এর পর থেকে সরাসরি নেমে এসেছে এই বিশ শতকে। ইস্ট-লণ্ডনের থিয়েটার ওয়ার্কশপেরও প্রতিপাদ্য এই শতক। প্রাচীন ড্রুরি লেনের কাছে পুরানো এক গুদোমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্ট লেবরেটারি। এক সঙ্গে থিয়েটার, সিনেমা, রেঁস্তোরা, বইয়ের দোকান। টোটেনহাম কোর্টে নতুন থিয়েটার 'ওপেন স্পেস' কুইনসওয়েতে 'অ্যামবিয়েন্স' (Ambiance)। শেষোক্ত সম্প্রদায় দুপুরে ছুটির সময় নাটক পরিবেশন করেন। এডিন বরার 'ট্রাভার্স থিয়েটার'ও অত্যাধুনিক নাটকের জন্য। এমনকি ব্যবসায়িক থিয়েটার প্রতিষ্ঠানগুলোও নবযুগকে অস্বীকার করতে পারছেন না। তাঁরা যেমন 'ক্লান্ত ব্যবসায়ী'দের মনোরঞ্জনের জন্য চিরাচরিত আমুদে গল্প পরিবেশন করছেন, ফাঁকে ফাঁকে তেমনই মঞ্চস্থ করছেন আধুনিক নাটক। উপায় কী, আজকের সব দর্শক 'ক্লান্ত ব্যবসায়ী' নন।

তারুণ্যের জয়জয়কার আজকের থিয়েটার মহলে। রয়াল শেক্সপীয়র থিয়েটার-এর ডাইরেকটার পিটার হল বয়সে একান্তই নবীন। অসবোরন-এর অবশ্য এখন বয়স চল্লিশের ওপরে, কিন্তু জন আরডেন—মাত্র পঁয়ত্রিশ। ওঁরা এমন নাটক লিখছেন, যা দেখতে হলে মাথা বাড়িতে রেখে যাওয়া চলে না, ওঁরা এমন কথা বলতে চাইছেন—যা শুনে প্রবীণেরা চমকান, কিন্তু পর্যবেক্ষকরা দ্বীপের ওপর আস্থা নিয়ে ঘরে ফিরে যান।—আর কবিতা? অ্যালবারট হল-এ 'নিউ মুন কারনিভ্যাল অব পোয়েট্রি' সত্যিই

'গ্রেটার হ্যান লণ্ডন ফায়ার'। ব্রিটেন রোগ-শয্যায় কে বলে? বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হবে—সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবলেও ইংরাজ জাতি এখনও বেঁচে আছে। আজকের রাত্রিই শেষ কথা নয়—আবার ভোর—হতে পারে নতুন ধরনের,—একদিন আসবেই। 'ডানকার্ক স্পিরিট' পুরোপুরি খোয়া গেছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই। '৬৬ সনে ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু ওঁরাই জিতে ছিলেন। অবশ্য আমার মনে হয়েছিল অনেক খানি গলার জোরে, কিন্তু পায়েও নিশ্চয় বল ছিল। হাজার হাজার কণ্ঠে 'ইংল্যাণ্ড!' 'ইংল্যাণ্ড' বলে সে কি আর্তনাদ; তদুপরি কাঁসর-ঘণ্টা জগঝম্প! একজন ছোট মাপের একখানা ইউনিয়ন জ্যাক গুঁজে দিয়েছিল এই পরদেশী দর্শকের হাতেও, বলেছিল, হাঁক দাও, 'ইংল্যাণ্ড'! মেক্সিকোতে অবশ্য হেরে গেছে ব্রিটিশ টীম। তার জন্যে আক্ষেপের কিছু নেই। একজন ক্রীড়ারসিক অনেক আগেই বলে গিয়েছিন—'It is not going to far to say that atleast half of our soccer defeats abroad would be avoided if English—or equally unbiased—referees were in charge.'—মেক্সিকোর রেফারীরা ইংরাজ ছিলেন না বোধহয়!
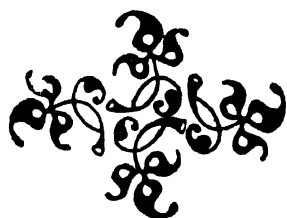
'শিপ মি সামহোয়ার ইস্ট অব সুয়েজ!'—জন বুল-এর হয়ে একদা যুগের গান গেয়েছিলেন কীপলিং। ইংরেজরা এখনও ঘর ছাড়ছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে। এক স্কটল্যাণ্ড থেকেই দেশত্যাগী হচ্ছেন বছরে গড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার। সবাই তাঁরা টম-ডিক-হ্যারি নন। টেমস-তুল্য সে প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে রাশি রাশি মগজ—'ব্রেন'। ১৯৬৪ সনে স্বদেশকে যাঁরা সেলাম জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রায় বারো শ' চিকিৎসক, চার হাজার দু'শ এঞ্জিনীয়ার, পাঁচশ' রসায়নবিদ্ এবং তিনশ' পদার্থবিদ্যা-বিশারদ। তার ওপর শত শত নার্স, শিক্ষক প্রভৃতি। দেশত্যাগ এখনও অ্যাংলো-স্যাক্সন এর-স্বভাব। কিন্তু আজ আর কেউ তাঁরা সুয়েজ-এর এদিকে আসেন না। আসতে চান না। কেননা, এখানে 'দি বেস্ট ইজ লাইক দি ওয়ারস্ট!' (অষ্ট্রেলিয়া ব্যতিক্রম। সুয়েজ-এর ওপারে হলেও সে দ্বিতীয় স্বদেশের মত।) টেলিভিশন-এ দেখছিলাম—চার শ' চিকিৎসকের একটি দল যাচ্ছেন অ্যাটলান্টিক-এর ওপারে। প্রশ্ন করা হল—কেন যাচ্ছ? নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন তরুণ ইংরেজ—যাচ্ছি আরও পয়সার জন্য!

দিন পালটে গেছে। 'ডেইলি ওয়ার্কার' নাম পালটে 'মর্নিং স্টার' হয়েছে। 'টাইমস' প্রথম পাতায় খবর ছাপছে, ভেতরের পাতায় কার্টুন। কাগজের মাথার-মণি সুপরিচিত ঘড়িটার পর্যন্ত

কাঁটা ঘুরেছে। 'টাইমস' এখন কার্যত লর্ড টমসনের সম্পত্তি। প্রিন্টিং হাউস স্কোয়ার-এর মতই নানা অঘটন হোয়াইট হল এলাকার। মার্লবরো প্রাসাদে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট। দফতরের কর্তা ক্যানাডিয়ান। সহকারী ঘানার মানুষ। তিনি হেসে বলছিলেন—একমাত্র ব্রিটিশ-প্রাধান্যের চিহ্ন তোমার সামনের ওই নোট পেপারগুলো। ক্রাউন-এর ছাপ দেখে ঘাবড়ে যেয়ো না, বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম, তাই ব্যবহার করছি। ফুরিয়ে গেলেই নিজেদেরটা ছাপিয়ে নেব। তার পরও ছিল অদূরে মস্ত—'কলোনিয়াল অফিস।' বিরাট বাড়ি, বিরাট টেবিল, দেওয়ালে দক্ষিণ-ভারতের কোনও নবাবের বিরাট প্রতিকৃতি। একদিন ভোরে সেখানে এসেও নতুন সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট-এর কর্মীরা। 'কলোনিয়াল অফিস'-এর নাম হয়ে গেল—"কমনওয়েলথ অফিস।"

যেন ছোট্ট শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কালি ছিটিয়েছে, মানচিত্রে লাল রঙের ছড়াছড়ি। শতেক উপনিবেশ। অরেনজ ফ্রী স্টেট কোথায় ফরেন সেক্রেটারি ম্যাপ না দেখে তা বলতে পারেন না। '৬৯-এ অ্যাঙ্গুইলায় ফৌজ পাঠিয়েছিলেন উইলসন। জায়গাটা কোথায়, আর ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী, অনেকের কাছে এখনও নাকি তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। ভার্জিন আয়র্ল্যাণ্ড কোথায় জিজ্ঞেস করলে অজ্ঞতা ঢাকবার জন্য রসিকতা করতে হয়—নিশ্চয় আইল অব ম্যান-এর কাছেই। সেই বিপুল সাম্রাজ্যের বদলে আজ এই সাইনবোর্ড—'কমনওয়েলথ অফিস।'

—কমনওয়েলথ? সে আবার কী? 'বি-বি-সি'-র তরুণ প্রযোজকদের তোলা—'ওয়ার গেম' নামে একটা ফিল্ম দেখেছিলাম। ফিল্মটিতে পারমাণবিক যুদ্ধ হলে কী হতে পারে, তা-ই দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবিষয়ে সাধারণ মানুষ যে কত অজ্ঞ তা-ও ওঁরা দেখিয়েছেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন

জনৈকা মহিলা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল—ফল-আউট কাকে বলে জানেন কিছু? উত্তর: কারিপাউডার-এর মতই কিছু হবে হয়ত। পারমাণবিক বোমা নিয়ে সাধারণ মানুষ বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। সরকারী ভাবনাও অনেকের মতে হাস্যকর। সিভিল ডিফেন্সের এক কর্তার বক্তৃতা: যখনই শুনবে বোমা পড়তে যাচ্ছে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে জানালার কাচগুলো সব চুন আর দই মিশিয়ে ঢেকে ফেলবে। পর্দাগুলো চুবিয়ে নিতে হবে সোহাগা আর তরল বার্লির জলে, নয়ত আগুন লেগে যাবে। রাশিয়ানরা যখন মহাকাশে উপগ্রহ পাঠান তখন উদ্বিগ্ন লর্ড হেলসহাম বলেছিলেন—আশীর্বাদ না হয়ে এ-বস্তু' অভিশাপেও রূপান্তরিত হতে পারে বই কি। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে সান্ত্বনার উপাদানও আছে। এই উপগ্রহের পেছনে অন্যতম 'ব্রেন' পিটার কাপিটজা (Peter Kapitza); আপনারা সবাই জানেন তিনি কেম্ব্রিজের ছাত্র।—সো ইট ওয়াজ লার্জলি এ ট্রায়াম্ফ অব ব্রিটিশ এডুকেশন। এরপর আর সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কী, মেয়েরা নাচতে নাচতে 'এইচ-বোম খোঁপা' বানাচ্ছেন। কেশ শিল্পীদের ভাষা অনুযায়ী 'এইচ' অর্থ এক্ষেত্রে পেরক্সসাইড হাইড্রোজেন যা দিয়ে চুল রঙ করা হয়, বোমার ধোঁয়ার মত ধীরে ধীরে উপরের দিকে ছাতা মেলবে চুল!

বি-বি-সি অফিসে শুনেছি—কমনওয়েলথ বিষয়ে একবার প্রশ্ন-পত্র মুখে নিয়ে লণ্ডন-এর পথে নেমেছিলেন ওঁরা। তাতে যে-সব উত্তর শোনা গেছে সে আরও হাস্যকর। খবরের কাগজের কমন-ওয়েলথ বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে কমনওয়েলথগতপ্রাণ গবেষক সবাই একবাক্যে বলেন—রাজনীতিক, কিছু ব্যবসায়ী, এক শ্রেণীর কিছু বুদ্ধিজীবি আর এক ধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদী—এইসব ক্লাবপ্রিয় মানুষকে বাদ দিলে কমনওয়েলথ সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর কোনও উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। একজন সাংবাদিক

বলছিলেন—কাগজে ছাপা চিঠিপত্রগুলো দেখে যাও, দেখবে সাধারণ এবিষয়ে এখনও কত অন্ধকারে। কোন্ কাগজে পড়েছিলাম মনে নেই। একজন পাঠক চিঠি লিখছেন: আমাদেরই পয়সায় দেশ চালাচ্ছে আফ্রিকানরা, অথচ আমাদেরই গাল-মন্দ করছে, এ কেমনধারা ভব্যতা? এই যদি কমনওয়েলথ-এর মানে হয়, তবে আমরা তা চাই না, ইত্যাদি। লনগুন-এ তখন কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হচ্ছে; একজন আফ্রিকান নায়ক রোডেসিয়া উপলক্ষ্যে অভিযোগ করেছেন—উইলসন বর্ণবিদ্বেষী। তার উত্তরেই এই চিঠি।

কমনওয়েলথ দেশের নায়কদের ভাবনা। কিংবা আর কারও। সে-মহলে আসক্তির অভাব, এমন কথা কেউ বলবে না। কমন মার্কেট-এর দিকে আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষত ত্যগলের পতন এবং প্রস্থানের পরে। কিন্তু কমলওয়েলথ নিয়ে ভাববার মত রাজনীতিক এখনও অনেক আছেন। দল হিসাবে তাঁরা অনুল্লেখযোগ্য নন। '৭০-এর নির্বাচনে সব দলের ইস্তাহারেই কমনওয়েলথের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদিত। কিন্তু সেসব রাজনীতিকদের ঘরোয়া ব্যাপার। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও প্রাণের যোগ নেই। তাঁরা শুধু জানেন—সাম্রাজ্য নেই। এবং সে-খবর জানার পর থেকে বাইরের দুনিয়ার কী হচ্ছে, সে সম্পর্কে আগ্রহ তাঁদের অতি সামান্য।

'সুয়েজ-এর পুবে' যে পৃথিবী সাধারণ ইংরেজের চোখে সে যেন আজ অন্য গ্রহ। এই ভাবনার প্রতিচ্ছবি বোধ হয় ব্রিটিশ খবরের কাগজগুলোতেও। একটি বিখ্যাত দৈনিক এখনও কপালজুড়ে প্রতিদিন সকালে সনিষ্ঠায় লিখে থাকে—'রানী এবং কমনওয়েলথ এর জন্য।' 'টাইমস', 'গার্ডিয়ান' বা 'টেলিগ্রাফ'-এর মত জাতীয় দৈনিকগুলো এখনও রাশি রাশি টাকা খরচ করে এশিয়া আফ্রিকার খবর সংগ্রহ করে। পরিমাণে খুব বেশি না হলেও সুয়েজ-এর

ওপারে কী ঘটছে, এদের পাতায় মোটামুটি তার একটা আভাস পাওয়া যায়। কিপ্টে ল্যাণ্ডলেডির বাড়ির স্যানডুইচ-এর মত আকারে ছোট হলেও এইসব খবরে কখনও কখন স্নেহশীল হাতের স্পর্শ ও থাকে। (বিশেষ করে ভারতীয় পাঠকেরা 'গার্ডিয়ান'-এ তা পেয়ে থাকেন।) কিন্তু বাদবাকি অধিকাংশ কাগজে বিশ্ব কার্যত গরহাজির। সেখানে নিউজ রুম-এ সোচ্চার ঘোষণা: আমাদের কাছে ষাট হাজার চীনার সমান একজন ইংরেজ। সেটা দোষের এমন কথা কেউ বলবে না, বরং নানা দিক থেকেই এ ধারণা অভিপ্রেত, যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কমনওয়েলথ-এর জন্য আরও ক' ইঞ্চি বাড়তি জায়গা, কিছু যুক্তিপূর্ণ আলোচনা সেটুকুও কি অতিরিক্ত প্রত্যাশা?

বিশেষত, এটা যখন সর্বজন বিদিত যে কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক নয়,—বাণিজ্যিক লেনদেনও হয়ে থাকে। ভারতের কথাই ধরা যাক। ব্রিটেনে ভারতের রপ্তানি দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে কমছে আমদানি। ১৯৬৬-৬৭ সনে এদেশ থেকে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানী হয়েছিল ২০১৯৭ লক্ষ টাকার, পরের বছর—২২৮৪৫ লক্ষ টাকার। ওই সময়ে ব্রিটেন থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ১৬৫৪৭ লক্ষ এবং ১৫৭৮৬ লক্ষ টাকার। আমাদের বহির্বাণিজ্যে ব্রিটেন এখনও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। আমদানির ক্ষেত্রে প্রথম আমাদের কাছে আমেরিকা। কিন্তু ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সমান গুরুতর রপ্তানিও। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ভারতে ব্রিটিশ মূলধন এখনও প্রচুর। এদেশে আমেরিকান মূলধনের পরিমাণ ১৯৩ কোটি টাকা, ব্রিটিশ মূলধন—৬৫৫ কোটি টাকা। ভারতে বৈদেশিক মূলধনের অর্ধেকই ইংরাজের। তারপর আছে আর্থিক 'সাহায্য', 'সহযোগিতা,' 'ঋণ'—ইত্যাদি। সে-তুলনায় ভারত কিন্তু ইংরেজের বৈঠকখানায় প্রায় অনুপস্থিত।

মনে মনে ইংরাজ হঠাৎ যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। রোমানরা ইতালীয়ান হয়ে গেছে। ইংরেজরাও যেন ক্রমেই নিছক সাহেব। একদা যখন সাম্রাজ্য ছিল তখন এশিয়া আফ্রিকার জন-বন, ওষুধ-ওষধি থেকে শুরু করে ইতিহাস ভূগোল ধর্ম দর্শন—নানা অঙ্গনে দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে নানা গবেষণা, আলোচনা। কমনওয়েলথ রিলেশান্স দফতর প্রকাশিত বর্ষপঞ্জী খুললে এখনও কমনওয়েলথ সংক্রান্ত নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকাণ্ডের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সব প্রধানত সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গতানুগতিক ব্যাপার। কিংবা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের আদর্শ ঘটিত কাণ্ড। তাঁদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু তাঁদের বাইরে যে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কমনওয়েলথ সেখানে আজ কতখানি? বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রকাশকের টেবিলে গতকালের সাম্রাজ্যের তুলনায় আজকের কমনওয়েলথ অনেক বর্ণহীন।

ভারতের কথাই ধরা যাক। শুধু প্রায় তিন শতকের সংসর্গ নয়, ব্রিটেন-এ আজ প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ভারতীয়। কমন-ওয়েলথ-এর আগন্তুকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এখন বার্ষিক সাড়ে আট হাজারে। ভারতীয় যেতে পাবেন বছরে এগার শ'। অবশ্য সাহেবরা যদি কৃপা করেন। যাঁরা ইতিমধ্যে স্বপ্ন-দ্বীপে পৌঁছে গেছেন তাঁরা সর্বত্র ছায়ার মত চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথের প্রতি মোড়ে 'ভারতীয়' রেস্তোরাঁ। ১৯৩৭ সনে তার সংখ্যা ছিল তিন, আজ প্রায় তিনশ'। অল্ডউইচ-এর বিরাট 'ইণ্ডিয়া হাউস' ছাড়াও এখানে ওখানে আরও 'ইণ্ডিয়া হাউস'। ম্যানচেস্টার-এ একটা বিরাট বাড়ির মাথায় আজও তা-ই লেখা আছে। আমেরিকানদের বাদ দিলে লণ্ডন-এ বৈদেশিক সাংবাদিকদের দ্বিতীয় বৃহত্তর দলটি ভারতীয়দের নিয়ে গড়া। তবুও ব্রিটেন-এ আজ কোথায় ভারত? হ্যাঁ, সত্য বটে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ 'লাঞ্চ' খেতে বিস্তর সাহেব মেম লাইন দেন,—চিরকালের 'ফিস'

আর 'চীপস'কে সরিয়ে ইংরেজের মেনুতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে —'কারি অ্যাণ্ড রাইস।' গ্রীষ্মে খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা শাড়িপরা ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানী মেয়ের ছবি তুলতে ভালবাসেন, ইংরেজ ফ্যাশন-এডিটর কখনও কখনও তা ছাপেনও। ইংরেজ মেয়েরা কিন্তু শাড়ি পরেন না, পরলেও কালে ভদ্রে। বরং দেখেছি অনেক ভারতীয় ললনা স্কার্ট পরছেন। এবং নিয়মিত ভাবে। এমন কি গুরুবারে ঠাকুরঘরে পর্যন্ত! শাড়িপরা এলোচুল আমাদের মেমদের সে রূপান্তর সত্যিই দেখবার মত। স্কার্ট-স্ল্যাকস তো বটেই, পেন্টিস তথা আণ্ডিজ, নাইটি ইত্যাদিতেও আমাদের নেটিভ লেডিরা আজ দিব্য সরগর।

এটাও মিথ্যা নয়, 'কামসূত্রে'র বিক্রি অভাবিত,—বাৎসায়ণ সুপরিচিত ভারতীয় লেখক! এসব সমাচারকে 'সাংস্কৃতিক বিজয়ের' প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য অন্য কথা। না করলে উৎফুল্লিত হওয়ার মত খবর সামান্য। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা। রবিশঙ্কর অনেক সমজদার শ্রোতা পেয়েছেন। অন্যরাও হয়তো পাবেন। ব্যস এটুকুই। অক্সফোর্ড-এর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট-এ' উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি। প্রাণ নেই। মনে হল যেন একটা সুসজ্জিত কফিন দেখে এলাম। প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়েছি। তার পড়ার ঘরে সাদা মুখ নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও অবশ্য ভারত-বিশেষজ্ঞ আছেন, কিন্তু ভারতীয় ছাত্ররা বলেন—ভারত বিষয়ক আলোচনা গবেষণায় ইংরাজ পণ্ডিতদের আগ্রহ নাকি স্পষ্টতই কমতির দিকে। একটা কারণ তার অবশ্যই আজকের ভারত। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত, সাদামাঠা, ভঙ্গীহীন জীবন অনেকের চোখে স্বতঃই বর্ণহীন; কিন্তু অনেকেরই ধারণা তার একটি কারণ সাম্রাজ্য নেই। ভারতের পটভূমিতে সর্বশেষ ইংরেজী উপন্যাস

পল স্কট-এর 'দি জুয়েল ইন দি ক্রাউন।' এখনও পড়িনি। শুনেছি বইটি নাকি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি, ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু কাহিনীর কাল—১৯৪২।

সাম্রাজ্য নেই।

অতএব,—'সুয়েজ-এর পূবে' পৃথিবী কোথায়? হ্যারল্ড উইলসন প্রশ্নবানে জর্জরিত।—কেন টাকা খরচ করব আমরা সেখানে?—কেন আমাদের ছেলেরা লড়াই করবে বোর্ণিওর বনে? কেন তারা পড়ে থাকবে দূর ভারত মহাসাগরের জনহীন দ্বীপে? প্রশ্নগুলো অবশ্য ঠিক এভাবে ওঠেনি। কিন্তু 'সুয়েজ-এর পূবে'র তর্কে সম্ভবত এটাই সাধারণের-মনের কথা। তুমুল তর্ক পার্টির ভেতরে, অন্য দলে খবরের কাগজে সর্বত্র 'ইস্ট অব সুয়েজ' আর 'ইস্ট অব সুয়েজ'। লিবারেলরা চান ব্রিটেন এক্ষুনি সুয়েজ-এর পূব থেকে ঘরে ফিরে আসুক। তাঁরা বলেন—কমনওয়েলথ মায়া মাত্র, এমন কথা আমরা বলছি না। আমাদের বলার কথা শুধু এই—ব্রিটেন ইউরোপের উপকূলবর্তী দ্বীপ। আমাদের ভাগ্য প্রথমে মানচিত্রের এদিকেই সন্ধান করা সঙ্গত। কনজারভেটিভরাও সাধারণত তা-ই বলেন। কমনওয়েলথ-এর চেয়ে কমনমার্কেট তাঁদের কাছে জরুরী চিন্তা। তাছাড়া ওঁরা বলেন—এই বিপুল খরচ মেটাবার ক্ষমতা কোথায়? শ্রমিক দলের নিজের ঘরেও আজ অনেকের মুখেই একই প্রশ্ন।

খরচ অবশ্য সামান্য নয়। ১৯৬৫-৬৬ সনে সামরিক খাতে ব্রিটেন-এর খরচ ছিল ২১২০ মিলিয়ন পাউণ্ড—দেশের মোট উপদানের শতকরা ৬·৮ ভাগ। ১৯৬৬-৬৭ সনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ২১৭২ মিলিয়ন পাউণ্ড। অনেক বিভাগে মাইনে বেড়েছে। বেড়েছে পেনসন ইত্যাদিও। সেদিক থেকে সামরিক ব্যয় কিঞ্চিৎ কমেছে; তবুও মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৬·৬ ভাগ এই খাতে চলে যাচ্ছে। তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাচ্ছে 'সুয়েজের

পূবে'। এ এলকায় কয়েকটি ঘাটি ছাড়াও রয়েছে 'স্টেজিং পোস্ট' বা ছোট ছোট গুটিকয় পা-রাখার বন্দোবস্ত। অ্যাডেন-এর ঘাটিতে আছেন বিমান-বহরের ৫০০০ ইংরেজ তরুণ, স্থল-বাহিনী ৮৫০০, জলে স্থলে মিলিয়ে নৌ-বাহিনীর ৫৩০০। বাহেরিণ এবং মাররিস-এর আয়োজন ধরলে এই একটি এলাকাতেই বার্ষিক খরচ ৬৬ মিলিয়ন পাউণ্ড। হংকং-এর ঘাটিতে আছেন বিমান বাহিনীর ১৫০০, স্থল বাহিনীর ৪০০০। খরচ বছরে ১৬ মিলিয়ন পাউণ্ড। সিঙ্গাপুরে আছেন বিমানবহরের ৮০০০ জন, স্থল বাহিনীর ৩৬০০০। তার ওপর ৫০টি নানা ধরনের যুদ্ধ জাহাজ, জলে ডাঙায় মিলিয়ে ১৩৭০০ মানুষ। খরচ অতএব বছরে ২৩৫ পাউণ্ড। এমন কি ভারত মহাসাগরের 'স্টেজিং পোস্ট' গান দ্বীপ, যেখানে বিমান ওঠানামা আর বেতার যোগা-যোগের ব্যবস্থা ছাড়া উদ্যোগ আয়োজন সামান্য তার জন্যও বার্ষিক খরচ প্রায় ৫ মিলিয়ন (এখানে লোক থাকেন মাত্র ৫০০। এর অনুকরণে আফ্রিকার উপকূলে অ্যালডাবরা এবং ওদিকে ডিয়েগো গারসিয়াও 'স্টেজিং পোস্ট' গড়ে তোলার নাকি ব্যবস্থা হচ্ছে)। সব মিলিয়ে 'সুয়েজ-এর পূবে' ব্রিটেন এর এখন ফৌজ আছে ৫৫ হাজার। চলতি বার্ষিক খরচ প্রায় ২৮৩ মিলিয়ন পাউণ্ড; তার মধ্যে ১২০ পাউণ্ড বৈদেশিক মুদ্রা। সুতরাং দাবি উঠেছে—ঘরে ফিরে এস।

এ দাবির সমর্থনে বলা নিষ্প্রয়োজন যুক্তি অনেক। সত্য বটে, এই এলাকায় এখনও ব্রিটিশ মূলধন পরিমাণে যথেষ্ট। বছরে ৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড ঘরে আসে শুধু দূরপ্রাচ্য থেকে। তার মধ্যে হংকং থেকে পাওয়া যায় ৫ মিলিয়ন, মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর থেকে ২৪ মিলিয়ন, ভারত থেকে ২২ মিলিয়ন, পাকিস্তান থেকে ৪ মিলিয়ন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে তার চেয়েও বেশি। প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউণ্ড, আফ্রিকা থেকে ১১০ মিলিয়ন পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড থেকে ৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড। সমা-

লোচকরা বলেন—তার জন্য ফৌজ নিয়ে বিদেশে বসে থেকে লাভ নেই। কে না জানে, বন্দুক হাতে নিয়ে বাণিজ্য একালে অচল। কোনও ইউরোপীয় জাতি যখন তা করছে না তখন আমরাই বা করব কেন? মধ্যপ্রাচ্যের কথাই ধরা যাক।—ওরা তো আর তেল খেয়ে থাকতে পারবে না! উইলসন এসব অর্থনৈতিক যুক্তি পাড়েননি। তিনি বলেন—হঠাৎ রাত ভোরে আমরা বলতে পারি না 'ওয়ার্ল্ড গো হোম'। আমাদের এখনও কিছু কর্তব্য আছে। কমনওয়েলথ-এর বন্ধুদের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে 'ইউ-এন'-এর তরফে দরকার মত স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনের কথাও। তাছাড়া, এশিয়া আফ্রিকাকে তো আমরা অন্যদের হাতে ফেলে আসতে পারি না ('to the Americans and Chinese, eye-ball to eye-ball.') ইত্যাদি। এতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখিয়েছেন অনেক। একজন টোরি-নায়ক বলেছেন—এশিয়া আফ্রিকায় নিজে থেকেই শক্তির ভারসাম্য দেখা দেবে। আমরা উপস্থিত থেকে সে প্রক্রিয়াকে আরও বিলম্বিত করছি মাত্র। বিদ্রোহী শ্রমিক সদস্যদের দাবি এ অর্থ বরং সুয়েজের পূবে উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা হোক। তার চেয়ে ভাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? তবুও উইলসন-সরকার আপাতত সুয়েজের এদিকে থাকছেন। পার্লামেন্ট-এ তাঁর দেশরক্ষা নীতি অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু এ বিজয় যে চূড়ান্ত নয়, উইলসন তাও জানেন। শুধু অ্যাডেন থেকে নয়, ব্রাইটন সম্মেলনে পার্টি বিপুল ভোটে দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে—১৯৭০ সনের মধ্যে 'সুয়েজ-এর পূব' থেকে ঘরে ফেরা চাই। আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-মালয়েশিয়া ইত্যাদির কথা মনে রাখলে ব্রিটেন-এর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব কিনা বলা শক্ত; কিন্তু ধ্যানে 'সুয়েজের পূব' উপস্থিত থাকলেও সে উপস্থিতির

আজকের চেহারা অবশ্যই পালটাবে। দেশরক্ষা যাতে খরচ ক্রমেই কাটা হচ্ছে। সামরিক আয়োজনও বদলাচ্ছে। উইলসন স্পষ্ট বলেছেন—আমরা একা কোথাও যাচ্ছি না। যে কেউ ডাকলেই বিদেশে ব্রিটিশ ফৌজ নামবে না। শাসকদের সঙ্গে প্রজাদের আর্ত আহ্বান শুনতে পেলে তবেই ভাবা হবে।সাড়া দেওয়া যায় কি না। অক্সফোর্ড-এর প্রবীণ সমরশাস্ত্র বিশারদ বলেন—ব্রিটেন মনে মনে সত্যিই সুয়েজের পূব থেকে সরে এসেছে। 'হোয়াইট পেপার' খুলে দেখ, সেখানে আর 'কম্যুনিজম আটকাবার' কথা নেই। তারপরও যদি কেউ মনে করে—'হু ডাইস ইফ ইংল্যাণ্ড লিভ,'—তা হলে সে দেশ কল্পলোকে আছে! টোরি-জমানায়ও এই পরিস্থিতিতে খুব বেশী হেরফের ঘটার সম্ভাবনা নেই। উইলসন একবার বলেছিলেন—আজকের ব্রিটিশ সরকারের হিম্মৎ আছে এই সত্য সগর্বে স্বীকার করে নেওয়ার যে ব্রিটেন আজ আর ওয়ার্ল্ড-পাওয়ার নয়। হীথ হয়তো এতখানি সৎসাহস দেখাতে পারবেন না, কিন্তু ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে বিশ্বময় তিনি খবরদারি করে ফিরবেন—এটা অবিশ্বাস্য।

'ইংল্যাণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, খেয়ালী, আর রসিক ;—বিরুদ্ধবাদী আর বিসমবুদ্ধির মানুষের স্বর্গ' —বলেছিলেন জর্জ স্যানটায়ন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এখনও বোধহয় তা-ই আছে। তিলোত্তমা না হলেও, ইংরেজ সমাজে এখনও নানা গুণের সমাহার। তার মধ্যে একটি স্বাধীনতার আবহাওয়া,—যা খুশি বলার, যেমন খুশি চলার অধিকার। ফ্লিট স্ট্রীটে দিনকয় আনাগোনা করলে বিদেশীর চোখে সহজেই ধরা পড়ে তা। মনে হয়, আশ্চর্য উন্মাদ আশ্রমে এসেছি, এখানে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মত। একজনের বক্তব্য থেকে আর একজনেরটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ সবাই সমান নিষ্ঠাবান, সমান সিরিয়াস। ব্রিটেন-এর খবরের কাগজগুলোর দিকে তাকালেই অবশ্য তা মোটামুটি বোঝা যায়। নিউজ রুম-এ কিংবা সম্পাদকের বৈঠক কিছুক্ষণ বসলে যা শোনা যায় সে আরও বিস্ময়কর। প্রতিদিন নব নব আক্রমণের উদ্যোগ হচ্ছে, লক্ষ্য কখনও সরকার কখনও বিরোধী দল, কখনও কোন ব্যবসায়ী, কখনও বা জনাকয় ফুটবল খেলোয়াড়। দরকার হয় এমন কি নিশানা কর রাজবাড়িকেই। 'ডেইলি মেল' অফিসে গল্প শুনেছি—দেশের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন একবার ও'দের কার্টুনিস্ট এমৃউড-এর ছবির বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। কার্টুনিস্টদের আয়োজিত বার্ষিক নাচের আসরে তিনি বলেছিলেন—আমার চেহারায় ব্যঙ্গের

উপাদান কম। এম্‌উড আমাকে এঁকেছেন যেন আমি র‍্যাণ্ডলফ চার্চিল। এম্‌উড এবং 'মেল' জবাব দিল পরের দিন সকালে,—কাগজের পাতায়। উইলসন নাকি কার্টুন নিয়ে আর কোনদিন এঁদের ঘাটাননি।

যুদ্ধ নিজেদের মধ্যেও লেগেই আছে, এ কাগজ ও কাগজের নির্বুদ্ধিতা প্রমাণের জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করছে,—ও কাগজ আর কোন কাগজের। এই সেদিনের কথা টমসন 'টাইমস' কিনেছেন। ফ্লিট স্ট্রীটে আলোড়ন। কাগজে কাগজে-নানা লঘু গুরু মন্তব্য। 'ডেইলি মেল'-এ প্রকাশিত হল একটি বিশেষ প্রবন্ধ। তার শিরোনামা—'টাইমস' আর ঈশ্বরের কি তারপরও এক মত থাকবে? 'টাইমস'কে উন্নাসিক খবরের কাগজ হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি লেখক। এই শিরোনামার হেতুটিকেও ব্যাখ্যা করেছেন। একবার নাকি ফরেন-অফিস থেকে 'টাইমস' সম্পাদকের কাছে অভিযোগ গিয়েছিল—তোমার একজন বৈদেশিক সংবাদদাতা যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে। সে প্রতিটি কূটনৈতিক ভোজসভায় একজন মহিলাকে নিয়ে যাতায়াত করছে। মেয়েটি নাকি তার স্ত্রী নয়। অথচ তুমি জান—। ইত্যাদি। সম্পাদক কৈফিয়ত চাইলেন রিপোর্টার-এর কাছে। তিনি উত্তর দিলেন—বিয়ে করি বা না করি ফরেন-অফিস মানুক বা না মানুক ঈশ্বরের চোখে আমরা স্বামী-স্ত্রী! এই ঘটনা তুলেই হাত-বদলের দিনে এই রসিকতা! ব্রিটেন-এর 'ফোর্থ এ স্টেট' শুধু স্বাধীন নয়, সদাহাস্য; এমন কি কখনও কখনও 'স্বেচ্ছাচারী' পর্যন্ত!

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য: ইংরাজ সমাজের সহনশীলতা। ছোট্ট দেশ। লোকসংখ্যা, আগেই বলেছি পাঁচ কোটির চেয়ে কিছু বেশি। তার মধ্যেই নানা বর্ণের অজস্র মানুষ। ১৯৬০ থেকে '৬২—এই তিন বছরেই ব্রিটেন এ বাইরে থেকে লোক এসেছে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার। তার চার ভাগের তিন ভাগ কমনওয়েলথ থেকে। ১৯৬১ সনে

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যাঁরা বাস করেন তাঁদের মধ্যে প্রায় ২১ লক্ষ নাগরিকই বিদেশে জাত। এঁদের একাংশ যদি আইরিশ, পোল, জার্মান বা রাশিয়ান তথা শ্বেতাঙ্গ হন—তবে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই আমাদের মত কালা আদমি,—কৃষ্ণাঙ্গ। এক লণ্ডন শহরেই তাঁদের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। তার পরেও আছে ৬০ হাজার মাল্টা সন্তান, ৪৫ হাজার চীনা, ১২ হাজার আরব—ইত্যাদি ইত্যাদি ট্রেন-টিউব-বাস, থিয়েটার রেস্তোরাঁ খেলার মাঠ যেদিকেই তাকানো যাক রাশি রাশি কালো মানুষ। বার্মিংহাম এর একটা রেল স্টেশনের একটি ছবি তুলেছেন পিটার গ্রিফিথস ; তাতে দেখা যায় যাত্রীরা সবাই বর্ণে কালো। ছবির তলায় তাঁর জিজ্ঞাসা—ব্রিটেন কি শ্বেত-দ্বীপ ?

কালোদের নিয়ে নানা সমস্যা। প্রতিদিনের খবরের কাগজে নানা অভিযোগ, প্রতি অভিযোগ। রাষ্ট্র, পুলিস, সাংবাদিক, সমাজসেবক—এঁদের নিয়ে নানাভাবে বিব্রত। তার সবটুকুর দায় আগন্তুকদের এমন কথা দায়িত্বশীল ইংরেজরা বলবেন না। বর্ণ-বিদ্বেষী সংখ্যায় অসংখ্য না হলেও ব্রিটেন-এ অবশ্যই আছেন। আমাকে স্মেদউইক-এর একজন তরুণ টোরি নায়ক নিজে বলেছেন—আমি চাই না ভারতীয় বা পাকিস্তানীরা এদেশে আসেন। ওরা আমাদের বাড়ি কেড়ে নিচ্ছে, চাকুরি কেড়ে নিচ্ছে, মেয়েদের কেড়ে নিচ্ছে। ইত্যাদি। ইনক পাওয়েল-এর কণ্ঠে বস্তুত এরই প্রতি-ধ্বনি। পাওয়েল এক সময় ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি অন্যতম টোরি নেতা। ১৯৬৮ সন থেকে তাঁর বাগ্মিতার অন্যতম লক্ষ্য—কৃষ্ণাঙ্গ আগন্তুকদল। তাঁর বক্তব্য—কালোদের পুরো রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া চলবে না। তিনি যে শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য ব্রিটেনের দুয়ার বন্ধ করতে চান তা নয়, তাঁর অভিমত—যারা ইতিমধ্যেই এখানে এসে জমিয়ে বসেছে নগদ টাকা খরচ করেও উচিত হবে

তাদের আবার জাহাজে তুলে দিয়ে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো।

লীডস য়ুনিভার্সিটির শ্বেতাঙ্গ গবেষক আমাকে বলেছেন—আমরা মানতে চাই না, কোনও ইংরেজই প্রকাশ্যে মানবেন না,—কিন্তু আমার ধারণা সুপ্তভাবে হলেও আমাদের মনের গভীরে কোথাও বর্ণবিদ্বেষ বীজ নিহিত আছে। তার এক প্রমাণ সত্তরের নির্বাচনে পাওয়েল এবং পাওয়েল পন্থীদের বিপুল সাফল্য। অন্য উপসর্গও দেখা দিয়েছে আজ। '৫০ এর দশকে ব্রিটেনে আবির্ভূত হয়েছিল 'টেডি বয়,' '৬০-এর দশকে দাঙ্গাবাজ 'মড' আর 'রকার'-এর দল। '৭০-এর ব্রিটেনে দেখা দিয়েছে নতুন উপদ্রব—'স্কিনহেড্‌স'। ওদের বয়স পনের থেকে আঠারো। কেউ বেকার নয়, সবাই রোজগেরে। 'স্কিন হেড' নাম ওদের চুলের ছাটের জন্য। ওদের মাথা মুড়ানো, চুল কিছুতেই আট ভাগের এক ইঞ্চির বেশী বাড়তে দেয় না ওরা। তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য ওদের না কি পায়ের জুতো জোড়ায়। জুতোর মুখ ইস্পাতে মোড়া। দাম প্রতি জোড়া—দশ ডলার। দল বেঁধে ওরা শহরের পথে হামলা করে বেড়াচ্ছে। ওদের অন্যতম নিশানা দীর্ঘ কেশ হিপি দল, সমকামীরা আর পাকিস্তানী আগন্তুকরা। শোনা যাচ্ছে—'স্কিন হেডস'-দের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য আজ শেষোক্তরাই। কেন না—'ওদের গায়ে গন্ধ। বোধহয় রসুনের!' এবং 'স্কিন হেডস'-দের মতে ওদের কোনও অধিকার নেই ব্রিটেনে বাস করার। সুতরাং ওরা 'পাকিবাসিং'-এ বের হয়েছে, অর্থাৎ পাকিস্তানীদের সায়েস্তা করতে। বলা নিষ্প্রয়োজন, 'পাকিস্তানী' বলতে ওরা ভারত-পাকিস্তান তথা এই উপমহাদেশের সব মানুষকেই বোঝে!

অবশ্য এটাও স্বীকার্য পাশাপাশি সহনশীলতার দৃষ্টান্তও অজস্র। রেলস্টেশনে একবার ভারতীয় ছাত্রদের ওপর হামলা হয়েছিল সত্য। আবার এটাও সত্য, অগণিত ইংরেজ তার জন্য প্রকাশ্যে লজ্জা

প্রকাশ করেছেন, হারানো টাইপ রাইটার-এর ক্ষতিপূরণ করতেও নাকি এগিয়ে এসেছিলেন কেউ কেউ। পাড়ার ছেলেরা যদি দেওয়ালে লিখে গিয়ে থাকে—'ব্ল্যাকস্‌, গো হোম', তবে তার পাশে বৃদ্ধ যাজক শত শত দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে লিখেছেন—'ঈশ্বর, আমাদের ক্ষমা করো।'

বর্ণ একটি জটিল সমস্যা। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সে আলোচনা পরে হবে। কালোর প্রতি সাদার ব্যবহার বা সাদার প্রতি কালোর ব্যবহার নিয়ে গভীর আলোচনায় না গিয়েই বলা চলে, আজকের ব্রিটেন সহনশীলতা কিংবা পরমত-সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বহুকাল ব্রিটেন-এ বাস করছেন এমন এক বিদেশী বলছিলেন—লণ্ডন এয়ারপোর্ট-এ কাস্টমস যেভাবে হাসি হাসি মুখে উদারতার সঙ্গে বিদেশীকে স্বাগত জানায় ইংরেজ সমাজ ঠিক তা করে না। বিদেশী সমাজের অন্তর্লোক চিরকালই বিদেশী। হতে পারে তা। কিন্তু বাইরে নিশ্চয়ই সেটা সত্য নয়। কেননা, লণ্ডন-এর পথে পথে, নগরের দৈনন্দিন জীবন যে 'কসমপলিটান' আবহাওয়া তা-ই দেখা যাবে বুদ্ধিজীবী মহলে। সেখানে যে শুধু নই পল বা জেমস বলডইন সচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন তা-ই নয়, ফ্লিট স্ট্রীটের মতই বিচিত্র- এবং বর্ণাঢ্য সেই জগৎ। সেখানে সমুদয় চিন্তা সাদা আর কালো, ভাল আর মন্দ, পূব আর পশ্চিম—ইত্যাদি বিপরীত ধারাতেই প্রবাহিত হয় না। নিম্ন বাংলার মতই অজস্র নদী-নালা-খালে খণ্ডিত বিখণ্ডিত সেই মানস মানচিত্র। সেখানে ক্ষুদ্রতম কোন গোষ্ঠীর সমর্থনে যেমন অকুতোভয় লড়িয়ের সন্ধান মেলে, তেমনই বহুমুখে 'সমস্যা' হিসাবে চিহ্নিত দেশটির সমর্থনেও সওয়ালকারীর অভাব নেই। যথা: আজকের চীন।—চীনকে বোঝার চেষ্টা করো।—চীনকে যুক্তি দিয়ে বিচার করো!—যেখানে সাংবাদিক লেখকের আড্ডা সেখানেই কারও না কারোও পরামর্শ পাকিস্তান, ফিজো—ইত্যাদির পক্ষে বিপক্ষেও নানা কথা

শুনতে হয়েছে। তবুও চীনের প্রসঙ্গটাই উল্লেখ করছি। কেননা, চীন বিষয়ে কোন কোন ইংরাজ বুদ্ধিজীবীর কথাবার্তা ভারতীয় শ্রোতার পক্ষে সত্যিই চমকপ্রদ। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে লণ্ডন-এর চীনদের বিষয়ে কিছু খুচরো খবর।

ব্রিটেন-এ অনেক চীনা আছেন। সংখ্যায় তাঁরা ৪৫ হাজারের ওপর। দশ বছর আগে ওদেশে চীনা রেস্তোরাঁ ছিল ৫০ টি, এখন প্রায় ১ হাজার। তৎকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন নাকি চীনারাজদূতের বাড়িতে খেতে গিয়ে বলেছিলেন—কী খাব? —আচ্ছা, 'নাম্বার এইট' দাও। এই 'নাম্বার এইট'টি কী বস্তু, বুঝতে চীনা কূটনীতিকরা গলদঘর্ম। শেষে বোঝা গেল এটা চীনা রেঁস্তোরায় আনাগোনার ফল। পররাষ্ট্রসচিব খাবারের নামগুলো মনে রাখতে পারেন নি, মনে আছে শুধু মেনুর একটু নম্বর যা সুস্বাদু এবং উপাদেয়। সুতরাং আড়ালে লোক পাঠিয়ে কাছাকাছি কয়টি রেস্তোরা থেকে ভোজ্য তালিকা আনা হল খুঁজে বের করা হল 'নাম্বার এইট'। শেষ পর্যন্ত দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটেও চল হয়ে ছিল 'আট নম্বর' চীনা ডিস্। আজকের ইংরাজ ভোজন-রসিক শুধু 'নাম্বার—এইট' নয়, যাবতীয় চীনা খাদ্যের সংবাদ রাখেন, এমন কি নিজের কানে শুনে শুনেছি চীনা দোকানে বসে ইংরাজ খদ্দের চীনা রান্নার সমালোচনা করছেন!

শুধু রেস্তোরাঁ নয়, লণ্ডন শহরের কেন্দ্রে কমপক্ষে ১০টি চীনা জুয়ার আড্ডা। গেরার্ড স্ট্রীটের নামই হয়ে গেছে এখন 'নিউ চায়না স্ট্রীট'। এগুলোর দরজায় ছোট্ট সাইনবোর্ড—'প্রাইভেট ক্লাব। চাইনিজ অন্‌লি।' (একটির নীচে দেখেছি পাড়ার ছেলেরা চকে লিখে রেখেছে 'চিনক্স অনলি,—বাই অর্ডার!') 'নিউ সোসাইটি' কাগজে একজন মন্তব্য করেছেন—'লণ্ডন-এ একমাত্র বর্ণবিদ্বেষী ক্লাব বলতে এই চীনা ক্লাবগুলো। ফিট ফাট পোষাকেও কোন ইংরেজের পক্ষে সেখানে ঢোকবার উপায় নেই।' তবুও

খবরের কাগজের চীনাদের নিয়ে গোলমালের খবর দেখা যায় না। এঁদের অধিকাংশই অবশ্য এসেছেন হংকং থেকে। এঁরা শান্ত, নিরীহ। কিন্তু রাজনীতি এঁদের কাছে অজ্ঞাত এমন বলা যায় না। সে বলা যায় বরং ভারতীয়দের সম্পর্কে। তাঁরা প্রধানত গৃহস্থ ; ডাল-ভাত-মাছ, চাকরি-বড় সাহেব কিংবা পরচর্চায় তাঁদের অধিকাংশের সময় কাটে। চীনারা রুজি রোজগার ছাড়াও অন্য বিষয়ে মাঝে মাঝে উৎসাহ দেখান। লণ্ডন-এ চীনা ছাত্রদের জন্য 'হংকং হাউস' নামে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি বেস্‌ওয়াটার অঞ্চলে। চীনা কূটনীতিকরা সেখানে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে থাকেন কিনা আমি জানি, না। জানার চেষ্টাও করিনি। ফ্লিট স্ট্রীট-এ সাংবাদিক মহলে শুনেছি—জুয়াখেলার আড্ডা ছাড়া লণ্ডন-এ চীনাদের আরও দুটি আড্ডা 'গঙ তুন' (লেবার ইউনিট) আর 'গঙ য়ু' (ইউনাইটেড সোসাইটি) নামে দুটি টেবিল টেনিস ক্লাব আছে। দুটি ক্লাবই নাকি বামপন্থী। সেখানে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ। সদস্যরা চীনা খবরের কাগজ বই ইত্যাদি পড়তে পারেন। ইচ্ছে করলে পিকিং রেডিও শুনতে পারেন। এছাড়া সেখানে কী ধরনের আলোচনা হয় ঝানু সাংবাদিকরাও তা সঠিক জানেন না, অনুমান করতে পারেন মাত্র। কেননা, সেখানেও তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। কিছুকাল আগে বি. বি. সি. এই ক্লাব-গুলো নিয়ে একটা ফিল্ম তোলার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। ক্লাবের পরিচালকরা অনুমতি দেননি। সো হোর একটা সিনেমা হলে মাঝে মাঝে চৈনিক ফিল্ম দেখানো হয়। 'সানডে টাইমস'-এর একজন সংবাদদাতা (ম্যালকম সাউদার্ন) একদিন গিয়েছিলেন সেখানে। এসে লিখলেন—সব কম্যুনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা ফিল্ম। চীনারা নিঃশব্দে বসে দেখছেন। যাঁরা দেখাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। ওঁরা আভাসে ইঙ্গিতে যা বলতে চাইলেন তার অর্থ—তুমি কী বলছ আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা

ইংলিশ জানি না। আশ্চর্য এই, আমি একটু সরে দাঁড়াতেই ওঁরা নিজেদের মধ্যে কিন্তু ইংরেজীতেই কথা বলছিলেন। ম্যালকম ফিল্মগুলো সম্পর্কে আরও খবর জোগাড় করার জন্য কাস্টমস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওঁরা জবাব দিয়েছেন—ফিল্ম সেন্সার করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ ফুট-ইঞ্চি মাপা!

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। চ্যানসারি লেন-এ 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি'র বেশ বড় অফিস। কাচের জানালায় মাও-সে-তুং-এর বিরাট প্রতিকৃতি। মাও-এর সাঁতারের খবর বের হওয়ার পর আরও খবরের জন্য 'সানডে টাইমস' লোক পাঠালেন সেখানে। কিন্তু একটি কথাও বের করা গেল না কারও মুখ থেকে। পিকিং থেকে যে বুলেটিন পাঠানো হয়েছে তার ওপর ওঁদের আর যোগ করার কিছু নেই। 'সানডে টাইমস' লিখছে এঁরা সাংবাদিক নামে মাত্র, আসলে রাজনীতিক। কারও সঙ্গে ওঁদের মিশতে দেখা যায় না। হ্যামস্টেড-এর একটা বাড়িতে একসঙ্গে ওঁরা থাকেন; সরকারি গাড়ি চড়ে একসঙ্গে অফিসে আসেন অফিস শেষে সোজা বাড়ি ফিরে যান। ওঁদের অফিসে গিয়ে কোন খবর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাটা কাটা কথা। কথা শেষ হতে না হতে 'থ্যাংক য়ু' বলে উধাও।

আশ্চর্য এই একঘেয়েমি এবং এ-ধরণের পাবলিক রিলেশন্স-এর পরেও ব্রিটেন-এ আজ চীনের পক্ষে সওয়াল করার লোকের অভাব নেই। চীন সম্পর্কে অনেক বিখ্যাত সাংবাদিক এবং লেখকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমার। লুই মিচিসন, ভিকটর জোরজা, ম্যানচেস্টার-এ 'গার্ডিয়ান' সম্পাদক মিঃ রেডহেড এবং আরও অনেকের সঙ্গে।

লুই মিচিসন বলেন—আসলে বিবাদ চীন আর আমেরিকার মধ্যে। এবং তার পেছনে অন্যতম একটা কারণ পরস্পরের প্রতি

সন্দেহ। এর অবসান ঘটানো দরকার। ভারতের সঙ্গে বিবাদের হেতু এখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। তবে তিনি মনে করেন ভারতীয়দের উচিত চীনের মন বোঝার জন্য নতুন করে চেষ্টা করা। চীন সম্প্রসারণশীল এ ধারণা খুব যুক্তিপূর্ণ নয়। আলোচনা শেষে তাঁর সহাস্য মন্তব্য : পাকিস্তানকে ধন্যবাদ। এরা একটা জানালা খুলেছে। পশ্চিম ইচ্ছে করলে তার মাধ্যমে চীনের দিকে তাকাতে পারে। সম্প্রতি চীন বিষয়ে মিস মিচিসন-এর একটি বই বেরিয়েছে। নিউ স্টেটসম্যান লিখেছে : বইটি 'ফেয়ার অ্যাণ্ড ক্লীয়ার।'

ভিকটর জোরজা কম্যুনিস্ট সংক্রান্ত বিষয়ে খ্যাতনামা ভাষ্যকার। চীন যে ১৯৬২ সনে ভারতকে আক্রমণ করেছিল এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। তবে 'গার্ডিয়ান'-এর সম্পর্কে রেডহেড সাহেব বলেন—ভবিষ্যতে চীন ভারত আক্রমণ করবে তা তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে ভারতের বিপদ আসতে পারে দেশের ভেতর থেকেই। জোরজা তাঁর সঙ্গে হুবহু একমত নন। তিনি মনে করেন—দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য চীন আবার বাইরে হামলা করতে পারে। 'সামরিক বাহিনীকে ব্যস্ত রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় তাদের সামরিক কাজ দেওয়া।—নয় কি?' সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জোরজার অনেক বক্তব্যের একটি : এই ঝাড়াই বাছাই অনিবার্য ছিল। ফরাসী দেশে বিপ্লবের পরে সে কাজ সম্পন্ন করেছে গিলোটিন। রাশিয়ায় ফায়ারিং স্কোয়াড ; আর চীন দেশে তার দায়িত্ব নিয়েছে স্কুলের ছেলেরা। তারা সন্দেহভাজনদের নাম কেটে দিচ্ছে মাত্র।—এ বিপ্লব অনেক সভ্য নয় কি? নিউ-স্টেটসম্যান-এ একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন—আমরা পছন্দ করি বা না করি, মাওকে নিয়ে হাসাহাসি ঠিক নয়। 'গার্ডিয়ান'-এ চীনের চলতি রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সমালোচনা করে একজন তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার উত্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন চারজন চীন-ফেরত অধ্যাপক। তাঁরা বলেন—চীনে

নতুন সভ্যতা যে গড়ে উঠেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলস্টার ল্যাম ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে নতুন বই লিখেছেন। দাম—পাঁচ গিনি। তাঁর নাকি ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে সমালোচক বলেন—ভারতীয়দের উচিত বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়া! সঙ্গে সঙ্গে বক্র মন্তব্য—পড়বে কি? —ভারতে আবার আজকাল এসব বইয়ের ওপরও নিষেধাজ্ঞা!

আশ্চর্য সহানুভূতি। লেখকদের কেউ কেউ স্বনিষ্ঠায় চীনকে বোঝাতে চাইছেন, বি. বি. সি. চীনা ভাষার ক্লাস খুলেছেন, দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলছেন—চীনের যুদ্ধ করার 'ইচ্ছা' এবং 'ক্ষমতা' আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ। সাংস্কৃতিক 'বিপ্লবে ব্রিটিশ কূটনীতিকদের হেনস্তা, রয়টারের সাংবাদিক আটক—ইত্যাদি ঘটনার পরও সরকার এবং জনসাধারণ কিন্তু এই বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেননি। শুনে মনে হতে পারে গোটা ব্রিটেন আজ চীন-পন্থী। মোটেই তা নয়। ভারতে বন্ধুও আছেন। (তা ছাড়া, চীনের বন্ধু মানেই ভারতের শত্রু, এই ধরনের রাজনৈতিক ন্যায় লেখকদের ক্ষেত্রে সব সময় চালাতে গেলে সেটা নির্বুদ্ধিতা হবে) ফ্র্যান্সিস ওয়াটসন লিখেছেন আর এক বই—'ফ্রন্টিয়ার্স অব চায়না।' সেখানে ম্যাকমেহন লাইন 'আন্তর্জাতিক সীমানা।' ল্যাম নাকি লিখেছেন—'৫৯ সনে চেষ্টা করলে ভারত চীনের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে পারত। 'গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় প্রশ্ন—তার প্রমাণ কী? চীনের লোভ যে আরও বেড়ে যেত না কেউতা হলপ করতে পারেন কি?

সুতরাং প্রশ্ন সেখানে নয়। পর্যবেক্ষকরা শুধু ভাবেন—চীন সম্পর্কে আজকের ব্রিটেন-এর বুদ্ধিজীবীদের এই ব্যাপক সহানুভূতির উৎস কোথায়? চৈনিক রাজনীতিকরা হয়ত ব্রিটেন-এ কেবল ঘুমিয়েই কাল কাটান না; চীন-ব্রিটেন মৈত্রী সংঘ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ দলাদলি তার একটা ইঙ্গিত। কিন্তু ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী

তাঁদের পরামর্শে মতামত স্থির করছেন সে বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত নয়। স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এসবের পেছনে প্রেরণা তাও বলা যায় না। ওঁরা দল হিসাবে খুবই ছোট। '৫০-এর পর থেকে পার্লামেন্ট-এ একজনও কম্যুনিস্ট আসতে পারেননি। 'মর্নিং স্টার'-এর প্রচারসংখ্যা ৬০ হাজারের চেয়ে খুব বেশি নয়। উইলসন অভিযোগ করেছিলেন—নাবিক ধর্মঘটের পেছনে রয়েছেন জনাকয় কম্যুনিস্ট। ওঁরা নাকি দলে ছোট হলেও গোলমাল বাঁধাবার ক্ষমতা রাখেন। যে চীন-লবির কথা এখানে বলা হল সেটা ধর্মঘটের মত কোন বাস্তব চাক্ষুষ ঘটনা নয়,—মতামতের প্রশ্ন মাত্র। তবে কি চীনের বন্ধুত্ব কামনায়ই এসব নানা মতের সমন্বয়ে বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে? কোন কোন ভারতীয় পর্যবেক্ষক বলেন—সেটা অসম্ভব নয়। চীনা-বাজার ব্রিটেন-এর কাছে রীতিমত এক সুখ-স্বপ্ন। ১৯৬৪ সনে ব্রিটেন চীন দেশে রপ্তানি করেছে ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড দামের পণ্য। ১৯৬৫ সনে—২২০ লক্ষ পাউণ্ড-এর। সেটা বাড়ছে, আরও বাড়ানো প্রয়োজন। বস্তুত ইতিমধ্যে তা অনেক বাড়ানো হয়েছে। বাড়তে বাড়তে ১৯৬৯ সনে পৌঁছেছে—৯২০ লক্ষ পাউণ্ডে। আশা করা হচ্ছে '৭০-এর আর'ও বাড়বে। বছরের প্রথম চার মাসেই না কি রপ্তানি হয়েছে ২১০ লক্ষ পাউণ্ডের পসরা। অথচ ইতিমধ্যে চীনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদও কিন্তু কম হয়নি; সাংস্কৃতিক বিপ্লব উপলক্ষে দূতাবাসে হামলা বা রয়টারের সংবাদদাতাকে আটকের ঘটনা হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন, কিন্তু চীনে নাকি এখনও আটক রয়েছেন সাতজন ব্রিটিশ নাগরিক। তারই মধ্যে '৭০-এর মে-দিবসে ব্রিটিশ কূটনীতিকের সঙ্গে চেয়ারম্যান মাওয়ের করমর্দনের ঘটনা। এবং তারপরই রানীর জন্মদিনের সম্বর্ধনা সভায় চীনের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আবির্ভাব; ব্রিটেন নাকি অতঃপর প্রত্যাশায় উন্মুখ। তার আশা —চীনের সঙ্গে বাণিজ্য এবং বন্ধুত্ব দুই-ই এবার আরও বাড়বে।

শুধু বাণিজ্যের জন্যই ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী মাও-এর হয়ে লড়াই করছেন একথা মন বিশ্বাস করে না। তবুও ঘটনাগুলো উল্লেখ করতে হল। কেননা একজন ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীই বলেছেন—যে সব মতামত আমাদের স্বার্থের অনুকূলে সেগুলো প্রচার করার ইচ্ছা ইংরেজ চরিত্রের গভীরে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে, তা এড়িয়ে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই স্বীকারোক্তিটি স্যামুয়েল বাটলার নামে একজন ইংরেজের।

টিকিটের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা: যদি তুমি একান্তই না যেতে চাও তবে দয়া করে এটা ফেরত পাঠাবে, আমাদের ওয়েটিং-লিস্ট-এ এখনও হাজার হাজার প্রার্থী রয়েছেন। টিকিটটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ি ল্যাণ্ডলেডি বললেন্—যাবে না মানে? তোমার জন্য রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার। এ সুযোগ ক'জন পায়? খাস লণ্ডন-এ জন্ম আমার, আজন্ম এখানেই আছি, কিন্তু কই, একবারও কি রানীর জন্মদিনের প্যারেড দেখতে পেলাম? এবারও সেই টেলিভিসনই ভরসা।

সুতরাং যেতে হল। আলো ঝলমল জুন-এর সকাল। বাকিং-হাম প্যালেস-এর চত্বর ঘিরে জনতার সমুদ্র। ঢেউয়ের মত একের পর এক গ্যালারি; হঠাৎ তাকালে মনে হয় ঢাকনাহীন মস্ত মস্ত কতকগুলো রংয়ের বাক্স। সবশেষে রঙ যেখানে গড়িয়ে এসে মাটিতে পড়েছে সেখানেও অজস্র মানুষের ভিড়, যেন পাঁচমিশেলি টিউলিপ-এর ঝাড়। সন্দেহ নেই, সবাই আজ সেরা পোশাকে সেজে এসেছেন। ভিড় ঠেলে তাদের মধ্যেই হারিয়ে গেলাম। তাছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। আমার হাতে সুদুর্লভ যে টিকিটটি সেটি দাঁড়াবার জায়গার জন্যই, দুটি পা রাখার মত জমি, তার চেয়ে বেশী কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

তখনও রানী আসেননি। নরম সবুজ মাঠে মোমের পুতুলের মত সাজানো নিশ্চল সৈনিকের দল। মাথায় উঁচু উঁচু কালো টুপি।

গায়ে লাল উর্দি। যেন সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতকের কোন ইতিহাসের বই থেকে ছিঁড়ে আনা একটি ছবির পাতা। ছবিটি রঙীন। তাকে ঘিরেই শিশুর মত আনন্দিত উদ্বেলিত এই জনতা, অঙ্গনময় এই উৎসবের আবহাওয়া। চোখ হঠাৎ বিশ্বাস করতে চায় না।

জানা ছিল রাজপরিবার ব্রিটেন-এ জনপ্রিয়। শুধু ব্রিটেন-এ কেন, সম্ভবত আরও অনেক দেশেই। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন—পৃথিবীতে কোনদিন কোথাও এমন কোন রাজা ছিলেন না যিনি কোন না কোন অপরাধ না করেছেন। তাঁর মতে সিংহাসন অপরাধের প্রতীক। বাইবেল-এ স্যামুয়েলও কার্যত তাই বলেছিলেন। ইসরাইল-এর জনতা প্রার্থনা জানিয়েছিল—আমরা একজন রাজা চাই—রাজা! স্যামুয়েল তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন—রাজা তোমাদের ছেলেদের কেড়ে নেবে·· তোমাদের মেয়েদের কেড়ে নেবে···সেদিন এই রাজাই তোমাদের কাঁদাবে। ওরা উত্তরে বলেছিল—না, আমরা তবুও একজন রাজা চাই। প্রভু বলেছিলেন —তবে তাই হোক।

তারপর পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেক কাঁদিয়েছেন রাজারা প্রজাদের। প্রজারা কাঁদিয়েছে রাজাদের। এমন কি ইংল্যাণ্ড-এও। প্রথম চার্লস-এর বিপর্যয়কে 'দুর্ঘটনা' বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। তাঁর আগে পরে নানা দেশে আরও অসংখ্য বিভ্রাট। একালে ফরাসী বিপ্লবে যদি তার শুরু ধরি, তবে এই শতকের প্রথম দিকে তার ভয়াবহ বিকাশ। ইংল্যাণ্ড-এ রাজা তখন সপ্তম এডোয়ার্ড। তিনি জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। সম্রাটোচিত গৌরবও ভোগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর (১৯১০) পর রাজকীয় শবাধারের পিছনে শোকযাত্রায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নানা দেশের নয় জন রাজা, একজন সম্রাট, পাঁচজন যুবরাজ, চল্লিশ জন নানা মাপের রয়াল হাইনেস, তিনজন রানী, চারজন রানীমাতা এবং আরও অনেক সদ্বংশীয় গণ্যমান্যগণ।

আধুনিক পৃথিবীতে রাজতন্ত্রের সেটাই সুবর্ণ যুগ। তারপরই সাধারণ-তন্ত্রের ঝড়ে তাসের ঘরের মত খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছিল ইউরোপের বনেদী রাজবাড়িগুলো। পাঁচ মাসের মধ্যে পর্তুগাল আপন রাজাকে ছুটি দিয়ে সাধারণতন্ত্রী হয়ে গেল। তারপর ক্রমে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, গ্রীস। সপ্তম এডোয়ার্ড সে ঝড়ের সংকেত দেখে গিয়েছেন। তিনি আপন পুত্র ভবিষ্যতের সম্রাট পঞ্চম জর্জকে অতিথিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন—ইনিই হচ্ছেন ইংল্যাণ্ড-এর শেষ রাজা, 'লাস্ট কিং অব ইংল্যাণ্ড'। সেই ইংল্যাণ্ড-এরই রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমি দূর দেশের আগন্তুক দেখছি, ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। লক্ষ লক্ষ প্রজা নিঃশব্দে তাদের রানীকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে। অন্যদিন যে রাজধানী অতি ব্যস্ত, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় যে জনতার জীবন, আজ যেন তার সব কাজ থেকে ছুটি। রানীকে অভিবাদন, অভিনন্দন জানানো ছাড়া কোন কাজ নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এদের সে সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে কমপক্ষে আরও পঁয়ষট্টি মিনিট। অভাবিত, অভাবিত!

আমরা জানি পঞ্চম জর্জ ইংল্যাণ্ড-এর শেষ রাজা ছিলেন না। সার হ্যারল্ড নিকলসন হিসেব করেছেন তাঁর পঁচিশ বছর রাজত্বে পঞ্চম জর্জ দেখেছেন চোখের সামনে পাঁচজন সম্রাট, আটজন রাজা এবং আঠারোটি ছোটবড় রাজবংশ জনতার ক্ষোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমরা একথাও জানি, ইংল্যাণ্ড অন্যতম ব্যতিক্রম। সে আগুনের আঁচ থেকে ব্রিটেন সেদিন অনেক দূরে। মিশরের ফারুক সিংহাসন হারাবার আগে বলেছিলেন—অচিরেই দেখা যাবে পৃথিবীতে রাজা আছেন মাত্র পাঁচজন। তাসের চার রাজা, আর ইংল্যাণ্ড-এর রাজা। ফারুক সঠিক বলেননি। পৃথিবীতে এখনও রাজা আছেন কমপক্ষে চল্লিশ জন। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইউরোপে—সর্বত্র। অবশ্য তাঁদের মধ্যে 'কিং অব টোংগা' এবং গ্র্যাণ্ড ডিউক

অব লুক্সেমবার্গ-এর মত নরপতিরাও আছেন। তাদের বাদ দিলে সাচ্চা রাজার সংখ্যা এক কুড়িও হবে কিনা সন্দেহ। এঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনের অধিকার আছে বোধহয় মাত্র জনা আটেকের। তবু একথা অবশ্যই স্বীকার্য—গদীয়ান রাজা ব্রিটেনের বাইরে অন্যত্রও আছেন।

জাপান-এর সম্রাট ১৯৪৬ সনে বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন—তিনি নরপতি হলেও একজন নরমানব-মাত্র। প্রজারা তবুও বানপ্রস্থ মঞ্জুর করেনি তাঁকে! বছরে সানন্দে ৬০ লক্ষ ডলার খরচ করে তারা রাজা এবং রাজপরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য। বারোশ' লোক কাজ করে এক রাজবাড়িতে। ৩৮০ লক্ষ ডলার খরচ করে তৈরি হচ্ছে জাপরাজের নতুন প্রাসাদ। মরক্কোয় রাজা হাসান-এর গ্যারেজ বোঝাই দামী গাড়ি, হারেম বোঝাই রূপসী নারী। দশ দশটি প্রাসাদ তাঁর। তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার পরও নাকি সমান জনপ্রিয়। ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি এখনও ওল্ড টেস্টামেণ্ট-দিনের 'লায়ন অব জুডা'; যেমন শক্তিধর, তেমনই জনপ্রিয়। পুরানো যাদু অতএব এখনও মোটামুটি বেশ কার্যকর।

বলবানেরা, 'যাদুকরেরা' যদি এখনও প্রজাপ্রিয় হতে পারেন, তবে 'বোর্ড-চেয়ারম্যান-এর' মত নিয়মতান্ত্রিক রাজারাই বা তা হবেন না কেন? এঁদের বলা চলে 'হেরেডিটরি প্রেসিডেণ্ট।' কে না জানে, ব্রিটেন-এ রাজা-রানী 'রাজত্ব' করেন মাত্র, 'শাসন' করেন না। ক্ষমতার কথা ধরলে রানীর অনেক ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছে করলে দেশের সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে পারেন,...ইচ্ছে করলে যুদ্ধ-জাহাজ বেচে দিতে পারেন,...ইচ্ছে করলে রাজ্যের সমুদয় সাহেবকে 'লর্ড' বানিয়ে দিতে পারেন... ইত্যাদি। কিন্তু পথের মানুষও জানেন—রানীর এসব ইচ্ছে হয় না,—হতে পারে না। তবুও বাকিংহাম প্রাসাদের অঙ্গনে ভিড়ের বহর দেখে আমি বিস্মিত। কারণ আমার জানা ছিল ব্রিটেন

ভারত নয়। আমাদের দেশ যেমন রাজা-রাজড়ার দেশ, তেমনই গরিবেরও দেশ। জীবনে অন্য আমোদ সামান্য। উত্তেজনার উপাদান অতিশয় কম। তার জন্যও ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজবাড়ীর দেওয়ালের চারপাশে ঘুর ঘুর করা ছাড়া উপায় নেই। রাজারানী তাই আমাদের আলো-বঞ্চিত নিরানন্দ মানুষের কাছে অন্যতম দর্শনীয়। তাঁদের নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। তাঁরা অন্যতম আলোচ্য, অফুরন্ত মুখরোচক গুজবের উৎস। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের জনতা যদি সাধারণের বদলে রাজা রানীদের ভোটের বাক্সে নিজেদের ভালবাসা ঢেলে দিয়ে থাকে তবে সে দায়ও সম্ভবত পুরোপুরি তাদের নয়। দেশের তথাকথিত সাধারণতন্ত্রীরা রাজন্যবর্গের সঙ্গে নিজেদের ফারাক অশিক্ষিত মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারেননি বলেই এই বিচার বিভ্রাট। কিন্তু ব্রিটেন-এ কাহিনী সম্পূর্ণ অন্য। সেখানে গণতন্ত্র সুস্পষ্ট, জনতা শিক্ষিত, ব্যস্ত। তাছাড়া দেশে আমোদের আয়োজনেও কোন কমতি নেই। তারপরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অজস্র মানুষের কেন এই প্রতীক্ষা? এত উৎসাহ, এমন অবিচল ভক্তি—কী তার উৎস?

একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ভিড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রথম দর্শনে যা মনে হয়ছিল পুঞ্জীভূত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ; ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই জনতায় ইউরোপ-আমেরিকার টুরিস্টরা আছেন, আছেন আমার মত আরও দূরের কৌতূহলীরাও। আমার চার পাশে দাঁড়িয়ে দেশজ যে অভাজনের দল তাদের মধ্যে ছোটরা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। তার পরেই বুড়োরা। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা নাতিনাতনী নিয়ে এসেছেন, মা বাবা ছেলেমেয়ে নিয়ে। তরুণ-তরুণীরাও আছেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা স্পষ্টতই কম। বন্ধু হয়ত বান্ধবীকে নিয়ে এসেছেন। বান্ধবী বান্ধবীকে। থিয়েটার দেখাবার বা রেস্তরাঁয় খাওয়াবার মত ব্যাপার। আধুনিক, 'প্রগতিশীল' বাঙালী যুবকের ঠাকুর দেখতে

বের হওয়ার মত কেউ কেউ যে এসেছেন নেহাৎ চাপে পড়ে অথবা অন্য কোন মতলবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আমার পাশের ছেলেটি থেকে থেকেই তার বান্ধবীকে বলছে—বলিহারী মেয়েদের সখ! 'এক্সকিউজ মি' 'এক্সকিউজ মি' বলতে বলতে ভিড়ে সুড়ঙ্গ কেটে পালিয়ে গেল এক জোড়া। 'কোথায় 'ঈশ্বরের বিভূতি' সন্দর্শন করার ব্যাকুলতা, কোথায়ই বা 'গণ-অবতারকে' দর্শন করার জন্য সেই আকুলি-বিকুলি? (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রানীর অভিষেকের সময় একজন যাজক ঘোষণা করেছিলেন—স্বর্গ আর মর্তে আর বিশেষ কোন পার্থক্য রইল না! আর একজন যাজক রাজাকে আখ্যা দিয়েছিলেন—'ইনকারনেশন অব হিজ পিপল।') ভিড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর আমার মনে হল—হয়ত নিছক সময় কাটাতে বা আমোদ করতে আসেনি ওরা, কিন্তু এই জনতার একটা বৃহৎ অংশই যেন একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ার আমেজে আছে। অথবা একটি ঐতিহাসিক নাটক দেখতে এসেছে। এ নাটকের নায়িকাকে তারা ভালবাসে, তাঁর সম্পর্কে আগ্রহও তাদের যথেষ্ট, বোধহয় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

রানী এলেন। অশ্বারূঢ়া রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। খবরের কাগজের ভাষায়—'Into this eager void came—the world's principal human being. Her Majesty the Queen.' পিছনে দরবারী পোশাকে, মাপা, ব্যবধান রেখে ডিউক অব এডিনবরা, লর্ড মাউণ্টব্যাটন এবং অন্য গণ্যমান্যরা। বাদ্যে 'গড সেভ দি কুইন', জনতার হর্ষধ্বনিতেও তা-ই। শুরু হল অনুষ্ঠান। প্রথমে মনোজ্ঞ, তারপর একঘেয়ে এবং ক্রমে ক্লান্তিকর। ভিড় তবুও অটুট। রানী যতবার সামনে দিয়ে যান ততবার নব নব উচ্ছ্বাস। ফাঁকে ফাঁকে নানা কথা।

—রানীকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে,—তাই না?

আরও ভাল লাগছে টুপিটার জন্য। আঃ চুলগুলো কী সুন্দর!

—আমার কিন্তু আরও ভাল লাগছে ডিউককে। দুই বান্ধবীর আলোচনায় যোগ দিলেন তৃতীয় এক মহিলা—কেমন জমকালো পোষাক পরেছেন।—প্রিন্স এণ্ড্রু দেখতে একদম বাপের মত হয়েছে—তাই না?

চোখ থেকে চশামাটা খুলে নিয়ে একজন আধবয়সী ভদ্রলোক বললেন—রানীর বয়স হয়েছে বেশ বোঝা যায়! তবে কুইন ভিক্টোরিয়ার চেয়ে অনেক বেশি চার্মিং।

আলোচনার গতি দেখে আমার ভারতীয় জনতার কথা-ই মনে পড়ল। তারাতলার কৃষিমেলায় বিলাতী রানীকে দেখার জন্য সমবেত আর বাকিংহাম প্যালেস-এর উঠোনে জমায়েত এই প্রজাবর্গের কথা-বার্তায় পার্থক্য অতি সামান্য। শুনেছি অভিষেকের সময় রানীর পোশাক দেখে বিলাতী শ্রমিক-বৌ পাশের একজনকে বলেছিলেন—এটা নিশ্চয়ই উনি সংসার খরচা বাঁচিয়ে কেনেননি! সে ধরনের কোন মন্তব্য অবশ্য আমার কানে পৌঁছয়নি! কিন্তু জয়ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে এবং তারপরে ফেরার পথে কাফেটারিয়ার ভিড়ে যা শুনেছিলাম তা-ও মনে রাখবার মত। অরঞ্জে জুস কিনতে কিনতে একজন বললেন—রানীরও নিশ্চয় এতক্ষণে তেষ্টা পেয়ে গেছে। আর একজনের মন্তব্য—যা বলিস ভাই, রানী হওয়া সহজ কাজ নয়।—পারবি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই রোদ্দুরে ঘোড়ার পিঠে ঠায় বসে থাকতে···ইত্যাদি।

বৃটেন-এর জনসাধারণ, সন্দেহ নেই তাঁদের রানীকে ভালবাসেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম, শীতের ভোরে ঠাণ্ডা ঘরে কাঁপতে কাঁপতে গেরস্থ ইংরাজ-বৌ মনে মনে বলছে—'লেট আস্ হোপ দি কুইন ইজ ওয়েল কফারড।' আর এক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল এক মহিলার সগর্ব ঘোষণা—আমার সাধ্যমত রাজপরিবারের সেবা আমিও করেছি বইকি! আমি যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে তেরো নম্বর কার্ডটি গ্রহণ না করতাম তাহলে সেটি প্রিন্সেস মার্গারেটের

ভাগ্যে জুটত। আমার ছেলের জন্ম রেজেষ্ট্রি করতে গিয়ে দেখি রাজকুমারীর জন্য অপেক্ষা করছে অপয়া তেরো।

এজাতীয় অনেক কাণ্ডই ঘটে। রাজকুমারী অ্যান কম বয়সেই ঘোড়া ভালবাসছেন শুনে উদ্বিগ্ন প্রজার চিঠি—এতটা ভাল নয়, ঘোড়া তাঁর রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু সে ভালবাসা রাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগবশত কিনা, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। তাছাড়া, মানতেই হবে এই ভালবাসায় রকমফের আছে। একজন আমেরিকান দর্শক লিখেছেন—যাঁরা ব্রিটেন-এ বাস করেছেন তাঁরাই জানেন, রাজপরিবারকে নিয়ে মাতামাতি করেন একমাত্র দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। তথাকথিত নিচু স্তরের মানুষও অভিষেক বা জুবিলি উৎসবে সানন্দে সাড়া দেন বটে, কিন্তু তাঁদের জীবনে রাজারানীর কোন স্থায়ী নেই। ('The Twilight of the British Monarchy', by an American Resident) ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক রিচার্ড হগার্ট-এরও তা-ই ধারণা। তিনি বলেন—দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ আদর্শে রাজতন্ত্রী নয়। তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও নয়। রাজা-রানীদের বিরুদ্ধে তাদের কোন ক্ষোভ নেই। তারা সাধারণত এঁদের অবহেলা করে, আগ্রহ দেখায় সেটুকুর জন্যই ওঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব হিসাবে যেটুকু আকর্ষণীয়। ওরা যা মানবিক, যা নাটকীয় তাই ভালবাসে। বর্ণহীন গণতন্ত্রী সরকারী নায়কের চেয়ে তা-ই কখনও কখনও রাজবাড়ির কোন কোন 'মানুষ' তাহাদের আগ্রহান্বিত করে। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। তারা রাজপরিবারে 'গ্লেমার' —চাকচিক্য খোঁজে। তাদের কাছে ফিল্ম স্টার আর রাজবাড়ির মানুষগুলো এক।

রানী এবং রাজপরিবারকে ঘিরে অতএব জনতার কৌতূহলের অন্ত নেই। যেখানে রানী এবং রাজবাড়ির মানুষরা সেখানেই কৌতূহলী জনতা। কি খেলার মাঠে কাপ-বিতরণ অনুষ্ঠানে, কি

নতুন কোন ব্রীজ-এর উদ্বোধন-পরবে। এমন কি, যখন জানালায় কোন মুখ নেই তখনও বাকিংহাম-প্যালেসএর রেলিংয়ের বাইরে থোকা থোকা মানুষের ভিড় লেগেই আছে। ক'জন অসাধারণ মানুষ সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল কত তীব্র সেটা আরওঅনুমান করা যায় ব্রিটেন-এর খবরের কাগজগুলোর দিকে তাকালে। রাজপরিবার তাদের পাতায় সেরা খবর। শুধু রানী নন, প্রাসাদের সকলের ওপরই রিপোর্টারদের তীক্ষ্ণ নজর। পাছে পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে ঠেকে, সেজন্য অনেকেরই লক্ষ্য মুখরোচক খবরগুলো। যেমন—কাল রেস-এর মাঠে রানীর মুখটা যেন ভার ভার ঠেকল। ডিউক-এর মুখে বিরক্তি। শিরোনামা-ব্যাপার কী?—'হোয়াট ক্যান দি ম্যাটার বি?' আর একবার জিব্রাল্টার-এ রানীর সঙ্গে ডিউক-এর মিলিত হওয়ার কথা। ডিউক সময়ে পৌঁছতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে কাগজে নানা সম্ভব অসম্ভব গুজব। পাঠকপাঠিকার দুশ্চিন্তা দূর হল শেষ সংবাদ পেয়ে—উদ্বেগের কোন কারণ নেই। ডিউক-এর সঙ্গে রানীর দেখা হয়েছে। দু'জনের সাক্ষাতের পর পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন—রানীর ঠোঁটের রঙ ঠিক নেই!

বলা নিষ্প্রয়োজন, পাঠকপাঠিকারাও এই খেলায় তুমুল উৎসাহে সাড়া দেন। অষ্টম এডোয়ার্ড-এর প্রণয় উপলক্ষে যেমন তা দেখা গেছে, তেমনই দেখা গেছে রাজকুমারী মার্গারেট-টাউনসেণ্ড আখ্যান উপলক্ষেও। (সেদিনের একটি হেড লাইন—Come on Margaret! Please make up your mind! And for Pete's shake put him out of his 'misery.) রাজবাড়িতে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে যেমন খবরের কাগজে চিঠিপত্র 'কলাম'-এ উচ্ছ্বাসের বান ডাকে, নবাগতের কী নাম রাখা উচিত তাই নিয়ে গভীর আলোচনা চলে, তেমনি রাজপুত্রের লেখাপড়ার কী বন্দোবস্ত হওয়া সঙ্গত তা-ই নিয়েও আলোচনার অন্ত নেই।

তখন ব্রিটেন-এ রাজকুমার চার্লস-এর পড়াশুনা নিয়ে এ ধরনের একটি বিতর্ক চলছে। রাজকুমার সবে তখন আঠারোয় পা দিয়েছেন। তাঁর স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে।—এবার? 'নিউ স্টেটসম্যান'-এ পল জনসন লিখেছেন—প্রধানমন্ত্রীর উচিত সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত দেওয়া। 'রাজাদের অবশ্য মেডেল ইউনিফর্ম ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে হয়। তাঁর মা দুটিই ভাল চেনেন। সুতরাং, চার্লস তাঁর কাছ থেকে—নিশ্চয় সে বিদ্যা শিখে নিয়েছেন।'···ইত্যাদি। পুরানো তর্ক। অনেক প্রজা মাথা খাটিয়েছেন ভবিষ্যত রাজার লেখাপড়া নিয়ে। রাজবাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির বিশেষ কদর নেই। চার্লস-এর এক খুড়ো গ্লস্টার-এর প্রিন্স রিচার্ড নাকি তখন পর্যন্ত সমগ্র রাজপরিবারে একমাত্র গ্র্যাজুয়েট।

রানী এলিজাবেথ সুশিক্ষিত। তিনি অঙ্কে তত ভাল ছিলেন না বটে, কিন্তু রানীর পক্ষে দরকারী আর সব বিষয়ই ভাল করে শিখেছেন। তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছেন শিল্পকলা—বিশেষত সঙ্গীত তারিফ করতে শিখেছেন। তাছাড়া তিনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন, ফরাসী এবং জার্মান ভাষা জানেন. স্ব-রাজ্যের এবং বংশের ইতিহাস জানেন, এমন কি কিছু কিছু মোটর মেকানিজমও! (শেষোক্তটি নাকি তিনি যুদ্ধের সময় শিখেছিলেন।) কিন্তু সবই শিখেছেন তিনি স্কুল কলেজে না গিয়ে, প্রধানত বাড়িতে। ছেলের ক্ষেত্রে সেটা সঙ্গত নয় বিবেচনা করেই হয়ত চার্লসকে ওঁরা পাঠিয়েছিলেন স্কুলে। দূর অস্ট্রেলিয়ায়। কেম্ব্রিজ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—রাজকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার মত যোগ্যতা নিয়ে পাশ করতে পারুন বা না পারুন—কেম্ব্রিজে তাঁর জন্য আসন রাখা আছে। আগের বছর চল্লিশ হাজার ছাত্র সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। সুতরাং প্রতিবাদ উঠেছে—রাজকুমারের বেলায় কেন এই পক্ষপাতিত্ব? চিন্তাশীলরা জনসাধারণের আপত্তি

নিয়ে মোটেই ভাবিত নন; তাঁদের ভাবনা—ভবিষ্যতের রাজার পক্ষে কী কী বিষয় পড়া উচিত এবং কতখানি। একদল বলতে চান—ভবিষ্যতের রাজা দেশের অন্যান্য তরুণের মতই পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে পড়াশুনা করুন সেটাই ভাল। চার্লসকে তাঁরা কলেজে পাঠাতে চান। অন্য দলের বক্তব্য—অতি বিদ্যা ভয়ঙ্করী। রাজার বেশি লেখাপড়া শেখার দরকার কী, তিনি তো আর দেশ শাসন করবেন না! তাঁর পক্ষে ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারাটাই হবে যথেষ্ট। একজন সাংবাদিক সোজাসুজি লিখেছেন—কী হবে রাজকুমারকে কলেজে পাঠিয়ে? তাঁকে যদি কেউ বড়ঘরে একজন 'সাধারণ' তরুণ হিসাবে পরিণত করতে চান, তবে সেটা ভুল হবে। কী হবে ভবিষ্যতের জমির-ব্যবসায়ী, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্ট, পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, ফ্যাশান-ফোটোগ্রাফার, পপ-পেইন্টার, পর্নোগ্রাফার বা একালের এজাতীয় 'হিরো'দের সংখ্যা বাড়িয়ে? চার্লস অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রি আদায় করেছেন। ব্রিটিশ রাজবাড়িতে তিনিই নাকি প্রথম গ্রাজুয়েট।

সুতরাং এ তর্ক হয়তো এতদিনে থেমে গেছে। যদি থেমে গিয়ে থাকে, তা হলেও ভাবনা নেই, ফ্লীট স্ট্রীট নিশ্চয় এতক্ষণে রাজবাড়ির আনাচে কানাচে খোঁজাখুঁজি করে অন্য কিছু পরিবেশন করছে। (বস্তুত, আমি লিখতে বসে কাগজে দেখতে পাচ্ছি—ব্রিটেন-এ জোর গুজব রাজকুমারী মার্গারেট এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে নাকি বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা!) সব সময় যে এসব খবর নির্ভরযোগ্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই, খবরটা রাজপরিবারঘটিত হলেই ঢের। প্রজারা যা-ই পান তা-ই চেটেপুটে খান, সুতরাং রাজবাড়ির খবরের জন্য জনপ্রিয় কাগজগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগেই আছে। সেও এক দেখবার মত খেলা। শোনা যায় লণ্ডনে অন্তত তিরিশ জন লোক আছেন রাজবাড়ির গোপন খবর কেনা-বেচাই যাঁদের একমাত্র জীবিকা। একটি আমেরিকান ম্যাগাজিন বছরভর একজন

লোক রাখেন লণ্ডনে শুধু এ কাজের জন্য। তিনি সত্য মিথ্যা যে যা-ই পারছেন কুড়িয়ে ফিরছেন, ফলাও করে তা-ই ছাপা হচ্ছে। ফলে খবরের কাগজের সঙ্গে প্রাসাদের ঝগড়া লেগেই আছে। হামেশা-ই রানীর প্রেস সেক্রেটারী নালিস জানিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন প্রেস কাউন্সিল-এর কাছে। প্রেস কাউন্সিল খবরের কাগজের নিজের আদালত। সাংবাদিকরাই সেখানে সাংবাদিকদের আচারণের বিচারক।

কাউন্সিলের ফাইল ঘাঁটলে অনেক মামলার হদিশ মিলবে। তার মধ্যে কয়েকটি শোনাবার মত। মার্গারেট টাউনসেণ্ড উপাখ্যান '৫৫ সনের ঘটনা। একটি হেড লাইন-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ জনপ্রিয় কাগজই সেদিন উদ্দাম টাউনসেণ্ড-এর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হওয়া উচিত, কি উচিত নয়—এই প্রশ্ন নিয়ে। একটি কাগজ এমন কি গ্যালপ-পোল-এর আয়োজন পর্যন্ত করে ফেলেছিল। প্রেস কাউন্সিল অবশ্য তাঁদের ধমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফ্লীট স্ট্রীট-এর মুখ বন্ধ করতে পারেননি। 'ডেইলি মিরার' উত্তর দিয়েছিল—এসব ননসেন্স! কবে পাকা খবর পাওয়া যাবে সে আশায় বসে থাকলে খবরের কাগজের কাজ চলে না। অষ্টম এডোয়ার্ড-এর সিংহাসন ত্যাগের ঘটনা এখনও আমাদের মনে আছে। এমন কি গম্ভীর 'গার্ডিয়ান' পর্যন্ত মন্তব্য করেছিল—'It would be against human nature for there not to be a little vulgar curiosity.'

শেষ পর্যন্ত প্রেস কাউন্সিলকেও স্বীকার করতে হয়েছে খবরের কাগজের পক্ষে সেদিন চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন আর রাজকুমারী প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন খাস ব্রিটেন-এ একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন, আর খবরের কাগজ তা দেখবার পরও ক্যামেরা বা কলম খুলবে না সেটা কী সম্ভব?

পরের বছর (১৯৫৬) প্রাসাদ থেকে আবার নালিশ। রানীর

তদানিন্তন প্রেস সেক্রেটারী কমাণ্ডার কলভিল লিখছেন—'ওম্যান' নামক কাগজে প্রাসাদের ভূতপূর্ব কম্পট্রোলার অব সাপ্লাই ফ্রেডরিক করবিট-এর এক স্মৃতিকথা ছাপা হচ্ছে। অবিলম্বে তার প্রকাশ বন্ধ করলে বাধিত হব। কাগজের সম্পাদিকা উত্তর দিলেন—সে কী কথা, সবাই ছাপতে পারেন, আর আমার বেলায়ই দোষ! 'রিকালেকশান্স অব থ্রী রেনস'-এর লেখকও তো প্রাসাদেরই কর্মচারী ছিলেন। গত বছর নভেম্বর-এ প্রকাশিত বিখ্যাত এক প্রাসাদ-কাহিনীর লেখকও তো ছিলেন ভূতপূর্ব রাজকর্মচারী। এত লোক যদি তথাকথিত ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে পারেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারেন, তবে আমাদের আর দোষ কী? আমাকে বরং জানালে বাধিত হব প্রাসাদ কর্তৃপক্ষের আপত্তি কোন্ তথ্যগুলো সম্পর্কে। কমাণ্ডার কলভিল জানালেন—তথ্য নিয়ে কথা হচ্ছে না। আমাদের কথা এসব ঘরোয়া ব্যাপার আদৌ প্রকাশ করা উচিত নয়। তাছাড়া এতে কথারও খেলাপ হয়। প্রাসাদে চাকরি নেওয়ার আগে প্রত্যেকেই শপথ নেন খবরের কাগজকে রাজবাড়ির ভেতরের কোন কথা তাঁরা বলবেন না। প্রেস কাউন্সিল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে রায় দিলেন— কমাণ্ডার যথার্থ বলেননি। এই সব স্মৃতিকথা শুধু ইংরাজি সাহিত্যকে পুষ্ট করেনি, এদের ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। তাঁরা এর আগে ডিউক অব এডিনবরা'র ভূতপূর্ব 'ভ্যালে'র লেখা রচনা প্রকাশে আপত্তি করেননি। এবারও করলেন না। রানীর প্রেস সেক্রেটারী লিখেছিলেন—দেশের অন্যান্য মানুষের মত রানীর পক্ষেও বোধহয় এটা আশা করা অতিরিক্ত কিছু নয় যে, নিজের বাড়িতে তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকারী। প্রেস কাউন্সিল বিনীতভাবে জানালেন—রানীকে বোধহয় সাধারণ লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। টেনিসন-এর কবিতা স্মরণ করেছেন তাঁরা,—'A thousand peering witnesses, In that fierce light which beats upon the

throne.' এ আলো প্রাসাদকে সহ্য করতেই হবে। অবশ্য কৌতূহল যখন সুরুচিসম্মত নয়, তখন অন্য কথা।

সে ধরনের অভিযোগও হামেশাই শোনা যায়। '৫৭ সনের কথা। ডাচেস অব কেণ্ট-এর বাড়িতে উৎসব। ডিউক অব কেণ্ট-এর ২১তম জন্মোৎসব। হঠাৎ দেখা গেল মহিলাদের কোট-ছাতা রাখার ঘরে একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রসাদের লোকেরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন। অকুতোভয় মেয়েটি জবাব দিল—আমি ডিউক-এর একজন বান্ধবী,—নিমন্ত্রণের চিঠিটা আনতে ভুলে গেছি। লোকেরা তক্ষুনি ছুটল ডিউককে খবর দিতে। ইত্যবসরে মেয়েটি পালাবার চেষ্টায় লাগল। অচেনা প্রাসাদ, বের হবার পথ জানা নেই। বেচারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। পরে জানা গেছে সে 'ডেইলি স্কেচ'-এর রিপোর্টার। পরদিন স্কেচ ফলাও করে তাঁর অভিজ্ঞতা ছেপেছিল!

সে রাত্তিরেই প্রাসাদে আরও দু'জন অপরিচিত লোককে দেখা গেল। প্রহরীরা আসছে দেখে তাঁরা দু'জন দুদিকে সরে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কবুল করতে হত—তাঁরা রিপোর্টার। একজন বের হয়ে যেতে যেতে বললেন—এই যাঃ, পার্শেল ফেলে এসেছি। প্রাসাদের লোকেরা পরীক্ষা করে দেখলেন সেটা একটা ক্যামেরা। একমাইল দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ওঁরা খবর শিকারে এসেছিলেন। ধরা পড়ে নিজেরাই খবর হয়ে গেলেন। প্রেস কাউন্সিল, বলা অনাবশ্যক, এঁদের আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিলেন। কাগজের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছিল।

এ জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটছে। ফ্লীট স্ট্রীট তারই মধ্যে কাজ করে চলেছে। প্রিন্স চার্লস-এর নোট-বই চুরি হয়েছে, ডিউক অব এডিনবরার টেলিফোন-এর কথপোকথন-সার। সম্প্রতি ডিউককে নিয়ে আর একটি চাঞ্চল্যকর 'মামলা' হয়ে গেল। কিছুদিন

আগে বিখ্যাত রবিবাসরীয় 'সানডে এক্সপ্রেস'এর তরফ থেকে ডিউককে একটি ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিষয়ঃ আজকের ব্রিটেন-এ রাজতন্ত্রের ভূমিকা। প্রস্তাবিত প্রশ্নমালার একটি—২০০০ অব্দে ব্রিটেন-এ রাজতন্ত্রের চেহারা কী হবে? প্রিন্স ফিলিপ-এর তরফ থেকে জানান হল—তিনি 'ইণ্টারভিউ' দিতে পারবেন না। কিন্তু সে সপ্তাহেই আর একটি রবিবাসরীয় কাগজ 'সানডে টাইমস' সগর্বে ঘোষণা করল—তাঁরা প্রিন্স ফিলিপ-এর একটি 'ইণ্টারভিউ' ছাপছেন। যথাসময়ে সেটা ছাপাও হয়েছে। ক্ষুব্ধ 'এক্সপ্রেস' লিখল—এ কেমন বিচার? নিয়ম যদি ভাঙতেই হয় তবে আরও বিবেচনা করে ভাঙা উচিত; ওই কাগজটিতে নিজের 'ব্রাদার ইন ল' আছেন বলেই এমন পক্ষপাতিত্ব দেখান উচিত হয়নি। (রাজকুমারী মার্গারেট-এর স্বামী লর্ড স্নোডন 'সানডে টাইমস'-এর সঙ্গে যুক্ত)। প্রেস কাউন্সিল এই উক্তির নিন্দা করেছেন। কারণ, 'এক্সপ্রেস' যে বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিল, আর 'সানডে টাইমস' যা ছেপেছে তার মধ্যে কোন মিল নেই। অথচ মন্তব্যটি ছাপা হয়েছে 'সানডে টাইমস'-এ ডিউক-এক 'ইণ্টারভিউ' প্রকাশিত হওয়ার পর।

দেশের জনসাধারণ এবং খবরের কাগজ—রানী এবং রাজবাড়িকে উপলক্ষ্য করে, সাহেব মেমদের এই পাগলামির পিছনে অবশ্যই একটি কারণ আছে। দেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবীর অভিমতঃ সে কারণটি আর কিছুই নয়, রানীকে ঘিরে গড়ে তোলা একটি নিরন্ধ্র নিষেধের প্রাচীরই তার জন্য দায়ী। এবং সেটি গড়ে তুলেছেন মুষ্টিমেয় ক'জন লোক—এস্টাব্লিশমেণ্ট। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে রাজা রানীরা আজ জনতার মানুষ। স্টকহোম-এর কোন সাধারণ বাগানে হয়ত দেখা যাবে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আপন মনে একাকী হাঁটছেন। কেউ সামনে পড়লে থেমে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। পরে জানা যাবে তিনি সুইডেন-এর রাজা গুস্তাভ। তাঁর

বয়স এখন চুরাশি। তাঁর প্রাসাদের ভোজসভায় অতিথিদের আসনের পিছনে যে পরিচারকের দল দাঁড়িয়ে থাকে, তারা প্রাসাদের কর্মচারী নয়, শহরের কোন রেস্তোরাঁ থেকে ভাড়া ক'রে আনা। রাজা গুস্তাভ দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাকেও কখনও কখনও নিমন্ত্রণ করেন প্রাসাদে, এক-সঙ্গে বসেন, খান। অথচ তিনি জানেন, গোটা দেশে একমাত্র এই লোকটিই প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের সপক্ষে সওয়াল করেন। হল্যাণ্ড-এর রানী রাজ্যের অন্য মেয়েদের সঙ্গেই কলেজে পড়েছেন, সহপাঠীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে তাঁকে কলেজের প্রাঙ্গণে হাঁটতে দেখা গেছে। ডেনমার্ক-এর রাজা অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন, আর পাঁচজন নাগরিকের মতই তিনি নিজে দরকার মত টেলিফোনও ব্যবহার করেন। এমন কি তরুণ বেলজিয়াম-রাজও নাকি জনতার সঙ্গে ব্যবধান দূর করার বাসনায় চশমা ছেড়ে 'কনটাক্ট লেন্স' ধরেছেন। ব্রিটেন-এ এসব ভাবাও যায় না। উল্লিখিত আমেরিকান দর্শক লিখেছেন—রাজবাড়ির লোকেরা অবশ্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মূর্তির আবরণ উন্মোচন, এটা ওটার উদ্বোধন—নানা উপলক্ষেই তাঁরা জনতার সামনে আসেন। কিন্তু সব সময়ই একটা কৃত্রিম পর্দা তাঁদের জনতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ওঁরা নিজেদের 'কাজ' করে আবার দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান। স্বরাজ্যের একজন প্রজার মন্তব্য : দেখা-সাক্ষাৎ বলতে যদি 'টু বি সীন বাই' হয় তবে রানীর সঙ্গে হামেশাই আমাদের দেখা হচ্ছে বই কি! টেলিভিশন-এ রানীকে তো প্রতিদিনই দেখছি! 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' বোধহয় এখনও ওয়াল্টার বেগট-এর পরামর্শ অনুযায়ীই চলতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেছিলেন—যতদিন মানুষের হৃদয়াবেগ বলবান এবং যুক্তি দুর্বল থাকবে, ততদিন রাজতন্ত্রও সবল থাকবে। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন—'When there is a select committee on the

Queen, the charm of royalty will be gone. Its mystery is its life. We must not let in daylight upon magic.'

অনেকের অভিযোগ আজকের দরবারীরা সযত্নে সে-ই মন্ত্রই পালন করছেন। রানীর প্রেস সেক্রেটারি নাকি সগর্বে বলেন—রাজবাড়ি থেকে কোন 'কাহিনী' যাতে বাইরে না পৌঁছায় সেটা দেখাই তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেন। হাসি-হাসি মুখ ছাড়া রানীর অন্য কোন ছবি দেখলেও নাকি 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' বিরক্ত বোধ করেন।

এইচ. জি. ওয়েলস একমাত্র বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি বলতেন—রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি, কারণ এর ফলে ব্রিটেন-এর জাতীয় জীবনে দুর্নীতির প্রসব ঘটছে—একটি শ্রেণী অহেতুক বেশি সুবিধা ভোগের সুযোগ পাচ্ছে। লিওনার্দ উলফ-এর বক্তব্য ছিল—রাজতন্ত্র যুক্তির আলোহীন অন্ধকার যুগের স্মারক, কিছু লোক নিজেদের সুবিধার জন্য সজ্ঞানে তাকে বাঁচিয়ে রাখছে, রাজ-পরিবারের প্রতি কুসংস্কারচ্ছন্ন আনুগত্য গড়ে তুলছে। মনে হয়, ব্রিটেন-এ আজ আর রাজতন্ত্রের এ জাতীয় সমালোচক কেউ নেই। 'অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান' জন ওসবর্ন এর বয়স হয়েছে,—বহুদিন আগেই তিনি অন্য নিশানা খুঁজে নিয়ে নিয়েছেন। আজকের বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত 'এস্টাব্লিশমেণ্ট তথা ক্ষমতা-বানদের চক্রটি। তাঁদের জন্যই নাকি রানী সম্পর্কে ব্রিটেন-এর জনসাধারণ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী খোয়াতে বসেছে। তাঁরা রাজতন্ত্রকে নানা মিথ্যা মহিমায় ভূষিত করছেন, এর সঙ্গে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদিকে যুক্ত করছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা বি. বি. সি.-র উল্লেখ করেন। বি. বি. সি.-তে ঈশ্বর জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন সমস্যা সব নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু রাজতন্ত্র কিংবা রানীকে নিয়ে নয়। দরবারী লেখকেরাও অন্যভাবে রাজতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করেন: রানী তাঁদের কলমে যাদুকরী অস্তিত্ব। চার্চ-এর নায়কেরা আরোপ

করেন অলৌকিকত্ব। সমালোচকদের অভিযোগ—এঁদের জন্যই রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর অভিষেক উৎসব যে নতুন যুগের সূচনা করতে পারত, তা করতে পারেনি। বিস্তর প্রচার সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে। ('The ceremony was purely national more aristocratic, more exclusive, more Anglican, more medieval, than ever before'—Kingsley Martin.)

প্রথম টেলিভেশন-করনেশন উৎসবটির সুযোগ পুরোপুরি বিফলে যায়। মাঝখান থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ।

কিংসলে মার্টিন বলেছিলেন—'টি. ভি. মনার্কি' অর্থাৎ টেলিভিসনীয়-রাজতন্ত্র। ম্যালকম মাগারিজ এগিয়ে গিয়েছিলেন আরও একধাপ। মার্গারেট আর টাউনসেণ্ড-র প্রণয় উপলক্ষে যখন একদিকে প্রাসাদের নীরবতা, অন্যদিকে গুজবের ছড়াছড়ি; তখনই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আলোড়নকারী প্রবন্ধ—'রয়াল সোপ অপেরা!' তিনি বলেছিলেন—ফিল্মস্টারদের টেকনিক ধরলে রাজপরিবার ব্যর্থ হবে। তাঁর বক্তব্য—রাজপরিবারকে ধর্মীয় ব্যাপারে পরিণত করার চেষ্টা করলেও ফল খুব ভাল হবে না।

('As a religion, monarchy has always been a failure; a God-King invariably gets eaten. Men can only remain sane by esteeming what is mortal for its mortality') বলা নিষ্প্রয়োজন এই দুঃসাহসিক আক্রমণও 'এস্টাব্লিশমেণ্ট-এর দুর্গটির বিরুদ্ধেই। আর এক সমালোচক জন গ্রীগ। তিনিও রানীর ভাষা এবং বাকভঙ্গীর যত না সমালোচনা করেন তার চেয়ে বেশি তাঁর পারিষদবর্গের। দু'জনকেই অবশ্য তার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে। ম্যাগারিজকে নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে, জন গ্রীগ প্রকাশ্য রাস্তায় অপমানিত হয়েছেন। শাস্তি দিয়েছেন কখনও কখনও প্রজারাই। রানী আর তাঁর পারিষদ-

দেওয়ালের ব্যবধান সকলে বুঝতে পারেন না, ওঁরা ধরে নিয়েছেন—ব্যক্তিগতভাবে রানীকে অপমান করাই ছিল এসব অবাধ্য সমালোচকদের মতলব।

আগেই বলেছি ব্যক্তিগতভাবে রানীর শত্রু নেই কেউ। না সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে, না সমালোচক মহলে। রানীকে সবাই ভালবাসেন। তাঁর জন্য সকলেরই আন্তরিক শুভেচ্ছা আর সহানুভূতি। প্রজারা জানেন, কার্যত রাজ্যশাসনের দায়িত্ব তাঁর না হলেও রানীকে অনেক কাজ করতে হয়। তাঁকে রান্না-বান্না বা ছোট ছেলেকে স্নান করাতে হয় না বটে, কিন্তু যা করতে হয় তাও সহজ নয়। ফর্দ রীতিমত লম্বা। অষ্টপ্রহর আর্টিস্ট-এর 'মডেল' হয়ে বসে থাকা, সেও কী কম ? প্রজারা রানীকে একই পোশাকে দু'বার দেখতে চায় না, দিনের মধ্যে চৌদ্দবার পোশাক বদল,—ব্যতিব্যস্ত কেরানী-শ্রমিক গৃহস্থরা জানেন, সেটাও সহজ কাজ নয়।

মোট কথা, সাধারণ প্রজার কাছে রানী তাঁদেরই মত এক মানবী। অ-সাধারণত্ব যদি কিছু থেকে থাকে সে তাঁর প্রাসাদ, লোকজন অর্থ বিত্ত ইত্যাদিতে। সুতরাং রানীকে হাসতে দেখলে তাঁরা আনন্দিত হন, গম্ভীর দেখলে চিন্তিত হন, দুঃখিত শুনলে দুঃখিত। এই সম্পর্ক শুধু সমালোচকদের আক্রমণই পরিবর্তিত হয় না, আত্মীয়তা ভেঙে যেতে চায় তখনই, রাজপরিবারের কেউ যখন প্রত্যাশিত আচরণ করতে পারেন না। দৃষ্টান্ত রাজকুমারী মার্গারেট।

গ্রুপ ক্যাপটেন টাউনসেণ্ড-এর সঙ্গে রাজকুমারীর সখ্যতাকে বিশেষ কেউ নিন্দা করেননি। ভালবাসায় তরুণ তরুণীর প্রতি সহানুভূতির অভাব হয় না কখনও। মার্গারেট-এর বেলায়ও হয়নি। টাউনসেণ্ড নেপথ্যে বিদায় নিলেন। রাজকুমারীর প্রতি তখনও সকলের সহানুভূতি ; কে জানে, হয়ত অষ্টম এডোয়ার্ড-এর মতই চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ওঁকে—বেচারা পারল না, হার

মানতে হল। আসরে এলেন ফটোগ্রাফার আর্মস্ট্রং জোন্স। জনতা এবারও আনন্দিত,—হাজার হোক সাধারণ ঘরের, গুণী ছেলে তো বটে। কিন্তু সে প্রতিকৃতি ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ করে ফেলেছেন নাকি ওঁরাই। আর্মস্ট্রং জোন্স এখন লর্ড স্নোডন। অনেকে নাকি তাঁর খেতাব নেওয়াটা পছন্দ করেননি। ওঁরা হানিমুন করতে গেলেন রানীর প্রমোদতরীতে। সাধারণ ঘরের ছেলের পক্ষে কাজটা কী ঠিক হল? জনসাধারণ নাকি আরও মর্মাহত হয়েছিল—দু'জন যখন বেড়াতে গিয়ে প্লেন-এর ফার্স্ট ক্লাস-এর অর্ধেক টিকিট কিনে ফেলেছিলেন। পাছে কাছাকাছি কেউ বসে পড়ে তাই নাকি এই বন্দোবস্ত। তারপর আরও এক উত্তেজনা-পূর্ণ খবর দু'মাসের শিশুকে ঘরে ফেলে রেখে মার্গারেট আর তাঁর স্বামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ বেড়াতে চলেছেন। শ্রমিকের ব্রিটেন, নিম্নবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের কাছে এ খবরগুলো স্বাভাবতই পীড়াদায়ক।

অন্যদের কাছে অস্বস্তিকর আর কয়টি খবর। মার্গারেট-এর স্বামী কৃতি ফটোগ্রাফার। সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই গুণ কী তিনি জাতির সেবায় দান করতে পারতেন না? তবে কেন খবরের কাগজে চাকরি নিলেন? স্ত্রীর বাড়ি তিনি মনের মত করে সাজাচ্ছেন, ভাল কথা। সেজন্য জনসাধারণের টাকা খরচ করা হবে কেন? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। ফলে ১৯৬২ সনে রাজপরিবার খবরের কাগজে, কার্টুন,-এর বিষয় হয়েছে। একালের ব্রিটেন-এ সেই নাকি প্রথম নিয়মভঙ্গ। রাজকুমারীকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। একটা কাগজ লিখেছিল—লর্ড স্নোডন যখন খবরের কাগজে কাজ নিয়েছেন তখন অন্যরাই বা বাকি থাকেন কেন? মার্গারেট চলে আসুন; 'ডেইলিমিরার'-এ, রাজমাতা চলে যান আর এক কাগজে; প্রিন্স ফিলিপ যোগ দিতে পারেন—ইয়টিং ওয়ার্ল্ড-এ (Yachting World)। রানীর এ ধরনের সমালোচনা বলতে গেলে কখনও হয় না। কোন কাগজ হয়ত

একবার সাহস দেখিয়ে এলিজাবেথ-এর বদলে 'লিজ' লিখল (লিজ নিউ স্টেটসম্যান লিখেছিল), কেউ হয়ত ঘোড়াদৌড় সম্পর্কে রানীর অত্যধিক উৎসাহ বিষয়ে কোন যাজকের ইন্টারভিউ নিলেন —তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। খোদ রানী সম্পর্কে সবাই যথাসাধ্য সতর্ক। রাজতন্ত্রের মত ব্যক্তিগতভাবে তিনিও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর সমালোচনার আর একটা উপলক্ষ্য রানীর খরচ। একটি আমেরিকান কাগজের হিসাব অনুযায়ী রানী এলিজাবেথ-এর সংসার খরচ বছরে ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার। পরিবারের অন্যান্যদের ভাতা বছরে ৫ লক্ষ ডলার। তারপর ছয় ছয়টি প্রাসাদ, ছয়টি উড়ো জাহাজ, একটি প্রমোদতরী, মোটর গাড়ি স্পেশাল ট্রেন—ইত্যাদি। সে সবের জন্য আরও ৬০ লক্ষ ডলার!

ইংরাজদের হিসাব অনুযায়ীও অঙ্কগুলো ছোট নয়। রানীর 'মাইনে' এবং অন্যান্য খরচকে বলা হয়—'সিভিল লিস্ট'। রানী তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পার্লামেন্ট-এর হাতে সমর্পণ করেন। পার্লামেন্ট তার বদলে তাঁকে টাকা দেন। রানীর সম্পত্তির অর্থ আইনের দৃষ্টিতে তিনি যার উত্তরাধিকারিনী সেদিক থেকে লণ্ডন শহরের অনেকখানি এলাকারই মালিক তিনি। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড-এর প্রায় দেড় লক্ষ একর কৃষি জমির মালিকানা তাঁর। আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার একর আছে স্কটল্যাণ্ড-এ, হাজার একর ওয়েলস-এ। রানীর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের এখানেই শেষ নয়। তিনি সমুদ্র উপকূলের মালিক, সমুদ্রতলেরও। স্কটল্যাণ্ড-এর নদীতে যে স্যামন মাছ পাওয়া যায় সেও তাঁর। ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ছাড়াও রানীর সম্পত্তি আছে। একটি মার্কিন কাগজ বলে তার দাম হবে কমপক্ষে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। লর্ড ডেভিড সিসিল বলেন—এত নয়, এক কোটি পাউণ্ড। অন্যদের ধারণা তিনি রানীর চিত্রশালাগুলো হিসাবে ধরেননি। তাঁর আসবাবপত্র এবং প্রাসাদের অন্যান্য শিল্পবস্তুকেও না। রানীর ঘরের সোনার থালাই আছে

নাকি পাঁচ টন। বিশ্বের বৃহত্তম রত্নভাণ্ডারে তাঁর হাতে উইণ্ডসর প্রাসাদের জিনিসগুলোর তালিকাই সম্পূর্ণ হয়েছে পঁচাত্তর ভল্যুম-এ। ১৯৫৮ সনে একটা হিসাবে জানা গিয়েছিল প্রাসাদে প্রাসাদে যে সব ছবি আছে তারই দাম হবে দেড় কোটি পাউণ্ড! রানী সে সব পার্লামেন্টের হাতে ছাড়েন না। কতকগুলো বিশেষ সম্পত্তির ওপর অধিকারই ছাড়েন মাত্র। তার বিনিময়ে পার্লামেণ্ট ১৯৫২ সনে তাঁর বার্ষিকী অনুমোদন করেছিলেন ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড। তার পরও তাঁর প্রাপ্তির সুযোগ আছে। কর্ণওয়েল থেকে মোটা টাকা পাওয়া যায়। অবশ্য সে টাকা পাবেন রাজকুমার চার্লস। চৌদ্দ থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর পাওয়ার কথা বছরে ৩০ হাজার পাউণ্ড, একুশে পৌঁছলে লক্ষ পাউণ্ড। রানীর ব্যক্তিগত খরচ বছরে ৬০ হাজার পাউণ্ড। অন্যদের খরচও কম নয়। রানী-মাতা পেয়ে থাকেন বছরে ৭০ হাজার পাউণ্ড। প্রজাদের ডেথ ডিউটি দিতে হয়, রাজা-রানী নিখরচায় সিংহাসনে গিয়ে বসেন, উত্তরাধিকারের জন্য তাঁদের এক পেনিও খরচ করতে হয় না। আর ইনকাম ট্যাক্স? রানী কি ইনকামট্যাক্স দেন? একজন লেখক লিখেছেন এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় রানী আর সকল থেকে ভিন্ন। কেননা প্রশ্নটা আর কারও ক্ষেত্রে শোনা যায় না।

টাকা দেওয়ার আগে অবশ্য পার্লামেন্ট-এর অনুমোদন দরকার হয়। সেখানে তর্কাতর্কিও যে না হয় এমন নয়। রানীকে খরচ যোগাতে কারও আপত্তি নেই। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যাঁদের দেশে তাঁদেরও খরচ দিতে হয় সুকর্ণ বা দ্যগল-এর মত প্রেসিডেন্ট হলে সাধারণতন্ত্রের দরও খুব সস্তা পড়ে না। না হয় ব্রিটেনও বংশগত রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খরচ করল। কিন্তু বিবাদীদের প্রশ্ন—অহেতুক অপচয় কেন? ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে রানীর প্রমোদতরীর সংস্কার করা হয়েছে। সেটি যখন চলে তখন সাপ্তাহিক খরচ

৭ হাজার পাউণ্ড, যখন নিশ্চল থাকে তখন ৪ হাজার পাউণ্ড। —এটা কী বাড়াবাড়ি নয়? তার পরও নানা প্রশ্ন। চার্লস-এর তিন বছর বয়সেই স্থির হয়ে আছে কোনদিন তিনি বিয়ে করলে এবং দুর্ভাগ্যবশত স্ত্রী বিধবা হলে তিনি কত পাবেন। চার্লস এখন প্রিন্স অব ওয়েলস। ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ডলার তাঁর বার্ষিক হাত খরচা। রানীর প্রাপ্য ১১ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার। মার্গারেট-এর বিয়ের আগেই স্থির করা ছিল বিয়ের জন্য কত খরচ করা হবে। সমালোচকরা এসবকে বাড়াবাড়ি মনে করেন। কেউ কেউ এমন কি প্রশ্ন তুলেছিলেন—প্রিন্স ফিলিপ-এর এমন কী কাজ যাঁর জন্য তাঁকে বছরে ৪০ হাজার পাউণ্ড দিতে হবে?

ফিলিপ নিজেই নিজের সংকট ডেকে আনেন কখনও কখনও। '৬৯ সনের নভেম্বরে আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—রাজবাড়ির সিন্দুকের অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের ভাতা ঠিক হয়ে আছে আঠারো বছর আগে। অথচ সবাই জানেন সংসার খরচ দিনে দিনে কী হারে বেড়ে যাচ্ছে। বছরে চব্বিশ হাজার সরকারী অতিথির আপ্যায়ন করতে হয় আমাদের। কর্মচারী আছেন তিনশ'। সুতরাং, আগামী বছর থেকে সংকট অনিবার্য। এখনই এক বাড়ির ভৃত্য নিয়ে অন্য বাড়ির কাজ চালাতে হয়। ভবিষ্যতে হয়তো দুইশ'-কামরার ওই বাকিংহাম প্যালেসও ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে পোলো খেলাও। ডিউকের এই বক্তৃতা নিয়ে দেশময় কোলাহল। ডক শ্রমিকরা প্রিন্স-এর টাট্টু ঘোড়ার জন্য চাঁদা তুলতে শুরু করল। খবরের কাগজ ব্যঙ্গ করে লিখল—তবে কি রানী চায়ের পাতা আবার সেদ্ধ করে খরচ বাঁচাচ্ছেন? পার্লামেণ্টে জোর দাবি—রানী তহবিল সম্পর্কে বিস্তারিত খবর চাই!

সুতরাং দেখে শুনে এবং বিস্তর সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এই দর্শকের ধারণা আজকের ব্রিটেন-এ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর প্রজাবর্গের আলোচ্য রানী নন, রাজতন্ত্রও নয়। একমাত্র লক্ষ্য আর

একটু কম-দামের রাজপরিবার, আরও ঘনিষ্ঠ রানী এবং রাজকুমারী। রাজপরিবারের নির্দয়তম সমালোচকেরাও তা-ই চান। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিছুকাল আগে আবার ব্রিটেন জানিয়েছে তা। ডিউক অব এডিনবরা স্পষ্ট ভাষণের জন্য সুখ্যাত। সম্প্রতি তিনি দেশের হালের চালচলনের তীব্র নিন্দা করেছেন। বলেছেন —'সব ঠিক হ্যায়' এই মনোভাবই আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী। I am sick and tired of making excuses for this country. উত্তর দিয়েছে ডেইলি মিরার : উচিত কথা। নিশ্চয়ই আমরা আরও দক্ষ হতে পারতাম।—সো কুড বাকিংহাম প্যালেস সো কুড দি ডুক্। অর্থাৎ ডিউক। 'মিরার' লিখেছে—

'There is redundance of labour in Royal circles as well as outside. Prince Philip may have stopped twiddling his thumbs, but some of his relatives must find the days drag slowly with so little to do. Certainly Britain is spending too much and earning too little. But when weare on that topic, the first question the Mirror would like to ask is this : is the expense of the Royal yacht 'Britannia' justified ?'

আমি না দেখেই বলতে পারি লক্ষ লক্ষ প্রজা সেদিন সকালে টিউব-এ, বাস-এ, রেলের কামরায় 'মিরার'-এর এই সম্পাদকীয়টি সাগ্রহে পড়েছেন সানন্দে উপভোগ করেছেন। হয়ত বা কেউ কেউ অন্যদিনের মত টিউব-এর আসনেই কাগজটা ফেলে না দিয়ে নামবার সময় হাতে নিয়ে নেমেছেন। কলে কারখানার অফিসে আদালতে গিয়ে অন্যদের পড়িয়েছেন—ঠিক লিখেছে।—ইজণ্ট ইট ?

রানীর পর রাজনীতি।

রাজনীতির কথা উঠলেই ফরাসীদের মত আমরা বাঙালীরাও নড়েচড়ে বসি। সখেদে জানাতে বাধ্য হচ্ছি 'দোকানীদের দেশ' হলেও ইংল্যাণ্ডে রাজনীতির হাট বড়ই নিস্তেজ। খদ্দেরের সামনে পসরা সামান্য, অনেকটা আমাদের রেশনের দোকানগুলোর মত, পছন্দ অপছন্দের সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। হয় আতপ, না হয় সেদ্ধ। হয় টোরি, না হয় লেবার।

ইংরাজদের আদৌ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নেই তা নয়। অবশ্যই তা আছে। লেবার, কনজারভেটিভ ছাড়া আছেন লিবারেলরা। আছেন ট্রেডইউনিয়নিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, এবং কো অপারেটিভ ওয়ালারাও। এমনকি স্বর্গত আন্নাদুরাই এবং 'সদ্যজাত' বিজু পট্টনায়কের অনুরাগীরাও আছেন। তাঁরা আঞ্চলিকতার সেবায়েত। এই সব নানা বর্ণের দল ছাড়াও আছে রকমারি গোষ্ঠী, ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি, সোসাইটি ফর দি প্রিজারভেশন অব আনবর্ণ বেবিজ—ইত্যাদি। এক সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিশ্বাস স্কটল্যাণ্ডের একটি হ্রদে সত্যিই একটি 'মনস্টার' বা কিম্ভুত দর্শন প্রাণী আছে, আর এক দল বিশ্বাস করেন—ইংরাজ জাতিকে রক্ষার উপায় তার অন্তর্বাস অপরিবর্তিত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা।

এসব সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজনীতি বর্ণহীন, কারণ শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে ওঠে মাত্র দুটি দল। লেবার আর কনজারভেটিভ।

কনজারভেটিভ আর লেবার। আরও দু' একটি ভাগ্যবান দলকেও বড় মাঠে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাদ বাকিদের পাড়ার পার্কে কিংবা ক্লাবঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই যাবতীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে যেতে হয়। ফরাসীদেশে 'অ্যাল্ফি' আর 'প্রো'-ই রাজনীতিতে সার কথা নয়। সেখানে রিপাব্লিকান লেফট-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে পারে 'রিপাব্লিকান অব দি লেফট'। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিতে এসব অচল। সব রঙ এখানে বর্ণহীন, শ্বেতে লুপ্ত। বাইরের মানুষের চোখে দুই প্রধান দলই সাদা, তবে ইংরাজ ভোটারের স্বভাবতই তারতম্য আছে,—এক দল হোয়াইটার দ্যান হোয়াইট, সাদার চেয়েও সাদা।

এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। ইংরাজদের নিজেদের কাছেও তাঁদের রাজনীতি এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি। গিলবার্ট প্রশ্ন তুলেছিলেন।

'How nature always doth contrive
That every boy and every gal
That's born into this world alive
Is either a little Liberal
Or else a little Conservative ?'

এই প্রশ্ন বোধহয় আজও অনেকের মনে। লিবারেলের বদলে এখন ঠাঁই করে নিয়েছে লেবার, এই যা।

অনেকে বলেন—ব্রিটিশ রাজনীতি ইংরাজদের সহজাত আপস-প্রীতিরই আর প্রকাশ। আপস ইংরাজদের কাছে দ্বিতীয় ধর্মের মত। তাঁর ঘর, তাঁর ক্লাব, তাঁর বাগান সবই অলিখিত নানা সন্ধি চুক্তির ফল। এমন কি দেশের আবহাওয়াও আপস জাত যেন, 'এ ফেয়ার কম্প্রমাইজ বিটুইন রেন অ্যাণ্ড ফগ!' ঠিক তেমনই লেবার পার্টি হচ্ছে স্োসালিজম আর ব্যুরোক্র্যাসির মধ্যে আপস চুক্তির জের। লিবারেল পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি সবাই এমনই

কোনও না কোন আপসের নীট ফল, এবং 'দি হোল ব্রিটিশ পলিটিক্যাল লাইফ ইজ এ হিউজ অ্যাণ্ড ননকম্প্রমাইজিং ফাইট বিটুইন কম্প্রমাইজিং কনজারভেটিভস অ্যাণ্ড কম্প্রমাইজিং স্যোসালিস্টস!'

কথাটা বোধহয় হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

ওয়াকিবহালরা জানেন ব্রিটেনে টোরি মানেই যেমন চরম দক্ষিণপন্থা নয়, তেমনই লেবার মানেই ফুলে পল্লবে সুশোভিত সোস্যালিজম নয়। এঁদের সোস্যালিজ-এর সঙ্গে কার্লমার্কস-এর সম্পর্ক অতিশয় সূক্ষ্ম। এমন কি স্যোসালিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল-এর অন্যান্য শরিকদের মধ্যেও ব্রিটিশ লেবার পার্টির লাল ভাব অতিশয় ফিকে! ওঁরাও এঁদের 'আগমার্ক' দিতে চান না। সুতরাং, বিলেতি স্যোসালিজম বিলেতি ভাবে বোঝার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

সোজা কথায় ব্রিটিশ লেবার পার্টি ক্রমওয়েল-এর 'রাউণ্ড-হেড'দের দূরবর্তী বংশধর। ওঁরা ননকনফর্মমিস্ট, মূলত ওঁরা পিউরিট্যান। এখনও ভেতরে ভেতরে নাকি সেই রিফরমেশন-এর ভাবাদর্শ। ওঁদের বক্তব্য সার: মানুষ না-ই বা বাঁচল অনেকদিন এই পৃথিবীতে, বেঁচে থাকার জন্য তার প্রয়োজনও হয়তো সামান্যই, তাই বলে তাকে তার নায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। যত মার্কসবাদী কচকচি, জাতীয়করণের হুমকি, সব কিছুর পেছনেই সেই প্রাচীন বিশ্বাস: গড হ্যাজ গিভেন ম্যানকাইণ্ড হিজ ওয়ার্ড অ্যাণ্ড দেয়ার ফ্রীডম, সো দ্যাট দে মে ইনট্রডিউস এ মিনিমাম অব জাস্টিস ইনটু সোসাইটি। 'ন্যায়বিচারের' ভিত্তিতে জনকল্যাণ-মূলক রাষ্ট্র লেবার পার্টির লক্ষ্য। তার চেয়ে খুব দূরবর্তী কোনও কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়।

কনজারভেটিভরা অবশ্য সেটা স্বীকার করেন না। লেবার পার্টি তাদের কাছে স্যোসালিজম-এর পতাকাধারী। আর, স্যোসালিজম? একজন টোরি এম-পি'র (বিভারলি ব্যাক্সটার) মুখেই মার্কস-এর

মূল্যায়ন শোনা যাক। তিনি বলেন—কার্লমার্কস লণ্ডনে বাস করতেন। তিনি অলস ছিলেন। পরিশ্রমের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। সুতরাং, তিনি বসে বসে ধনতন্ত্রের নিন্দা করে প্রবন্ধ লিখতেন।...আজ তিনি এদেশের কিছু নাবালক নাবালিকা তাত্ত্বিকের মগজেই অবস্থান করেছেন। ওরা ভাবে স্রেফ স্বপ্নের মহিমা প্রচার মানুষকে সহজেই দেশপ্রেম থেকে টেনে বের করে আনা যাবে, এবং বিশ্বকে বিনাশ করে তখন দিব্যি নতুন বিশ্ব গড়া যাবে। আর একজন টোরি নায়ক ইনক পাওয়েল বলেন—এবার থেকে আমি যখন 'কম্যুনিস্ট' বলব তখন বুঝতে হবে আমি সময় বাঁচাচ্ছি। এতে অবশ্য বলারও সুবিধা। 'কম্যুনিস্ট' বলতে আমরা 'কম্যুনিস্ট' এবং 'ফ্যাসিস্ট' দুই সম্প্রদায়কেই বোঝাই!

লেবার যদি 'রাউণ্ডহেড', কনজারভেটিভরা তবে 'ক্যাভেলিয়ার'। এঁদের আদি অ্যাঙ্গলিকান চার্চ। এঁরা 'রাজার দল।' একদা যাঁরা প্রথম চার্লসকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন আজকের টোরিরা একদিক থেকে তাঁদেরই মানস সন্তান। এঁদের ঐতিহ্য 'গুড কিং,' 'গুড লীডার,'—প্রজারঞ্জন রাজা এবং সৎ নায়ক। ওঁরাও দুর্বল এবং গরিবকে ধনী এবং প্রবলের হাত থেকে রক্ষা করতে চান। তবে অন্য কারণে, এবং অন্য ভাবে। ধনীরা এঁদের বিবেচনায় পিতৃস্থানীয়। ফরাসী বিপ্লব এঁদের ধ্যানের জগতে কিঞ্চিৎ নাড়া দিয়ে গেছে। বার্ক সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন—অন্তে কল্যাণকর হঠাৎ আমূল পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশী শ্রেয় মন্দ 'স্টেটাস কো'! তিনিই টোরিদের কার্লমার্কস। তাঁর ধারণা ছিল সমাজ এক জৈবিক অস্তিত্ব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ছেঁটে তাকে সংশোধন করতে চাইলে সমাজের মৃত্যু অনিবার্য। ঈশ্বর যাকে যে স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন প্রত্যেকের কর্তব্য সেখানে থেকেই সাধ্যমত সকলের মঙ্গল চিন্তা করা। ডিজরেলী এর সঙ্গে যুক্ত করলেন নতুন তত্ত্ব—'প্রিজারভ আওয়ার ইনস্টিটিউশনস,

ম্যানটেন দি ইউনিটি অব দি এম্পায়ার, ইমপ্রুভ দি লট অব এভরিবডি,' —আমাদের সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়ে রাখ, সাম্রাজ্যকে রক্ষা কর, সকলের ভাল কর। অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরানো ধ্যানই পরিবেশন করলেন তিনি। সেই সালশাই এখনও টোরিদের সঞ্জীবনী।

ম্যাকমিলান '২১ এবং '৩৭ সনের মন্দার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর কাছে অতএব বেকারী দূর, কিংবা সাধারণের জীবন থেকে আগামীকালের-দুর্ভাবনা দূরের চেষ্টা বৈপ্লবাত্মক কোনও কাণ্ড নয়, সৎ টোরি হিসাবে 'পিতৃকর্তব্য' পালনের আন্তরিক চেষ্টা মাত্র। তিনি যখন বলেন—'উই হ্যাভ নেভার হ্যাড ইট সো গুড' তখন তিনি ধাপ্পা দেন না, গরিবের অবস্থা সত্যই তখন অনেক ভাল। ব্রিটিশ 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর ধ্যানে টোরিদেরও অবশ্যই কিছু কিছু অবদান আছে।

লেবারপার্টি অবশ্য চট করে তা মানতে চাইবে না। টোরিদের তুলনায় ওঁদের কর্মসূচী এক সময় অনেক বেশী স্পষ্ট ছিল, লক্ষ্য —সুনির্দিষ্ট। '৪৫ সনের নির্বাচনে ওঁদের মুখে ধ্বনি ছিল জাতীয়করণের। তারপর ক্রমে এসেছে সামাজিক নিরাপত্তা এবং আর্থিক উন্নয়ণের নানা পরিকল্পনা। কিন্তু আজ নাকি ওঁরা সড়কের শেষ সীমানায় উপনীত, অতঃপর কোথায় যাওয়া যায় সেই তাঁদের ভাবনা।

টোরিদের মত লেবারপার্টি আন্দোলন 'প্রাচীন' নয়। বলা চলে, রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে একালে এর প্রথম প্রকাশ ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় (১৮৮৪)। আরও পেছনে খুঁজতে চাইলে এই 'বামপন্থী' মতবাদের শেকড় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে চার্টিস্ট আন্দোলনে (১৮২৫-৫৫)। কিংবা আরও দূরে রিফরমেশন-এ। এঁরা টোরিদের মত ধর্মপ্রাণ। তবে ওঁদের বিশ্বাস ধর্মশীল থাকতে হলে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া দরকার।

কিন্তু তাই বলে বেশী অর্থ কাম্য নয়, সে-অর্থনীতি 'অনৈতিক', বেশী টাকা থাকলে নৈতিক অধঃপতন অবধারিত। সুতরাং, গরিবের নৈতিক মঙ্গলের জন্য তো বটেই, ধনীদের নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্যও উচিত হবে তাঁদের বেশী বাড়তে না দেওয়া, অর্থ এবং ক্ষমতা দুই-ই ছেঁটে দেওয়া।

'বিপ্লব' নয়, লেবারপার্টিও সংস্কারবাদী। সিডনি ওয়েবের ফেবিয়ান সোসাইটিও মূলত তাই ছিল। চার্টিস্টদের মধ্যে একদল অবশ্য বিপ্লবে আস্থাবান ছিল। কিন্তু ব্রিটেনে তাঁদের মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফেবিয়ানদের আবির্ভাবকালে আরও দু'টি বামপন্থী আড্ডা ছিল ব্রিটেনে। তাদের মধ্যে একটি মার্কসবাদী হিনডাম-এর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন, অন্যটি উইলিয়াম মরিস-এর সোস্যালিস্ট লীগ। দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীরই যোগ ছিল বটে, কিন্তু সে এক ধরণের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ। ওঁরা কেউ গণ সমর্থনের উপর নির্ভর করতে চাননি। ওঁরা কার্যত বুদ্ধিজীবীদের ছোট ছোট ক্লাব মাত্র। এই পরিস্থিতিতে অন্য মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন কীর হার্ডি (Keir Hardie)। ইনডিপেনডেন্ট লেবারপার্টি গড়ার সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সমর্থন নিলেন। তারপর থেকেই ব্রিটিশ রাজনীতিতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা গুরুতর। কেউ কোনদিন একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চাননি,—অন্তত ব্রিটেনের বামপন্থীরা,—যে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বা থাকা উচিত নয়। সমস্যা ছিল—বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকের বন্ধুত্ব স্থাপন। লেবারপার্টি সেই অসম্ভব কাণ্ডই সম্ভব করেছে। এই দল শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ,—নানা শ্রেণী আর উপশ্রেণীর মিলনক্ষেত্র। মনে রাখতে হবে মার্কস নন, ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রের জনক রবার্ট ওয়েন। তিনি শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস

করতেন না, তাঁর লক্ষ্য ছিল আর্থিক এবং আত্মিকসাম্য। মার্কসবাদীরা বলেন—শ্রমিকের বন্ধু হলেও ওয়েন সমাজতন্ত্রী হিসাবে 'ইউটোপিয়ান।' ব্রিটিশ জনতার কাছে অবশ্য লেবার পার্টি ঠিক তা নয়, একটি অতিশয় জীবন্ত রাজনৈতিক দল। '৪৫ থেকে '৫০ সনের মধ্যে ওঁরা অনেক কাণ্ড করেছেন। সাম্রাজ্যের দায়িত্ব থেকে ছুটি, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর পত্তন, জাতীয়করণ, কর-সংস্কার। তবু '৫১ সনে তেরো বছরের জন্য ক্ষমতা থেকে নির্বাসন! '৬৪ সনে আবার সাড়ে পাঁচ বছরের জন্য হোয়াইট হলে ফিরে এসেছিল লেবারপার্টি; এবার মুখে ছিল নব-আথক পরিকল্পনার বাণী,—সমৃদ্ধতর ব্রিটেন। তবু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। '৭০-এর জুনের নির্বাচনেও লেবারপার্টি পরাজিত। মোট আসন--৬৩০টি। প্রার্থী ছিলেন—১৮৩৭ জন। এর মধ্যে কনজারভেটিভরা পেয়েছেন—৩৩০টি, লেবার—২৮৮টি, লিবারেল—৬টি এবং অন্যান্য—৬টি।

লেবারপার্টির পরাজয় বাইরের মানুষের কাছে বিস্ময়কর ঠেকতে পারে। শুধু এজন্য নয়, রাজনৈতিক জ্যোতিষীরা অন্য রকম বলেছিলেন; অনেকের কাছে 'কনজারভেটিভ' নামটাই যেন আজকের পৃথিবীতে যে কোন রাজনৈতিক দলের পরাজয়ের পক্ষে যথেষ্ট। টোরিদল আজ অবশ্য কেবলমাত্র বড় ঘরের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ নেই। সেকেলে টোরিরা ক্রমেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন। সেন্ট জেমস স্ট্রীটের 'হোয়াইট ক্লাবে'র স্মিত আলোকে তাঁরা নব্য টোরিদের হঠকারিতা নিয়ে নিচু গলায় আক্ষেপ করেন। নব্যদের আড্ডা কার্লটন ক্লাব। বংশ, কৌলিন্য, অর্থ—ইত্যাদির প্রভাব এখানেও স্পষ্ট, কিন্তু নায়কদের মধ্যে মধ্যবিত্তের পসারও যথেষ্ট। তবু ব্রিটেনে কনজারভেটিভ দল বলতে কুলীন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অন্যান্য গণমান্যদেরই দল বোঝায়! এক কথায় টোরি দল মানে বড় মানুষের দল, যাঁরা 'নিজের বাড়ির জানলা

দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন নীচে রাস্তা দিয়ে লোকেরা ভিজতে ভিজতে চলেছে।' একজন টোরি নেতা বলেন—'একথা আমি অস্বীকার করব না আমাদের দল সম্পন্নের দল। ওঁদের যদি বাদ দিই তবে সে শূন্যস্থান পূরণ করব কাকে দিয়ে?' টোরিরা অনেক সময় এমনকি হাস্যকর। 'টেটলার'-এর একটি নোটিশে বলা হয়েছিল—কনজারভেটিভরাও সুদর্শনা মহিলাদের মহিমা বুঝতে পেরেছেন। অমুক দিন রাত্রে অমুক ক্লাবে খ্যাতনামা লেডিদের নৃত্যসভা। সদস্যরা অবশ্য আসবেন। মনে রাখবেন—ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ রেসিং, ইট মিন্‌স এ চেক্ অন সোস্যালিজম। আর একবার কুইনটিন হগ লেবারপার্টির একটি বিশেষ কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—দি কনজারভেটিভস ডু নট বিলিভ ইট নেসেসারি, অ্যাণ্ড, ইভেন ইফ ইট ওয়্যার, উই স্যুড অপোজ ইট।'

তবু কনজারভেটিভরা নির্বাচনে জেতেন,—দেশের মানুষ ওঁদের ভোট দেন। ধনাঢ্য এবং 'অফিসার আর জেণ্টলম্যান'রা তো বটেই, কনজারভেটিভরা ছোট ব্যবসায়ী দোকানীর ভোট পান, ভোট পান দেশের এক তৃতীয়াংশ শ্রমিকেরও। টোরিদের বাক্সে কারখানা শ্রমিকের ভোট,—শুনতে বিস্ময়কর ঠেকলেও ব্রিটেনে এটা বাস্তব ঘটনা; অনেকে মনে করেন এটা সেকেলে এক কু-সংস্কারের ফল,—শ্রমিক যেদিন মালিককে তার ভাগ্য নিয়ন্তা বলে জানত সে-দিনেরই স্মারক।

অন্যদিকে লেবারপার্টি তুলনায় অনেক বেশী আধুনিক। লেবারপার্টি এখনও মুখ্যত শ্রমিকের দল। এবং ব্রিটিশ ভোটারের শতকরা সত্তরজনই শ্রমিক। তরুণ সমাজের টোরিরা সব দিক থেকেই 'সেকেলে'; এমন কি 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' বা শিল্পে আধুনিকতার প্রয়োগেও ওঁরা কালের দাবি মেটাতে পারেননি। লেবার সেদিক থেকে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক দল। অবশ্য এই দল যথেষ্ট আধুনিক কিনা সে-বিষয়েও অনেকের মনে সংশয়।

ক্রিটোফার ম্যাথু নামে একদল লেবার এম. পি 'পার্টি গেমস' নামে বইয়ে লিখেছেনঃ কি বৃদ্ধ, কি তরুণ, স্বভাবত যাঁরা বামপন্থী তাঁরা সবাই লেবারপার্টির উপর আস্থা হারিয়েছেন। বৃদ্ধরা মনে করেন লেবারপার্টির যেটুকু করণীয় ছিল তা সে করে ফেলেছে। তরুণেরা মনে করে লেবার কিছুই করতে পারেনি। লেবারপার্টির রাজনীতি আদৌ একালের উপযোগী নয়। লেবার-পার্টিও 'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর অংশে পরিণত।

তা সত্ত্বেও লেবারপার্টি এখনও জনতার দল হিসাবে স্বীকৃত। লিবারেলদের স্বুবর্ণ-যুগে তামার রঙ ধরেছে অনেকদিন। কম্যুনিস্টদের অবস্থাও রীতিমত খারাপ। '৪৫ সনের নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা কুড়িজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন; ভোট পেয়েছিলেন এক লক্ষ, সীট—ছুইটি; '৫০-এর নির্বাচনে একশ'জন কম্যুনিস্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন আসরে, কিন্তু ফল শোচনীয়। ছুটি আসন তো খোয়া গেলই, ভোটও কমে বিরান্নব্বুই হাজারে এসে ঠেকল। ১৯৫১ সনে প্রার্থী ছিল দশ জন, ভোট মিলেছিল সাকুল্যে একুশ হাজার, ১৯৫৫ সনে—প্রার্থী সতের জন, প্রাপ্ত ভোট বত্রিশ হাজার। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি, অতএব প্রধানত একা-ডেমিক, বুদ্ধিজীবীদের আশ্রমের মত। ওঁদের দৈনিক কাগজ আছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাত্ত্বিকেরা আছেন, মে-দিবসের মিছিল দেখলে মনে হয় নিষ্ঠাবান কর্মীও কিছু আছেন, কিন্তু রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। লেবারের ভাষায় কনজারভেটিভরা 'গতকালের মানুষ,' 'মেন অব ইয়েস্টারডে'—ভবিষ্যৎ এখন লেবার পার্টিরই হাতে থাকার কথা।

কেননা, লেবার পার্টি বেকারী দূর করেছে। উত্তরাঞ্চলে অবশ্য এখনও কিছু কিছু বেকার আছেন। চার বছর আগে তাঁদের সংখ্যা ছিল নাকি কর্মক্ষমদের শতকরা ছুই ভাগ, '৭০-এর নির্বাচন উপলক্ষে শোনা গেছে—শতকরা ৫'২ ভাগ। তা হোক, লেবার

পার্টির কল্যাণে কাজ না থাকলেই শ্রমিককে আজ না খেয়ে থাকতে হয় না। বেকার ভাতা আছে। চিকিৎসা সরকারী দায়িত্ব। বার্ধক্য-ভাতাও নিশ্চিত। তাছাড়া লেবার পার্টি বিবাহবিচ্ছেদ আইন যুগোপযোগী করেছে, গর্ভপাত আইন সংশোধন করেছে, প্রাণদণ্ডের প্রথা উচ্ছেদ করেছে, হাউস অব লর্ডস-এর ক্ষমতা খর্ব করেছে—এবং কী নয়! ব্রিটেনের আর্থিক স্বাস্থ্য অবশ্য এখনও খুব ভাল নয়। কিন্তু ১৯৬৯-৭০-এ আর্থিক খতিয়ান জানিয়েছে দীর্ঘদিনের ঘাটতি পূরণ করে দেশের তহবিলে অবশেষে উদ্বৃত্ত। লেবার পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতি নাকি ক্রমে আরও উন্নত হওয়ার কথা। এই দল সুয়েজের পূব থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনবে, কমন মার্কেটে ঢোকবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক—দুই পক্ষকেই শাসনে রেখে ব্রিটেনের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে সফল করবে।

অথচ জিতল কে?

টোরি।

নির্বাচনের মাত্র কয়দিন আগে এডিনবরা বিমান বন্দরে এডোয়ার্ড হীথের সামনে একটি নোটবই নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। বোর্ড অব ট্রেড ওদের কাজে নামিয়েছে। আসা-যাওয়ার পথে হঠাৎ যাত্রীরা এদের মুখোমুখি পড়ে যায়। জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। হীথও ব্যতিক্রম হলেন না। প্রথমে—মহাশয়ের নাম? তারপরই দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—আগমনের উদ্দেশ্য?

—বিজনেস। উত্তর দিয়েছিলেন হীথ। —আপাতত ব্যবসা আমার ইলেকশন।

—এই ব্যবস্থা আপনাদের কতদিনের? আবার নতুন প্রশ্ন।

—সিন্স দি টাইম অব বেঞ্জামিন ডিজরেলি। উত্তর দিলেন হীথ।

—শেষ গন্তব্য স্থল?

—১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট।

মেয়েটি, বলা নিষ্প্রয়োজন, এডোয়ার্ড হীথকে চিনতে পারেনি। মনে হয়, ওঁকে চিনতে পারেননি প্রতিপক্ষও। কেননা, হীথ সত্যি সত্যিই দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে পৌঁছে গেছেন। এবং পৌঁছেছেন এমন এক নির্বাচনে যেখানে আটাশ লক্ষ ভোটারের বয়স আঠারো থেকে একুশের মধ্যে। উইলসনের শ্রমিক সরকারের কল্যাণেই এঁরা আঠারো বছর বয়সে মালাবদলে এবং ভোটদানে হকদার। তবু লেবার পার্টি হেরে গেল কেন, আর কেনই বা জিতল এডোয়ার্ড হীথের দল—তা নিয়ে এখানে গবেষণা অবান্তর। এশিয়া-আফ্রিকার কৃষ্ণ-কান্তদের সম্পর্কে টোরিদের কট্টর মনোভঙ্গী, লেবার জমানায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সম্ভাবনা; ভোটারের নিদ্রাবিলাস, মুখ বদলের অভ্যাস,—সন্দেহ নেই, ইত্যাদি বহুতর কারণ অতঃপর আবিষ্কৃত এবং বিশ্লেষিত হবে। হয়তো লর্ডস-এর মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বাতিল-খেলা, কিংবা ম্যাক্সিকোর মাঠে ইংল্যাণ্ড দলের পরাজয়ের জন্যও উইলসনকে বিস্তর ভোট জরিমানা গুনতে হয়েছে। সবই সম্ভব।

’৭০-এর নির্বাচনে লেবার পার্টির ধ্বনি ছিল: নাউ ব্রিটেন ইজ স্ট্রং—লেট আস্ মেক ইট গ্রেট টু লিভ ইন। ওঁরা লিট্‌ল ইংল্যাণ্ডকে আবার ‘গ্রেট ব্রিটেনে’ পরিণত করতে চেয়েছিলেন। টোরিদেরও একই ধ্বনি: এ বেটার টুমরো। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সূর্য আগামী কাল কতখানি ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদিত হবে আকাশে, তা আগামী কালই জানে। বাইরের দর্শক এটুকু জানে যে, সকাল যদি অতঃপর কুয়াশাচ্ছন্ন হয় তবে তার জন্য হীথের বিজয় কিংবা উইলসনের পরাজয় দায়ী নয়। আবার ভোর যদি সত্যি সত্যিই আলোর বার্তা নিয়ে আসে তবে তার কৃতিত্বও টোরিদের একার প্রাপ্য নয়। বস্তুত ব্রিটেনের এই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্ম-পরিধি বেশ

কিছুদিন ধরেই সংকুচিত। সম্প্রসারণের সুযোগ বড়ই কম। পা বাড়াতে চাইলেই লেবার পার্টিকে যেমন টোরি-এলাকার মাটি মাড়াতে হয়, টোরিদেরও তেমনই এগোতে চাইলেই লেবারের ভাব-জগতে পা বাড়াতে হয়। বিশুদ্ধ টোরি-ভাবাদর্শ বলে আজ যেমন বিশেষ কিছু নেই, ঠিক তেমন একান্তভাবে লেবার-আইডিয়া বলেও খুব বেশী কিছু নেই। 'দে আর অল দি সেম!'—এই খেদোক্তি পুরাপুরি না-হলেও আংশিক সত্য অবশ্যই।

টোরিদের সঙ্গীত—'ল্যাণ্ড অব হোপ অ্যাণ্ড গ্লোরি। লেবার পার্টির গান— 'কাম ডানগিওন (dungeon) ডার্ক অব গ্যালোজ গ্রিম—।' তুই দলের বার্ষিক সভাগুলো দেখলে সন্দেহ থাকে না, সুরে তারতম্য থাকলেও তুই তরফই আজকের ইংরাজ। প্রথা অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার শুরু হয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন। চলে চারদিন। তারপর ট্রেউ ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা যোগ দেন লেবার পার্টির বার্ষিক জমায়েতে। সাধারণ এ জমায়েত বসে সমুদ্রতীরবর্তী কোনও শহরে,—অক্টোবরে। সাধারণত আট দিনের ব্যবধানে সেখানেই আয়োজিত হয় টোরিদের বার্ষিক মেলা। তুই জমায়েতের মানুষের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য আছে। টোরি আড্ডায় বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দামী পোষাকে ধীর পায়ে আনাগোনা করেন, দলের পুস্তিকাদি বিতরণ করেন। হঠাৎ কোনও বৃদ্ধ কাগজটা হাতে নিতে নিতে মেয়েটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকান,—আরে, এ যে লেডি-এক্স-এর মেয়ে!—গুড হেভেনস!—তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেই '৫৪ সনে, আমি তখন রোডেশিয়া থেকে —ইত্যাদি। লেবার পার্টির মেলায় দৃশ্যটা একটু অন্য রকম। তরুণী মেয়েরা স্ল্যাকস পরে ঘুরছে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছোকরারা উদাসীর মত ভাববিহ্বল চোখে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে সোস্যালিজম-এর মূর্ত বিগ্রহের দল

উপবিষ্ট। কেউ মান্য অধ্যাপক, কেউ খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, কেউ সফল আইনজীবী, কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী। ওঁরা যখন গলা ছেড়ে 'আসুক অন্ধকার কারাকক্ষ, আসুক নির্মম ফাঁসিকাষ্ঠ' বলে গান ধরেন তখন পরদেশী এই শ্রোতা তাঁদের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করেন না, শুধু ভেবে ভেবে হয়রান—আজকের ব্রিটেনে এই লেবার পার্টির মুখে এ-গানের তাৎপর্য কোথায়! স্যোস্যালিজম এখন ব্রিটেনে টোরি-মতবাদের মতই সম্মানিত।—নয় কি? তা ছাড়া, এটাও আজ সর্বজনবিদিত কেউ স্যোসালিস্ট মানেই তিনি 'কমনার' নন, স্যোসালিস্টদের মধ্যেও 'লর্ড' আছেন।

ব্রিটিশ রাজনীতিতে এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটি কাগজ লিখেছিল—ব্রিটিশ যাজকেরা সব রকম দলীয় রাজনীতির বাইরে। অধিকাংশ বিশপকে বলা চলে 'লিবারেল কনজারভেটিভস, উইথ স্ট্রং স্যোসালিস্ট লিনিংস।' অধিকাংশ ব্রিটিশ স্যোসালিস্টকেও বোধহয় তা-ই বলা চলে। কনজারভেটিভদের একাংশকেও অনায়াসে এই বন্ধনীতে ফেলা যেতে পারে। পৃথিবীর যে কোন দেশেই কোনও 'লর্ড' স্যোসালিস্টে পরিণত হতে পারেন। সে-রূপান্তর মোটেই বিস্ময়কর নয়। আমাদের দেশেও রাজা-স্যোসালিস্ট'রা আছেন। কিন্তু ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না স্যোসালিস্ট থেকে 'লর্ড'-এ রূপান্তরের নজির। ভাইকাউন্ট স্ট্যানসগেট অনেক লড়াই করে অ্যান্টনি ওয়েজউড কেন হয়েছেন, লর্ড অ্যালট্রিনচহাম পরিণত হয়েছেন জন গ্রীগ-এ। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন—লর্ড স্যাণ্ডউইচ, লর্ড হিউম, লর্ড হেলসহাম প্রভৃতি 'মহান লর্ড'রা। পরক্ষণেই বিপরীত দৃশ্য। সোসালিস্ট লর্ডদের বাহারী-শোভাযাত্রা। লর্ড এটলি, লর্ড মরিসন, লর্ড আলেকজাণ্ডার, লর্ড সিলকিন, লর্ড ডালটন, লর্ড শক্রস, লর্ড বার্ডেন······আরও কত কে। ওঁরা জীবনভর প্রিভিলেজ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে নিজেরাই 'পীয়ার'!

এই আপসের মধ্যেই বোধহয় নিহিত ব্রিটিশ রাজনীতির গূঢ় মন্ত্র। আজকের ব্রিটেনে যে-সব রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক সংগঠন তার অধিকাংশই সামন্ত যুগের স্মারক। তবু যে এগুলো টিঁকে আছে তার পিছনে একমাত্র কারণ, খোলসটাকে অটুট রেখে ভেতরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে কেউ আপত্তি করেন না। টোরিরা সে কারণেই অপেক্ষাকৃত সহজে লেবার পার্টির নকশা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারেন, লেবার পার্টির প্রবীণ নায়ক ধীরে ধীরে হাউস অব লর্ডস-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ-খেলা কতদিন চলবে? তার উত্তর, যতদিন লেবারপার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা করলে ব্রিটেনের এই শান্ত সভ্য রাজনৈতিক পরিবেশে অবশ্যই অশান্তির হাওয়া উঁকি দেবে। অবশ্য সেটা বাইরের দর্শকের অনুমান মাত্র। জনৈক ব্রিটিশ পাদ্রীর অভিমত কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলেন— যতদিন সিনেমা আর ফুটবল আছে ততদিন প্রলেটারিয়েটদের নিয়ে আমাদের ভাবনার কিছু নেই।

ব্রিটিশ রাজনীতিতে আর এক রহস্য—'এস্টাব্লিশমেণ্ট'। রাজনৈতিক দলের মত তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বাতাসের মত সর্বক্ষণ নাকি অনুভব করা যায়। 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' এক ধরণের 'লবি'। তবে মামুলি ধরণের 'লবি' নয়; অনেকে বলেন ব্রিটিশ রাজনীতির চাবিকাঠি আসলে 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এরই হাতে।

শব্দটার আদি 'এস্টাব্লিশড চার্চ'-এ। কিন্তু ১৯৫৫ সনে হেনরি ফেয়ারলি নামে এক সাংবাদিক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করলেন এই শব্দটিকে। তাঁর কাছে 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' শুধু চার্চ নয়, আরও কিছু সংগঠন এবং ব্যক্তির এক মিলিত সংস্থা। চার বছর পরে প্রকাশিত হল হিউটমাস-সম্পাদিত টীকা-পুস্তক 'দি এস্টাব্লিশমেণ্ট,' এস্টাব্লিশমেণ্ট কী, কেন—বিস্তারিত আলোচনা মিলবে তার পাতায়।

লেখকদের বক্তব্য: ফ্রান্সে যেমন যাবতীয় ক্ষমতার চাবি দু'শ পরিবারের হাতে আছে, ঠিক তেমনই ব্রিটেনের আসল ক্ষমতাও 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এর হাতে। এঁরা অদৃশ্য গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিঃশব্দে, আড়ালে থেকে ওঁরা কলকাঠি নাড়েন, এস্টাব্লিশমেণ্ট-এর জাদুস্পর্শে সরকারী নীতি পালটে যায়, কিংবা ধার হারায়। 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এর কল্পিত খাতায় যে সব সংগঠনের নাম ছিল তার মধ্যে অন্যতম: ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড, বি-বি-সি; দি টাইমস, অক্সফোর্ডের একটি কলেজ, কয়টি বনেদী পরিবার-ইত্যাদি। এদের কর্তারা পরস্পর বন্ধুভাবে চলেন এবং নানা ভাবে রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করেন। হাউস অব লর্ডস এবং কমনস-এ ওঁদের ঘাটি আছে। আর এক ঘাটি—বাকিংহাম প্যালেস।

১৯৬৩ সনে ম্যাকমিলান যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাতে নাকি এস্টাব্লিশমেণ্ট-এর সদস্যদের ছড়াছড়ি। অধিকাংশই নাকি পরস্পরের নিকট দূর আত্মীয় কিংবা বান্ধব। এ-কথা মনে কবার কোনও হেতু নেই দেশ দীর্ঘদিন লেবার পার্টির শাসনাধীনে ছিল বলেই 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' আজ পর্যুদস্ত, কিংবা মৃত। 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এর সহ্য-ক্ষমতা অসাধারণ। আক্রমণকারীরা যখন অতিশয় প্রবল—তখন সে পিছু হটে যায় বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার এগিয়ে আসে সামনের দিকে। ওঁদের রণকৌশলও অনেকটা গেরিলা-ধরণের; তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়ো, আমরা আমাদের কায়দায়। শত্রু যখন এগিয়ে আসে তখন পিছু হঠি, শত্রু যখন হঠে যায় আমরা তখন এগিয়ে যাই—।

'এস্টাব্লিশমেণ্ট' অপরাজিত। 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' অমর। সুতরাং কী করে তাকে জব্দ করা যায় তা নিয়ে ভেবে ভেবে হয়রান না-হয়ে উচ্চাভিলাষী ইংরাজ ফিকির খোঁজেন কী করে এস্টাব্লিশমেণ্ট-এর সদস্যপদ লাভ করা যায় তারই। সে-পথের কিছু নিশানা মিলবে পরের অধ্যায়ে। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি হাউস অব লর্ডস-এর

বাইরে এই দীন 'কমনার' সাকুল্যে দর্শন লাভ করেছেন মাত্র জনা চারেক লর্ড-এর। তাঁদের মধ্যে একজনকে বাদ দিলে অন্যদের সঙ্গে 'হাউ-ডু-ইউ-ডু' বিনিময় ছাড়া অন্যদের সঙ্গে আর কোনও কথা হয়নি। সুতরাং, বলা নিষ্প্রয়োজন, ও-পাড়ার খবর সব শোনা-কথা মাত্র, ঘোড়ার মুখের খবর নয়।

'এটা গণতন্ত্রের যুগ। সাধারণ ঘরের সন্তানেরা আজ সম্মানের উচ্চতম শিখরে উঠে আসছেন। স্বভাবতই আমাদের মত প্রাচীন পরিবারগুলোর আজ কঠিন পরীক্ষার সময়।' কথাগুলো বলেছিলেন বোধহয় রানী স্বয়ং, কিংবা তস্যা জননী। মোট কথা রাজবাড়ির কেউ।

সেখানেই যখন দুঃশ্চিন্তার ছায়া, তখন লর্ডদের পাড়ায় কান্নার রোল ওঠার কথা। কেননা, তাঁদের দিন সত্যিই মন্দ। সাম্রাজ্য নেই। ছেলেদের আর 'এম্পায়ার বিল্ডিংয়ে'র কাছে বাহিরে পাঠানো যায় না। এদিকে ঘরেও বিপর্যয়। টম ডিক-হ্যারি খেতাব লুটছে। সবাই 'জোন্স' হয়ে যাচ্ছে। হাউস অব লর্ডস-এর ক্ষমতা কমছে; সেই সঙ্গে কমছে 'পীয়ার'-এর খাতির। তার চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার,—'ডেথ ডিউটি', 'ইনকাম ট্যাক্স', 'সুপার ট্যাক্স' ইত্যাদি। ভদ্রাসনটুকুও বাঁচিয়ে রাখা দায়।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই, ওঁরা তবু কাঁদছেন না। এদেশের রাজা মহারাজাদের মত 'কনকর্ড' গড়ে সরকারের সঙ্গে দরবার করছেন না। বরং নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছেন। যে করে হোক, ব্রিটিশ অ্যারিস্টোক্র্যাসিকে বাঁচাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সুতরাং, উদ্ভাবিত হয়েছে রকমারি কৌশল।

অ্যারিস্টোক্র্যাসির চার পা—অর্থ, কৌলিন্য, ক্ষমতা এবং প্রভাব। বলে রাখা ভাল অ্যারিস্টোক্র্যাট আর বুর্জোয়া এক শ্রেণীর প্রাণী নয়। অর্থ দুই শ্রেণীরই আছে,—থাকে। কিন্তু সাচ্চা অ্যারিস্টোক্র্যাট কখনও নিজের হাত বা মাথা খাটিয়ে টাকা রোজগার করেন না। বস্তুত রোজগার করাটাকে তিনি ঘৃণ্য মনে করেন। অ্যারিস্টোক্র্যাসির প্রথম লক্ষণ—অনুপার্জিত অর্থ। তবু অন্য ধরণের অর্থকে আজ অস্বীকার করতে পারছেন না ওঁরা। সর্বদেশেই টাকার অষ্টোত্তর শতনাম, পাউণ্ড-শিলিংও তার ব্যতিক্রম নয়। স্রেফ টাকার জোরেই লর্ডদের পল্লীতে প্রতিদিন এসে হানা দিচ্ছেন অনধিকারীর দল। দুয়ারে কড়ানাড়ার শব্দ।

বনেদী গৃহপতিরা জানেন—কুলপঞ্জী দাবি করে এঁদের ঠেকানো যাবে না। আমাদের যেমন রাশিচক্র আর ঠিকুজী, ব্রিটেনে তেমনই অন্যতম শিল্প কুলপঞ্জী। ঘরে ঘরে তার চর্চা। 'এক্সপোর্ট আইটেম' হিসাবেও নাকি ওটা চমৎকার। সেরা বাজার আমেরিকা। তবে আমেরিকানরা নাকি ব্যস্ত একমাত্র মাতৃকুল সম্পর্কেই। ওঁরা নীচকুলোদ্ভব বাবা চান, কিন্তু মাকে হতে হবে প্রকৃত নীলরক্ত-ধারিণী। সে প্রমাণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে ব্রিটেনের বংশলতা-রচনাকারীর দল। কিন্তু স্বদেশে বেচারাদের হাট নাকি ইদানীং খুব সুবিধের নয়। বিপত্তির কারণ গবেষকরা নিজেরাই। আমাদের শাস্ত্রে নাকি বলে—নদী নারী আর কুলের উৎস সন্ধান করতে নেই। ওঁরা সে নিষেধের কথা বোধ হয় জানতেন না। ফলে ক্রমে ক্রমে জানা গেলে—সব প্রাচীন বংশের আদি খুব গৌরবজনক নয়।

রাজা রানীরা অবশ্য তৎকালেও খেতাব বিলাতেন দেশসেবা এবং এবং রাজানুগত্যের জন্য। কিন্তু কখনও কখনও অন্য কারণেও রাজসম্মান জুটত। দ্বিতীয় চার্লস নাকি কিছু রূপসীকে ডাচেস বানিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে, একজন স্পষ্টবক্তা ডিউকের ভাষায়—'ফর সার্ভিসেস রেনডারড্ ইন হোরাইজেনটাল পজিশন!' কেউ কেউ উঁচুতে উঠেছিলেন রাজার বাতিল রক্ষিতাদের বিয়ে করে। তাছাড়া খাঁটি নীলরক্তের সন্ধানে যাঁরা ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ান ইউলিন ওয়া তাঁদের আরও একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন; তিনি বলেন—মনে রাখতে হবে পরস্ত্রী নিয়ে আমাদের রেওয়াজ তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না, বরং অপেক্ষাকৃত কম চল ছিল বিবাহ-বিচ্ছেদ, সুতরাং—।

সুতরাং, বনেদীরা নিজেদের বংশ নিয়ে গর্ববোধ করলেও অন্যদের বংশপরিচয় নিয়ে কথা পাড়তে চান না। হাউস অব লর্ডস-এ এক লর্ড তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন—আমার মতে দেশের নায়ক বাছাইয়ের একমাত্র পথ বংশানুক্রম অনুসরণ করা, লটারি ছাড়া আর যে কোনও পদ্ধতিই আমরা অনুসরণ করি না কেন, তাতে অন্যদের অভিমত নিতে হবে, এবং আমার মতে এসব গুরুতর ব্যাপারে সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুঃখের বিষয় ওঁর এই মূল্যবান পরামর্শ কেউ গ্রহণ করছেন না। রাস্তার মানুষ নায়ক বাছাই করছেন। এমন কি রানী পর্যন্ত 'যাঁকে তাঁকে' খেতাব দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অভিজাতরা অবশ্য জানেন, চাইলেই খেতাব মেলে না। কিন্তু এটাও তাঁদের অবিদিত নেই, খেতাব মেলে। টাকা থাকলে তো বটেই। আর অর্থের সঙ্গে একবার রাজসম্মান যুক্ত হলে ঠেকায় কে,—অজ্ঞাতকুলশীলরা তখন বৈঠকখানায় ঢুকবেই।

সেটা যাতে 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' গোছের ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য অ্যারিস্টোক্র্যাটরা আপন সমাজের চারপাশে ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড গড়ে তুলেছেন। চট করে সে দুর্গে

ঢোকবার জো নেই। কী করে ঢোকা যেতে পারে একজন ঘরশক্র সকলকে কানে কানে তা বলে দিয়েছেন। তিনি জন, বেডফোর্ডের ত্রয়োদশ ডিউক। আড়াই শিলিং দর্শনীর বিনিময়ে পাবলিকের জন্য পারিবারিক প্রাসাদের দরজা খুলে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, এই 'দুষ্ট ডিউক' আপন সমাজের গোপন রীতিনীতিগুলোও সকলের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সত্যই যদি কেউ বনেদী পাড়ায় প্রবেশাধিকার চান তবে তাঁর অনেক কৃত্য। প্রথম শর্ত—টাকা চাই। অজস্র টাকা, অগুনতি টাকা। মিলিয়নস। এককালে বনেদীরা টাকার জাত বিচার করতে বসতেন। তাঁদের কাছে তখন টাকা দু'ধরণের; ভাল টাকা, মন্দ টাকা। পরিচ্ছন্ন টাকা, আপত্তিকর টাকা। সাদা টাকা, কালো টাকা। আজকাল এসব শুচিবাই নেই বললেই চলে। তবে দু'চার লাখ দেখিয়ে ওঁদের বশ করা যাবে না। ল্যাণ্ড-স্প্যাকুলেটার লাখ পাঁচেক পাউণ্ড পকেটে পুরতে পারলেই ওঁরা তাঁকে আখ্যা দেবেন প্ল্যানার, ড্রিমার! আগেই বলা হয়েছে এক সময় টাকা-করা নামক ব্যাপারটা ওঁরা আন্তরিক ঘৃণা করতেন। ফলে, শ্রেষ্ঠীদের দেখলে ওঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হত। এখনও হয়। তবে বিতৃষ্ণা সর্বক্ষেত্রে নয়। এই সেদিন অবধিও ওঁদের চোখে ডালের চেয়ে তেলের (খনিজ) ব্যাপারী এবং কাঁসার চেয়ে লোহার (ইস্পাত) কারবারী ছিল সহনীয়। এখন সহনীয় প্রায় সবাই। ঘোড়ার 'বুকি' ছয় লাখ পাউণ্ড জমাতে পারলেই 'টাইকুন' বনে যায়, দাদনদার সাত লাখ পাউণ্ড জমাতে পারলে—মার্চেন্ট ব্যাংকার। তবে বনেদী পাড়ায় ঢুঁ মারতে পারলে কমপক্ষে পকেটে থাকা চাই দশ লাখ পাউণ্ড।

কাফকার গল্পের মত রাতারাতির 'মেটামরফসিস' সম্ভব নয়। এবার ধীরে ধীরে এগোতে হবে। টাকা হয়েছে,—উত্তম কথা। অভিজাতদের খাতায় নাম লেখাতে চাও,—খুব ভাল কথা। এবার

তবে টাকার মায়া পরিত্যাগ করতে শেখ। কিছু দৌড়ের ঘোড়া কেনো। মনে রাখবে বাকিংহাম প্যালেস-এর দরজার পথ গেছে আস্তাবলের ভেতর দিয়ে। রানী ঘোড়া ভালবাসেন। তাঁর মা এবং মেয়েও। রানী নাকি ঘোড়ার গায়ের গন্ধও ভাল বাসেন। কোনও এক অশ্বরসিকের আস্তাবল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। গোলাপ জলে পরিষ্কার করা হয়েছিল পথ ঘাট সিঁড়ি, কিন্তু আস্তাবল অধৌত। কেননা, নয়ত পরিবেশের স্বাভাবিকতা থাকবে না, রানীর মন খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। লর্ডরা এদিকের তৃণগাছা নিজের হাতে ওদিকে সরাতে নাকি নারাজ। ডিউক অব মার্লবারো একবার ভ্যালেকে সঙ্গে না-নিয়ে মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নাকি মহা-মুশকিলে পড়েছিলেন। তাঁর নালিশ—দাঁত মাজার বুরুশে একদম ফেনা হচ্ছে না। শেষে অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো হল,—সেটা বুরুশের দোষ নয়, টুথ পাউডার কিংবা পেস্ট না দিলে কোনও বুরুশেই ফেনা হয় না। ডিউকের নাকি সে খবরটাও জানা ছিল না। এহেন মান্যদেরও নাকি কখনও কখনও সগর্বে বলতে শোনা যায়, আমি নিজের হাতে প্রতিদিন আমার আস্তাবল সাফাই করি! সুতরাং, হবু অ্যারিস্টোক্র্যাটকে ঘোড়া কিনতেই হবে। তৎসহ এক আধখানা ইয়াট,—প্রমোদতরী। তবেই শুরু হবে প্রকৃত অভিজাতদের সঙ্গে চেনা জানা।

তবে ঘনিষ্ঠতার আগে আরও অনেক কৃত্য। দরকার হলে নাম পর্যন্ত পালটাতে হবে। শুধু পদবি নয়, এমন কি পিতৃদত্ত নামটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে নতুন নাম নিতে হবে। যে গর্বিত ইংরাজ তাতে রাজী হবেন না তাঁকে অ্যারিস্টোক্র্যাট হওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে হবে। সেক্সপীয়রের দেশ হলেও এতদ্দেশে নামে আসেযায়। বিশেষত বনেদী পাড়ায়। সর্বনাম সেখানে সমান গ্রহণীয় নয়। অত্যাধুনিক নাম দু-নলা, তিন-নলা নাম, বিদেশী গন্ধজড়ানো নাম না কি রীতিমত সন্দেহজনক। নাম হতে হবে সহজ সরল এবং

টেঁকসই। জন, জর্জ, উইলিয়াম, পিটার, মাইকেল, রবার্ট, চার্লস; কিংবা অ্যান, মারি, এলিজাবেথ—এসব সাবেকি নাম নেই কোনও দুর্ভাবনা নেই। ক্রিশ্চিনও নাকি এক সময়, শ্রীমতী কীলার তাকে হত্যা করে গেছেন। হবু অ্যারিস্টোক্র্যাটকে অতএব অতি সাবধানে নাম বেছে নিতে হবে। তারপর তাঁর প্রথম কাজ হবে আপন সাধনা বলে 'মিঃ' বর্জন। অর্থাৎ মিঃ সোঅ্যাণ্ডসো'র বদলে তিনি বন্ধুমহলে পরিচিত হবেন সুদ্ধ জ্যাক বা হিউবার্ট নামে। বন্ধুরা তাঁর অন্নপ্রাশনের দিনের নাম ধরেও ডাকতে পারেন, বুড়ো হয়ে গেলেও পিঠে হাত রেখে জনকে তাঁরা বলতে পারেন—'জনি বয়' কিংবা 'ওল্ড চ্যাপ!' তাই শুনে মন খারাপ করলে চলবে না।

তারপর ভাষা। 'নোবলিজ ওবলিজ'-এর পাঠকেরা জানেন অভিজাত এবং সাধারণের মুখের ভাষা এক নয়। কাক আর কোকিলের বুলির মতই বিস্তর ফারাক 'ইউ' আর 'নন-ইউ'-এর ভাষায়। কোন্‌টা শুদ্ধ, কোন্‌টা অশুদ্ধ সে প্রশ্ন অবান্তর, আসল কথা এই বনেদী মহলে পাত্তা পেতে হলে ওঁদের বুলিতে চোস্ত হওয়া চাই। আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর হলেও বাঙালী পাঠককে কিছু নমুনা শোনানো যেতে পারে। কেননা, এতদ্দেশে এখনও 'সাহেব' বিস্তর। বর্ণে তাঁর, কৃষ্ণাঙ্গ হলেও তাঁদের অনেকেরই ধারণা ইংরাজী কথোপকথনে তাঁরা সাচ্চা-ইংরাজ।

হয়তো বা। কিন্তু সম্ভবত বনেদী ইংরাজ নন। কেন না, বনেদী ইংরাজ যে ভাষায় কথা বলেন সেটা না রানীর ইংরাজী, না 'ককনি'। সে ভাষা সম্পূর্ণত ওঁদেরই। কাকনি আউড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করতে পারেন, কিন্তু যাকে বলে 'হাই-সোসাইটি' সেখানে ঠাঁই পাওয়া শক্ত।

শিক্ষিত, ভদ্র, সচ্ছল এবং মার্জিতরুচির সাহেব চশমাকে 'গ্লাসেস' বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু পাকাবনেদী বলবেন, 'স্পেকটিক্যালস'। নোট পেপার সব সময় তাঁর কাছে 'রাইটিং-

পেপার', 'ওয়্যার'—'টেলিগ্রাম', 'সাইকেল'—'বাইক', 'ইল—'সিক', 'ফোন'—'টেলিফোন', 'হাউস'—'হোম', এবং 'ব্রিটেন'—'ইংল্যাণ্ড'। আমাদের পার্কস্ট্রীটের লরেটো-পড়া মেয়েরা হয়তো অনায়াসে এগুলো যখন তখন মুখস্থ করে নিতে পারে, এমন কি চেষ্টা করলে এটুকুও নিশ্চয় মনে রাখতে পারবে 'কালচারড' নন-ইউ, ইউ—'সিভিলাইজড', 'ওয়েলদি' ঠিক 'দেবভাষা' নয়, বলতে হবে 'রিচ্'। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, এ জাতীয় শব্দ অজস্র। উচ্চারণভঙ্গী, ব্যবহারবিধিও বিচিত্র।

চিঠির সম্বোধন, ঠিকানা—'ইউ'-পল্লীতে সবই গুরুতর। যদি কেউ সদ্য চেনা কোনও মান্যকে 'ডিয়ার সার পি-এক্স' না লিখে শুধু 'ডিয়ার সার পি' লেখেন, কিংবা খামের পিঠে কোটেশনে বাড়ির নাম লেখেন (যথা : 'তারা শশী ভবন') অথবা বানান করে পুরো ঠিকানা (যথা : কলকাতা-চৌদ্দ) তবে মান্য লর্ড এক লহমায় জেনে নেবেন গত পরশু তিনি নাচের আসরে আসলে এক ময়ূর-পুচ্ছধারী কাকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এসেছেন। বিশেষত অন্তর্দেশীয় পত্রের উল্টোপিঠে প্রেরকের নামের জায়গায় যদি থাকে —'অমুক চন্দ্র অমুক, এস্কোয়ার' তবে তো আর কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনের তালিকা থেকে নাম কাটা পড়বে।

প্রকৃত অভিজাতের কাছে নীলরক্তের আভাস ফোটাতে হলে আরও আটঘাট জানা চাই। কথাচ্ছলে কোনও চপল যদি নিজেকে জাহির করার জন্য বলেন—কাল আর্ল অব এল-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি অথ নীলবর্ণ শৃগাল কথার নায়কে পরিণত হলেন। ফাঁকে ফাঁকে টুপটাপ নামের মত কিছু নাম অবশ্যই ফেলতে হবে, কিন্তু সাবধানে, যেন ভেঙে না যায়! কোনও প্রকৃত বনেদী ইংরাজ কখনো বলবেন না—'আর্ল অব এল, বলবেন —'লর্ড এল'। তা ছাড়া তাঁদের সমাজে বিশিষ্ট যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব নামটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লর্ড বিভার ব্রুক—'ম্যাক্স',

ই. ডি. ও'ব্রিয়েন—'টবি', মার্কিস অব. টিভিস্কট—'রবিন্', মার্কিস অব ওয়েলিংটন—'নিগস', প্রুশিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক 'ফিজ'। আমাদের দেশে যে এসব কায়দা একেবারে অজ্ঞাত তা নয়। শুনেছি বর্ধমানের মহারাজা এক কালে সই করতেন 'বর্ধমান'। 'ভূকৈলাস' কিংবা 'নাটোর' বলতে তখন সেখানকার রাজাদের বোঝাত। উঁচু-তলায় ঠাকুমার দেওয়া নাম ধরে ডাকাডাকিরও নাকি বিলক্ষণ চল। তবে এসব ব্যাপারে সাহেবি কেতা কানুন তুলনাহীন; সাহেবরাই বলেন তার চেয়ে অনেক সহজ ছিল ইণ্ডিয়ান প্যানেলকোড মুখস্থ করা। ক'জন বলতে পারেন ভাইকাউণ্ট-এর যে বড় মেয়েটি আর্চডেকনকে বিয়ে করেছে তাঁকে কী ভাবে সম্বোধন করা সঙ্গত, কিংবা পীয়ার-পত্নী ওই 'ডেম অব দি ওর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার'-টির সঠিক সম্বোধন কী! ক'জন বলতে পারবেন লর্ড আপার-স্টোনের জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম কেন—লর্ড ইপসউইচ, আর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কেনই বা মিঃ হিন্‌চ!

সুতরাং, মাথা আর ঠোঁট-জিভ-দাঁতকে যে যত ওভারটাইমই খাটান না কেন, দাঁড়ের কাকাতুয়ার সাধ্য নেই ঘরের ভাষা হঠাৎ রপ্ত করে ফেলেন। সুতরাং, অধৈর্য হলে চলবে না। বনেদীদের আপনজন হতে চাইলে সময় দিতে হবে।

ভাষাচর্চার ফাঁকে ফাঁকে অতএব হবু অ্যারিস্টোক্র্যাটকে অন্যান্য কেতাকানুনে দুরস্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ওঁরা ফিসফিস করে অনেক কিছুই জানতে চাইবেন। দাখিল করার মত কুলপঞ্জী হাতে থাকলে কথাই ছিল না, সেটা যুগপৎ স্কুলফাইন্যাল সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রির কাজ করত। তা যখন নেই তখন 'পড়াশুনা কোথায় করা হয়েছে'-জাতীয় অবান্তর প্রশ্নাদিও উঠতে পারে। অবান্তর বলা হল এজন্য, সাচ্চা অ্যারিস্টোক্র্যাট পড়াশুনা সম্পর্কে আন্তরিক-ভাবে খুব আগ্রহী নন। ওঁদের মধ্যে অনেকে বিস্তর পড়েছেন হয়তো, কিন্তু মুখ ফুটে সেটা কাউকে বলা ওঁদের স্বভাবধর্মবিরুদ্ধ।

সাধারণত বেশী না-পড়াটাই নাকি নিয়ম। ফরাসীদেশে বনেদীদের লেখাপড়া শিখতে হয়, অর্থ সেখানে বিদ্যার বিকল্প নয়। ফলে ওখানকার বনেদী পাড়ায় ইনটেলেকচুয়ালদের বিলক্ষণ খাতির, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, বিশেষত ভদ্রমহিলারা সানন্দে দু'চার জন শিল্পী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রিতের তালিকায় রাখেন। ব্রিটেনে অধিকাংশ বনেদী বাড়িতে নাকি সে বালাই নেই বললেই চলে। বড় ঘরে বিদ্যা শুধু অবান্তর নয়, সন্দেহজনকও বটে। ফরাসীর গর্ব তাঁর বিদ্যা, ইংরাজের গর্ব তাঁর অজ্ঞতা।

অজ্ঞতার নমুনা ওই মহল্লায় যত্রতত্র। দু'একটা শোনানো যেতে পারে। প্যালেস্টাইনে লোক বসাবার বাসনায় পরিকল্পনা রচনার সময় আর্থার বালফোর নাকি জানতেন না সেখানে আরবরা বাস করে। সাইপ্রাসে তুমুল হাঙ্গামা হচ্ছে শুনে লেডি হার্ডিং নাকি বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলেছিলেন—খুবই দুঃখের কথা। জায়গাটা পর্যটকদের স্বর্গ, আর লোকগুলোর স্বাস্থ্য কী চমৎকার! প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানা থাকলেও বনেদী সাহেব তা প্রকাশ করতে চান না। কেউ বিদ্যা জাহির করতে চাইলে তিনি বরং রুষ্ট হন। এই সাহেবিয়ানার সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন জর্জ মিকেশ।

এক সান্ধ্য আসরে কথায় কথায় কে একজন আফ্রিকার উপকূল-বর্তী একটি দ্বীপের কথা পেড়েছেন। তাঁর এটুকু মনে আছে দ্বীপটি ট্যাঙ্গাইনাইকার কাছে, কিন্তু নামটি তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। গৃহকর্তী বললেন—আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই হ্যাভ নো আইডিয়া! ('আই অ্যাম অ্যাফরেড' ওঁদের আর এক কথা। সব ব্যাপারেই 'আই অ্যাম অ্যাফরেড'। স্বামী বাড়ি নেই। কেউ টেলিফোনে তাঁর খবর চাইছেন, স্ত্রী বলবেন—'আই অ্যাম অ্যাফরেড···!)—হয়তো ইভলিন জানতে পারে। ইভলিনের জন্ম ট্যাঙ্গাইনাইকায়। তবু তিনি মাথা নাড়বেন,—না, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সার্ রবার্ট—। সার্ রবার্ট সেই বিশেষ দ্বীপেই

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও আলোকসম্পাতে অক্ষম। তবে তাঁর ধারণা দ্বীপটির একটি নাম থাকা খুবই সম্ভব। একজন বেয়াড়া বিদেশী অধৈর্য হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন—জাঞ্জিবার, কিন্তু চারপাশের দৃষ্টিবাণ মাঝখানে থামিয়ে দিল তাঁকে। ভড়কে গিয়ে তিনি আমতা আমতা করে বললেন—চেকস্লোভাকিয়া নয় তো? আড্ডায় জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এক ভাইসপ্রেসিডেন্ট হাজির ছিলেন, তিনি বললেন—আমার ঠিক তা মনে হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এক জার্মান শ্রোতা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না,—ওই দ্বীপে নাম জাঞ্জিবার। আর যায় কোথা, সাহেব মেমদের মুখে থমথমে নীরবতা। তাঁদের মনের কথা—'ওয়ান্স এ জারমান, অলঅয়েজ এ জার্মান!'

তবু যে ওঁরা নিজেদের একান্ত আপন সমাজে কাউকে গ্রহণের আগে তাঁর স্কুল কলেজের খবরাখবর জানতে চাইতে পারেন তাঁর কারণ আর কিছু নয়, অভিযাত্রীর যাত্রাপথে আরও এক আধখানা বাধার প্রাচীর গড়ে তোলার চেষ্টা করা। বিকল্প অনেক নেই। ওঁদের ধ্যানের জগতে স্কুল আছে মাত্র দুইটি। এক—ইটন, দ্বিতীয় —হ্যারো। ইউনিভার্সিটিও দুইটি মাত্র, অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ। ব্রিটেনে এ-পর্যন্ত যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ছয় জনকে বাদ দিলে তাঁদের সবাই ইটনের ছেলে। এই দুই বিদ্যালয় আর দুই বিশ্ব-বিদ্যালয় অন্য দেশেও প্রধানমন্ত্রী সরবরাহ করেছে অনেক। জওহর-লাল কেম্ব্রিজের কোন্ কলেজটিতে পড়তেন গাইডদের তা মুখস্থ। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বাড়িতে তরুণ বন্দরনায়কের ছবি দেখিয়ে একালের তরুণ ইংরাজ জানতে চান—চিনতে পার? অক্সফোর্ডেই শুনেছি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে সমরভিল কলেজে তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। একবার ওসব বনেদী খাতায় নাম লেখাতে পারলে আত্মীয়তা পাকা। লর্ড হিউম (এই ভদ্রলোকের নামের বানানটি কিঞ্চিৎ গোলমেলে,—'এইচ ও-এম-ই',

কিন্তু উচ্চারণ 'হিউম'। ম্যাকমিলানের পর তিনি যখন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেন তখন বানানের এইসব গোলমাল শুনে এক ফরাসী সাংবাদিক নাকি সোজা লিখেছিলেন—'হাউম'।) তখন কমনওয়েলথ সচিব। পাকিস্তানের এক প্রধানমন্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তিনি নাকি বলেছিলেন—এঁর সম্পর্কে অধিক কী আর বলব, ইনি অক্সফোর্ডে নৌকো বেয়েছেন, এখনও নাকি স্নানের সময় গিলবার্ট অ্যাণ্ড সালিভান গেয়ে থাকেন,—হুইচ ইমিডিয়েটলি মেকস আস টেক হিম টু আওয়ার হার্টস! সুতরাং, বিদ্যা কিংবা বুদ্ধির জন্য না হলেও, ওই সব স্কুল কলেজের পুরানো টাই ব্যাজ এগুলো অবশ্যই সহায়ক। সহজে কুলীনদের হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়া যায়, কুলে ওঠা যায়।

তার পরও প্রয়োজন আছে টুকিটাকি নানা বস্তুর। যথাঃ সাচ্চা বড়মানুষের ধারণা—প্রত্যেক হবু বড়মানুষের অন্ততপক্ষে তুটি করে ঠিকানা থাকা আবশ্যক। একটি বাড়ি থাকবে শহরে, আর একটি 'দেশে', অর্থাৎ শহরের বাইরে। 'গ্রামের' বাড়িতে বাগান, খামার এসব থাকা বাঞ্ছনীয়। একালে অবশ্য টেলিফোনও থাকতে পারে, তবে সেটি যেন কিছুলেই কৃষ্ণবর্ণ ছাড়া আর কোনও রঙের না হয়। লাল-নীল টেলিফোন হঠাৎ নবাবদের জন্য।

বাড়িতে আরও কিছু কিছু জিনিষ অচল। যথা—আধুনিক চিত্রকলা, অত্যাধুনিক আসবাবপত্র, ডবল বেড, দরজায় 'ওয়েল কাম' লেখা পাপোশ, কাচের বাক্সে রঙীন মাছ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কুকুর বেড়াল অবশ্যই থাকতে পারে, তবে অ্যালসেসিয়ান নয়। বড় মানুষের সবচেয়ে আদারর কুকুর নাকি মনগ্রিল, বেড়াল থাকলে খেয়াল রাখা চাই সেগুলো যেন হয় পারস্য, কিংবা শ্যামদেশীয়।

গ্যারেজ এবং ওয়ার্ডরোব সম্পর্কেও সতর্কতা আবশ্যক। হবু কুলীনের গ্যারেজে হয় তু' একটি খুব দামী গাড়ি থাকবে, না-হয়

মিনি-কার। তাঁর কাছে মাঝামাঝি কোনও গাড়ির অস্তিত্ব নেই। তবে বড় গাড়ি হলে খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো যেন খুব নতুন না-হয়। চকচকে ঝকঝকে কোনও বস্তু ও-পাড়ায় চলে না। স্পোর্টসকারও অচল। ওটা যৌনতার প্রতীক। অচল দ্বিবর্ণ কিংবা বহুবর্ণ গাড়িও। ওসব ভুঁইফোড় বাবুদের জন্য। চালক রাখার সামর্থ থাকলে রাখা ভাল। তবে আজকাল কোন লর্ড নিজের গাড়ি নিজে চালালে কেউ অপরাধ নেন না। তাই বলে কোনও লেডি ইভিনিং ড্রেস পরে চালকের আসনে বসে আছেন সে দৃশ্য নাকি ভাবাও যায় না। মেয়েদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই নিয়ম।

পোষাক বিষয়েও নিয়মের কড়াকড়ি। জামা-প্যাণ্ট চমৎকার, কিন্তু জুতো জোড়া যাচ্ছেতাই,—এমন কাণ্ড দেখলে কুলীনেরা মনে মনে হেসে খুন হয়ে যাবেন। সব দিকে সমান নজর চাই। এ-পাড়ায় কার্লমার্ক্স যেমন অচল, তেমনই মার্ক্স অ্যাণ্ড স্পেন্সার। রেডিমেড জামা জুতো চলবে না। স্যাভিল রোর পাতলুন কোর্তা চাই। সেগুলো দামী কাপড় কেটে নামী ওস্তাগর তৈরী করবে বটে, কিন্তু কিছুতেই যেন দৃশ্যত নতুন বলে না ঠেকে। প্রকৃত বনেদী সাহেব নাকি দামী পোষাক চাপাবার আগে পকেটে ওজনদার লোষ্ট্র বোঝাই করে বৃষ্টিতে সেগুলো ঝুলিয়ে রাখেন। অনেকে নতুন পোষাক বছর দুয়েকের জন্য ভৃত্যদের হাতে ছেড়ে দেন। ওরা যদৃচ্ছ ব্যবহারে সেগুলোকে অভিজাত করে দিলে তবে প্রভু তা অঙ্গে ধারণ করেন। পোষাকের রঙও নির্দিষ্ট আছে। এমন কি মেয়েরাও এসব নিয়মের বহির্ভূত নন। খবরের কাগজে যে ফ্যাশনবতী সুন্দরীর ছবি ছাপা হয় বড়বাড়ির কোনও সাজুন্তি যদি তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন তবে ওপাড়ায় তিনি রুচিহীনা বলেই গণ্য হবেন। হাল ফ্যাশন থেকে কয় কদম পেছনে থাকাই কুলীন পাড়ায় নিয়ম। সুতরাং, টাইপিন, বিশালাকার কাফ্‌লিঙ্ক—ওসবের নাকি কদর কম। জুলপি এবং দাড়ি নিষিদ্ধ; গোঁফের

জনপ্রিয়তাও কমতির দিকে। বিশেষত, 'এস', 'জেড', 'এম'—ঢঙের গোঁফের।

পান ভোজন, অসুখ বিসুখ কিংবা ক্রীড়া নির্বাচন সর্ব ক্ষেত্রেই 'ইউ' আর 'নন-ইউ'-এর এলাকা সুনির্দিষ্ট। কলকাতার পথে পথে জিন্দাবাদ ধ্বনির মত লণ্ডনের পানশালাগুলোতে প্রতিনিয়ত হাঁক শোনা যায় 'চীয়ার্স'। ওটা নাকি 'নন-ইউ', কোনও বনেদী বাড়িতে শোনা যাবে না। ঠিক তেমনই ওঁদের বাড়ির টেবিলে খুঁজে পাওয়া যাবে না 'ফিস ফর্ক',—মাছ কাটার জন্য আলাদা ছুরি। চা তৈরী করতে গিয়ে পেয়ালায় আগে দুধ, পরে চা ঢাললেও নম্বর কাটা যাবে। 'এম-আই-এফ' অর্থাৎ 'মিল্ক ইন ফার্স্ট' অভ্যাসের জন্য এমন কি নাম পর্যন্ত কাটা যেতে পারে; বনেদীদের কাছে এঁরা 'নূ-উ' (Noou)—'নট ওয়ান অব আস!' অসুখবিসুখের মধ্যে বাত অর্শ ইত্যাদি এক সময় 'ইউ' ছিল, কেননা এসব দিয়ে একজন অশ্বারোহী পুরুষের মূর্তি গড়ে তোলা যেত। আজকাল নাকি বাত ইত্যাদি কৌলিন্য হারিয়েছে। কোনও ডাচেস যদি বলেন—আমার 'হাউস মেড নী' হয়েছে সেটা যেমন শুনতে খারাপ লাগে, তেমনই লর্ডের মুখে 'বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি' এই উক্তিও বেমানান। 'হার্ট-ডিজিস'-ও এড়াতে হবে। ওটা আমেরিকান ব্যবসায়ী এবং তাঁদের মোটা মাইনের কর্মচারী, যাঁদের বলা হয় ভাইস প্রেসিডেণ্ট,—তাঁদের ব্যাধি। বিলেতি লর্ডকে তার কবলে পড়লে চলবে না, তাঁর পক্ষে কাম্য বরং—'নার্ভাস ব্রেকডাউন।'

খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল কিছুতেই চলবে না। তার চেয়ে ঘরে খিল এঁটে চাবুক হাতে ন্যাংটো মেয়েদের পিটানো, কিংবা তার হাতের চাবুকের সামনে পিঠ মেলে ধরা অনেক ভাল। প্রকৃত বনেদী সাহেবের দৃষ্টিতে হকি এবং ক্রিকেটও খুব উঁচু দরের ক্রীড়া নয়। এম-সি-সি'র কার্ড অবশ্য পকেটে রাখেন তিনি, কিন্তু নিজে ব্যাট হাতে মাঠে নামেন কদাচিৎ। বাইচ খেলা, মোটর রেস, সাইকেল

রেস—এসব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বনেদী সাহেবের প্রিয় খেলা—মাছ ধরা, লন টেনিস, গলফ। প্রিয়তর—পোলো, নৌবিহার এবং ঘোড়দৌড়। প্রিয়তম—শৃগাল শিকার।

ইংরাজদের পশুপ্রেমের কাহিনী বিশ্ববিদিত। শিকারী হিসাবেও তাঁরা সর্বক্ষেত্রে বিবেচনাহীন নন। যে পাখি ডালে বসে আছে যথার্থ ইংরজে নাকি তাকে গুলি করেন না। ছিপে মাছ ধরতে ভালবাসেন অনেকে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই নাকি কোনও জ্যান্ত পোকা ধরে সেটিকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চান না। জীবনের প্রথম সামন মাছটি যে কোন ইংরাজের কাছে স্মরণীয়। তিনি সেটি খাবেন না, তার প্রাণহীন দেহটি সর্বপ্রযত্নে কাচের আলমারিতে রক্ষা করবেন। 'ট্রাউট-এর মরশুমে সারাদিন বিফলে গেলেও সন্ধ্যা হওয়া মাত্র তিনি ছিপ গুটিয়ে উঠে পড়বেন। কারণ, সন্ধ্যায় মাছেরা সহজে ধরা দেয়! কিন্তু সব ভদ্রতা বিসর্জিত খেঁক-শেয়ালের বেলায়। 'মহত্তম ইংরাজ'ও নাকি শৃগালের মত একটি অসহায় প্রাণীকে হত্যা করার জন্য পাগল। অশ্বমেধ যজ্ঞের মতই জটিল অনুষ্ঠান সে হত্যা পরব। বিচিত্র তার নিয়ম কানুন। বিচিত্রতর শিকারীর অস্ত্রসজ্জা। যে সাহেব ক্রিকেটের মাঠে বোলারকে প্যান্টে বল ঘসতে দেখলে মর্মাহত হন তিনিই সানন্দে মৃত শেয়ালকে বয়ে নিয়ে সদর্পে বাড়ি ফেরেন,—এটা সত্যই অবিশ্বাস্য। ডিউক অব নরফক-এর একুশ বর্ষীয়া কন্যা লেডি অ্যান জীবহত্যা বিরোধী, কিন্তু নিজে তিনি একজন পাকা শৃগাল-শিকারী। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—এই দুটো ব্যাপার কী করে এক সঙ্গে চলতে পারে। লেডি সাহেবার উত্তর: একটা স্পোর্টস, অন্যটা নিষ্ঠুরতা। যুক্তির অভাব নেই। প্রশ্ন মাটিতে পড়তে না-পড়তে উত্তর। যথা: সন্তানের জন্য মা কষ্ট করেন, মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন বিজ্ঞানী আর গবেষক, দেশের জন্য প্রাণ দেন সৈনিকের দল। ঠিক তেমনই ব্রিটেনের জন্তুদেরও উচিত এ দেশের মানুষকে সুস্থ

সবল এবং খুশী রাখবার জন্য মাঝে মাঝে যন্ত্রণা ভোগ করা। মৃত্যু তো প্রাণী মাত্রেরই নিয়তি। তাছাড়া শিকার শুধু আমোদ নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবিকার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। ব্রিটিশ-শৃগাল নিশ্চয়ই চায় না এদেশের মানুষ আর্থিক কষ্ট ভোগ করুক। আর একজন খেঁকশিয়াল শিকারী লিখেছেন—শেয়াল আছে বলেই শেয়াল-মারা। শেয়াল না থাকলে শেয়াল-মারার প্রশ্নই উঠত না। আর শেয়াল-মারা নামক পরব না থাকলে এদেশের মানুষ শান্তির সময় শীতকালে কী করত তাই ভাবি। আর একজন শিকারীর বক্তব্য—শৃগাল-শিকার এক অভিনব ক্রীড়া। এতে মানুষ, কুকুর, ঘোড়া এবং শেয়াল—সকলের সমান ভূমিকা। শেষ পর্যন্ত বেচারা শেয়াল মারা পড়ে এই যা। তবে সেও যে আনন্দের সঙ্গেই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর একজন শিকারীর উক্তিঃ শেয়ালেরা যদি শৃগাল-শিকার সংক্রান্ত বিতর্কের সব দিক শুনতে পেত, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তবে তারা এই প্রথা চালু রাখার পক্ষেই ভোট দিত! আর একজনের ঘোষণাঃ খেঁকশেয়ালদের যদি মেয়েদের মত ভোটের অধিকার থাকত তাহলে তারা অবশ্যই শেয়াল-শিকারের পক্ষে ভোট দিত! অন্য এক সাহেবের অভিমত—আই এম কনভিনসড দ্যাট ইফ এ ফক্স কুড ভোট, হি উড ভোট টোরি!

একটু ছিটগ্রস্ত হতে দোষ নেই। বরং তাতে মহিমা বাড়ে। ইংরাজ অদ্ভুত জাত। দুই দুইটি ইউরোপীয় দেশ যখন জার্মানীর হাতে চলে গেছে, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তখনও ছুটির দিনে প্রজাপতি ধরছেন! সেটা তাঁর 'হবি'—নেশা। এদেশে ভূতপূর্ব মন্ত্রীরা গলা ছেড়ে গান ধরেন—'ডেইজি, ডেইজি,' হাইকোর্টের বিচারপতি খেলনা রেলগাড়ি নিয়ে খেলতে বসেন। ইতিহাস সৃষ্টিকারী দেশনায়ককে ওঁরা বলেন—'জলি গুড ফেলো।' পাগলামির উদাহরণ প্রচুর। ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড যখন ফরেন সেক্রেটারি তখন তাঁর

গুণকীর্তন প্রসঙ্গে জানানো হয়েছিল, তিনি হাতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন এবং ওই অবস্থায় গাইতেও! ডিউক অব হ্যামিলটনের বৈশিষ্ট সম্পর্কে 'টাইমস' লিখেছিল—তিনি একমাত্র পীয়ার, যিনি পাঁচবার নিজের নাক ভেঙ্গেছেন। (কার যাত্রাভঙ্গ করতে ঈশ্বর জানেন!) বেডফোর্ডের এক ডিউকের আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় —'স্পাইডারস আই হ্যাভ নোন।' তাতে একটি মাকড়শার কাহিনী আছে, সে নাকি রোস্ট বীফ আর ইয়র্কশায়ার পুডিং ছাড়া আর কিছু খেত না! ব্লেনহেম-এর ডাচেস বলেন—ডিউকের প্রিয় খেলা ছাদের দিকে রাসপবেরি ছুঁড়ে দিয়ে হা মুখে তা লুফে নেওয়া।

প্রকৃত ছিটগ্রস্তে পরিণত হওয়ার আগে হবু-বড়মানুষ অবশ্য রাজনীতি নিয়েও মাঝে মধ্যে মুখ খুলবেন। কিন্তু সে সব সুভাষিতবলী যেন টোরিদের মতামতের পরিধির মধ্যেই থাকে। কী ধরণের কথাবার্তা তাঁর মুখে শোভা পাবে পূর্বসুরীদের বাণী-সংগ্রহ থেকে তার কিছু নমুনা শোনানো যেতে পারে। যথাঃ যুদ্ধে যদি বাজে-কাগজের সত্যই দরকার হয়ে থাকে, তবে আমার মনে হয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম অনায়াসে সে-অভাব মেটাতে পারে। ···শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া ঠিক নয়। ছুটি ওরা কাটাবে কী করে?···লোকে বলে দেশে বেকার ভরে গেছে। অথচ আমাকে সাতজন ভৃত্যেই সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে। কিছুতেই একজন পাচক পাচ্ছি না।···স্যোসালিস্টদের কিছুতেই ভোট দেওয়া ঠিক নয়। ওঁরা যে শুধু স্পীকারের বিরুদ্ধেই প্রার্থী দাঁড় করান তা-নয়, আমি সখেদে লক্ষ্য করছি নির্বাচনে ওরা ফরেন অ্যাফেয়ার্স টেনে আনতেও ইতস্তত করেন।···বেকার সমস্যা সমস্যার এক উপায়, যাঁরা বছরে দুই হাজার পাউণ্ড রোজগার করেন তাঁদের প্রত্যেক একজন করে বেকারকে দত্তক নিয়ে নিন। এর ফলে বেকারদের যাতে কোনও মনঃকষ্ট না হয় সেদিকেও অবশ্য নজর দিতে হবে। মাঝে তাদের মাঝে খুশীভরা চিঠি কিংবা গল্পের বই

পাঠাতে হবে।···মুসোলিনিকে নিন্দা করার কোনও মানে হয় না। মেয়ে-মানুষের দালাল, ব্ল্যাকমেইলার, আইসক্রিমভেণ্ডার আর গ্যাংস্টারদের নিয়ে জাতি গড়েছেন তিনি।···এসময়ে ভূতপূর্ব সামরিক ব্যক্তিদের উচিত এক সঙ্গে বসে মধ্যপ্রাচ্য এবং দূর প্রাচ্য নিয়ে ভাবা। কেননা, রাজনীতিকরা মিডল ইস্ট, ফার ইস্ট কেন, কোনও ইস্টই চেনে না, বোঝে না।···চার্চিলের স্মৃতি চিরকাল অম্লান রাখতে হলে উচিত হবে রানীর কোনও পুত্রের সঙ্গে সার উইনস্টনের কোনও ফিমেল গ্র্যাণ্ডডটার-এর বিয়ের ব্যবস্থা করা। রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে উনিও চিরকাল তাঁর প্রাপ্য সম্মান পেয়ে যাবেন।

হবু-বড়মানুষ লেবার নেতাদের কথা আদৌ যদি কখনও না তোলেন তবে খুব ভাল। একান্ত যদি তোলেন তবে সেই শ্রমিক নায়কের কথা বলুন যিনি ঘোড়ায় আসক্ত। একবার আর্ল হয়ে গেলে অবশ্য অন্য কথা। তখন লেবার সমর্থক হতেও দোষ নেই!

সতর্কতা সহ নিষ্ঠাভরে এগোলে শেষ পর্যন্ত জয় অনিবার্য। খেতাব জুটবেই। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড নাকি বলেছিলেন—আমি সম্মানের উৎস বটে, তাই বলে তো আর জলের কল হতে পারি না;—আই অ্যাম দি ফাউণ্ট অব অনার্স, বাট দ্যাট ডাজনট মিন আই অ্যাম এ ট্যাপ। তিনি খবরের কাগজের মালিকদের পীয়ার বানাতে চাননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও তাঁকে করতে হয়েছিল। সুতরাং, আর সব শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় উপলক্ষের অভাব হবে না, রাজসম্মান যোগ আসবেই। রাজসম্মান ব্রিটেনে এক অতুলনীয় বস্তু। অন্য দেশের লোকদের সাধ্য কী তার মর্ম বোঝে। ন্যান্সি মিডফোর্ড লিখেছেন—প্রজাতন্ত্রে অ্যারিস্টোক্রাসি হচ্ছে গলাকাটা মুরগির মত। সে দাপাদাপি করে ঠিকই, কিন্তু আসলে সে মৃত। ব্রিটেনে রানী যখন কাউকে সম্মানিত করেন তখন তিনি সত্যিই সম্মানিত। কারণ রাজতন্ত্র এখানে বাস্তব।

রানী যা দেন তার নগদ মূল্য বিস্তর। তখন নব্য-পীয়ারের কৃত্য থাকবে আর মাত্র একটিই, খ্যাতনামা কোনও চিত্রকরদের দিয়ে নিজের একটি তৈলচিত্র আঁকিয়ে নেওয়া। যদিও নিজের পয়সায় আঁকানো নিজের ছবি, তবু ছবি দেখে কোনও মন্তব্য না-করাই ভাল। পনের বছর আগে বিখ্যাত ইতালিয়ান শিল্পী অ্যানিগনিকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকিয়ে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রানী। পনের বছর পরে গত বছর (১৯৬৯) নতুন করে আবার আঁকিয়েছেন নিজেকে। আঁকার পর শিল্পীর প্রশ্ন—কেমন হল তাই বলুন। রানীর উত্তর—এবারকার বার্নিশ আরও ভাল হয়েছে! একালের শিল্পীরা স্বভাবতই লঘু-চিত্ত, তাঁরা কিছুই গোপন রাখতে পারেন না, সুতরাং, কোনও মন্তব্য না-করাই ভাল।

একদা যিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল অতঃপর তিনি মহামহিম লর্ড বাহাদুর। অ্যারিস্টোক্র্যাসির মূর্ত বিগ্রহ তিনি। তবু তাঁকে সাবধানে চলতে হবে। পথে তার পরও নাকি খানাখন্দ আছে। বিপদ ওই কাঞ্চন নিয়েই। অর্থ যেমন পরমার্থের স্বাদ দিতে পারে, তেমনই অনর্থও ঘটাতে পারে। বিশেষত কাঞ্চনের সঙ্গে কামিনীর যোগাযোগ কথা সর্বজন বিদিত। এবং লোকে বলে ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণী নাকি ওই কামিনী ব্যাপারে বিশ্বের তামাম অভিজাতদের থেকে একটু স্বতন্ত্র।

একজন ইউরোপীয় লেখক সাহেব-মেমদের যৌনজীবন লিখতে বসে একটি মাত্র বাক্যে নিজের যাবতীয় বক্তব্য বলে দিয়েছিলেন: কনটিনেনটাল পিপল হ্যাভ সেক্সলাইফ, দি ইংলিশ হ্যাভ হটওয়াটার বটলস! ইংরাজ পাঠক পাঠিকারা আপত্তি জানালে পরে তিনি এক সংশোধনী যোগ করেন,—এখন ওঁরা বৈদ্যুতিক কম্বলও ব্যবহার করছেন। ভবিষ্যতের ইংরাজ দম্পতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ওঁরা আরও বিজ্ঞানসম্মত পথের পথিক সাজবেন; ইংলণ্ডে তখন ঘরে ঘরে চালু হবে—এ-আই-ডি বা 'এড'-প্রক্রিয়া। 'এড' মানে—

আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন বা ডোনারস! লেখক অবশ্য এ কথা স্বীকার করেছেন তখন দু'চার জন নিশ্চয়ই থাকবেন যাঁরা গর্ব করে বলবেন আমরা 'ডু ইট ইওর সেলফ' পন্থায়ই বিশ্বাসী!

অনেকের ধারণা এসব রসিকতার বাস্তব ভিত্তি আছে, সাহেব মেমরা বোধহয় সত্যিই অন্যদের মত নয়। 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার'-এ জিমি বলেছিল, 'উই গেট আওয়ার কুকিং ফ্রম প্যারিস (দ্যাট ইজ এ লাফ), আওয়ার পলিটিক্স ফ্রম মস্কো, অ্যাণ্ড আওয়ার মরালস ফ্রম পোর্টসৈয়দ!' কথাটা বোধহয় সত্য নয়। অন্তত শেষোক্ত ব্যাপারে। অস্বীকার করার উপায় নেই, এখনও খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে এমন খবর বের হয় যা কৌতূহলীদের সন্দিহান করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। 'নিউ স্টেটসম্যান'-এর 'দিস ইংল্যাণ্ড' নামক ঝাঁপি থেকে দু' একটি সাহেবি অভিমত পড়ে শোনাই। এক সাহেব অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে লিখছেন—পরম করুণাময় ঈশ্বর যিনি সর্বকর্মের নিয়ন্তা তিনি মানব সৃষ্টির জন্য এমন একটি কুরুচি-পূর্ণ বিরক্তিকর উপায় নির্দেশ করেছেন কেন তা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না! আর একজন জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির দাম্পত্য-জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—অন্যথায় তাঁর দাম্পত্যজীবন খুবই সুখের ছিল, শুধু স্বামী স্ত্রী কোনদিন একসঙ্গে বাস করেন নি, এই যা। এ-জাতীয় নমুনা আরও অনেক শোনানো যেতে পারে। মেজর টমসন তাঁর প্রথমা স্ত্রী উরসুলা সম্পর্কে লিখেছেন, আমার সঙ্গে ঘর করতে আসার আগে ওকে তার মা বলেছিলেন—আই নো, মাই ডিয়ার···ইট ইজ ডিজগাস্টিং! সুতরাং আমি এডোয়ার্ডের সঙ্গে যা করেছি তুমিও তা-ই করো,—জাস্ট ক্লোজ ইওর আইজ অ্যাণ্ড থিংক অব ইংল্যাণ্ড!

বলা নিষ্প্রয়োজন, তারপরও একথা মেনে নেওয়ার কোনও কারণ নেই সাহেব মেমরা সব নিরাসক্ত যোগী আর যোগিনী। এক সাহেব সরাসরি বলে দিয়েছেন,—যে যাই ভাবুক, আমরা জানি

আমরা কী। ইউরোপের অন্য জাতি আমাদের কমন মার্কেট থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু যৌন জীবনের আনন্দ থেকে নয়।

তাই বলে কি ইংরাজদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে অন্যদের কোনও পার্থক্য নেই? আলবৎ আছে। তা শুধু প্রকাশ ভঙ্গীতে। অন্যত্র নরনারীর জীবন যেমন, ব্রিটেনের ঠিক তেমনই;- এঁরা কথা বলেন কম, তফাৎ শুধু এটুকুই। ফ্রান্সে কোনও সাংবাদিক কিংবা লেখকের সঙ্গে কোনও অভিনেত্রীর প্রণয় ঘটলে নায়ক সে আনন্দ-সংবাদ চাররিকে রটিয়ে বেড়ান। এসম্পর্কে একটি গল্পও চালু আছে। অনুরাগ পর্বের অনিশ্চয়তা শেষ। খ্যাতনামা অভিনেত্রীকে বিজয় সম্পূর্ণ। গর্বিত নায়ক গায়ে কোট চাপিয়ে তখুনি চলল বাইরে।—সবিস্ময়ে নায়িকার জিজ্ঞাসা—'হোয়াই দি হারি ডার্লিং?' —বাঃ, কাফেতে বন্ধুরা বসে আছে যে, তাদের গিয়ে বলতে হবে না! নিমেষে বেরিয়ে গেলেন বীরপুরুষ।

ব্রিটেনে, বিশেষ করে ব্রিটেনের বনেদী পাড়ায় এ-বীরত্ব দেখাবার কোনও সুযোগ নেই। এসব ব্যাপার একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত, গোপনীয়। যদি কোনও পুরুষ এভাবে বাহাদুরিত্ব প্রকাশ করতে চান তবে তিনি চিহ্নিত হবেন—বিশ্বাসঘাতক। তাছাড়া চিত্রতারকা কিংবা নর্তকীর সঙ্গে প্রণয়ে ওদেশে কোনও নীলরক্তধারীর সম্মান বিন্দুমাত্র বাড়ে না। সুতরাং গোপনীয়তা বাঞ্ছনীয়। সেটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও জরুরী। এমন ইংরাজ মহিলার কথাও শোনা গিয়েছে যিনি সাফল্যের সঙ্গে যুগপৎ দুই দুইজন সুখ্যাত পুরুষকে ভালবাসা বিলিয়ে গেছেন। দু'জনেই তাঁর বাড়ি ভাড়ার টাকা গুনেছেন, দু'জনেই উইলে সন্তানের জন্য সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। নিপুণিকা তবু জীবৎকালে ধরা পড়েন। তিনি গর্ব করে নিজের ক্ষমতার কথাও জাহির করতে চাননি। প্রসঙ্গত সেকালের রক্ষিতা কুল-তিলক হ্যারিয়েট উইলসনের কথা স্মরণীয়। সে তার জীবন কথা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলে অসংখ্য প্রেমিকের মধ্যে

এক ডিউক অব ওয়েলিংটন বলেছিলেন—পাবলিশ অ্যাণ্ড বি ড্যামড। সেটাই আজও সার কথা। যে মেয়ে নিজেকে জাহির করতে যাবে সে আরও নীচে নেমে যাবে মাত্র।

খেতাবধারীরা মেয়েদের টেনে নীচে নামাতে চান না, তাঁদের স্পর্শে পথের মেয়ে রাতারাতি ডাচেস বনে যেতে পারে। ওঁরা নিজেদের সে ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। বেডফোর্ডের একজন ভূতপূর্ব ডিউক আপন প্রাসাদে একটি 'ডিউকস করিডর' যোগ করেছিলেন। স্থপতি মাথা চুলকে বললেন—তা হলে একটা 'ডাচেস করিডর' থাকাও বোধহয় সঙ্গত। গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন ডিউক ;—'বাট, মাই ডিয়ার, দি ডাচেস ডো'ণ্ট বিলং টু দি ফ্যামেলি।'

তবু বনেদীপাড়ায় কড়াকড়ি নিয়ম, স্ত্রীর কর্তব্য স্ত্রীকে পালন করতে হবে, স্বামীর কর্তব্য স্বামীকে। পরস্ত্রী কিংবা পরপুরুষ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ সম্পর্কে বড়মানুষদের মনোভঙ্গী স্বভাবতই একটু সেকেলে। অন্তত অবশিষ্ট ইউরোপের তুলনায়। ফ্রান্সে কোনও স্ত্রীর তার স্বামীকে প্রতারণা করলে প্রতারিত স্বামী সকলের কাছে হাসির পাত্র বলে গণ্য হন। সবাই তাঁকে নিয়ে রসিকতা করে। ব্রিটেনে ঠিক তার উল্টো। প্রতারিকার স্বামী সেখানে সকলের সহানুভূতির পাত্র। অবিশ্বস্ত স্ত্রী নিন্দিত, ধিকৃত। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। ফ্রান্সে কোনও পুরুষ এ-জাতীয় অপরাধ করলে সকলে হয়তো বাহাবা দেবে, কিন্তু বনেদী ইংরাজ বিড়বিড় করে বলবে—অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়,—ইট ইজ নট ক্রিকেট! পরকীয়া কাণ্ড কারখানা অবশ্যই চলে, কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করা চলে না। বাহাদুরি দেখাতে গেলে পতন অনিবার্য। পতন অনিবার্য নিয়ম ভঙ্গ করতে গিয়ে ধরা পড়লেও। স্মরণীয় প্রফুমোকীলার উপাখ্যান। '৬৩ সনের সেই কেলেঙ্কারির সময় শ্রমিক দলের এম-পি রেজিন্যাণ্ড প্যাগেট বলেছিলেন—কীলারের মত রূপসীর মন জয় করতে

পেরেছেন প্রফুমো,—সত্যই তিনি লাকি, ভাগ্যবান। কান পাতলে সেদিন হয়তো এ-কথার প্রতিধ্বনি হয়তো শোনা যেত অনেকের মনেই; কিন্তু প্রফুমোকে তবু নেমে আসতে হয়েছিল। কারণ তিনি হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য।

এত কাণ্ড করে সাধারণ মানুষ লর্ড সোঅ্যাণ্ডসো কিংবা লর্ড দিসঅ্যাণ্ডছাট হতে চান না। তাঁদের কাছে এর চেয়ে ঢের সহজ মনে হয় নিখরচায় অভিজাত হওয়া। অর্থাৎ সাধারণ থেকে যাওয়া। অভিজাতদের যেমন আভিজাত্য আছে, তেমনই এক ধরণের আভিজাত্য আছে সাধারণ মানুষেরও। সকলেই আপন মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ। সকলেরই শিরদাঁড়া সোজা। তা নাইবা থাক সকলের পকেটে সমান টাকা!

ফারাক এখানেই। সর্বশ্রেণীতে, সর্বস্তরে এই মর্যাদাবোধটুকু বাদ দিলে ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কোনও তফাৎ নেই। ওঁরাও আমাদের মত। কেউ ওঁদের 'মহান দেশের' 'মহান সমাজের' প্রশংসা করলে ওঁরা গর্ব বোধ করেন, 'মহান ঐতিহ্য' 'মহান কীর্তির' উল্লেখ করলে আনন্দিত হন, কিন্তু অধিকাংশেরই নিজেদের জীবনে কোনও মহান লক্ষ্য নেই।

সকলেই চান ধরণীর এক কোনে আপন মনে কোন মতে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে। ছোট্ট একটি বাড়ি, ছোট্ট একটি গাড়ি, ছোট্ট একটি বউ, ছোট্ট একটি কুকুর, ছোটখাটো সুখদুঃখ,—এসব মামুলি সাধ আহ্লাদ ঘিরেই সাধারণ ইংরাজের স্বপ্ন। বাজারে জিনিষ-পত্তরের দাম বাড়লে ওঁরা চিন্তিত হন, নিজের প্রিয় টীম অন্য কারও কাছে হেরে গেলে দুঃখিত হন, মাইনে বাড়লে আনন্দিত। কোনও কারণে ইয়র্কশায়ারের কোন গ্রামে অশান্তি দেখা দিলে ওঁরা গালে হাত দিয়ে ভাবেন, ইয়র্কশায়ারেই যদি অশান্তি, তবে দুনিয়ার কোথায় আর শান্তি রইল!

ইংরাজের মনের ফর্দে ওই যে ছোট্ট কুকুরটির কথা বলা হয়েছে ওটি অতিশয় গুরুতর। সুতরাং, এ সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। নয়ত শুধু ওই প্রাণীটির প্রতি নয়, সমগ্র ইংরাজজাতির প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে। তার আগে সাহেবিয়ানার আর কয়টি লক্ষণ প্রসঙ্গ।

নানা ব্যাপারেই ইংরাজদের খ্যাতি। যথাঃ ওঁদের আবহাওয়া সংক্রান্ত কথোপকথন, ওঁদের 'কিউ', ওঁদেব নিয়মনিষ্ঠা তথা আইনপ্রীতি—ইত্যাদি।

আবহাওয়া বিষয়ক আলোচনায় ইংরাজরা এখনও নিঃসন্দেহে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান। আবহাওয়া যেদিন ভাল সেদিন আলোচ্য বিষয়—ভাল আবহাওয়া, আবহাওয়া যেদিন খারাপ সেদিন আলোচ্য—খারাপ আবহাওয়া। ব্রিটেনে আরও অনেক ধরণের আবহাওয়া আছে—বাদলা আবহাওয়া, মেঘলা আবহাওয়া, ঝড়ো আবহাওয়া, যাচ্ছেতাই আবহাওয়া, অবিশ্বাস্য আবহাওয়া, চমৎকার আবহাওয়া. ফুটফুটে আবহাওয়া, সুন্দর আবহাওয়া, বিগত দিনের আবহাওয়া, আগামী দিনের আবহাওয়া—আরও কত কী! প্রতি কথায় চলতি আবহাওয়ার বর্ণনার পরেই জিজ্ঞাসা'—'ইজ নট ইট?' অন্য দেশে বলার যখন আর কোনও কথা নেই তখনই লোকে আবহাওয়ার

কথা পাড়েন, কোন রকমে আলোচনা চালু রাখতে চান। ব্রিটেনে উলটো। শত কাজের কথা থাকলেও থেকে থেকে উঁকি দেবে আবহাওয়া। বিরক্ত হয়ে কে যেন একজন মন্তব্য করেছিলেন—ইংরাজদের যাতে আলোচ্য বস্তু খুঁজে বেড়াতে না হয় সম্ভবত সে জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই আবহাওয়া। সে বিলেতী হাওয়া বোধহয় এদেশেও পৌঁছেচে। গরমের সময় এদেশেও আজকাল প্রায়ই শুনতে হয়—বড্ড গরম পড়েছে,—তাই না? বৃষ্টির দিনে শুনতে হয়—বিচ্ছিরি বিষ্টি হচ্ছে,—তাই না?

সেদিক থেকে বিবেচনা করলে 'কিউ'ও আজ আর আমাদের অচেনা নয়। নার্সিংহোম-হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, মায় শ্মশান—'লাইন লাগানো' আজ আমাদের কাছেও নিত্যকর্মের অন্তর্গত। এ-ব্যাপারে ইংরাজ ভদ্রলোকের বৈশিষ্ট্য এই, বাসের জন্য যখন তিনি একা দাঁড়িয়ে তখন ও তিনি একাই লাইন লাগান। অফিস-টাইমে অবশ্য ওদেশেও কখনও কখনও লাইন গোলমাল হয়ে যায়, কিন্তু পেছন থেকে যে-লোকটি তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে আগে উঠে গেল তার মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় নিজের বাহাদুরির জন্য সে বিন্দুমাত্র গর্বিত নয়, বরং কিঞ্চিৎ লজ্জিত। এ বিচ্যুতি ক্ষমার্হ। ছুটির দিনে বেড়াতে বের হয়ে মেয়ের আইসক্রিম, নিজের সিগারেট, বউয়ের ডেক চেয়ার সংগ্রহের জন্য যাঁকে কমপক্ষে পনের বার 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় তাঁর পক্ষে হঠাৎ এক আধদিন নিয়মভঙ্গ অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'কিউ'-পাগল ইংরাজ অনেক সময় অন্যভাবে সে-ত্রুটি স্খালনের চেষ্টাও করেন। রাস্তা অবরোধের দায়ে ম্যানচেস্টারে একবার এক কলাওয়ালাকে পুলিস থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, দেখা গেল খদ্দেরের 'কিউ' তার পিছু পিছু চলেছে!

'কিউ'-ভক্ত ইংরাজ আইন-ভক্তও বটে। ইংরাজদের ভদ্রতার চরম দৃষ্টান্ত ফনটেনয়-এর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড হে-র উক্তি।

শত্রু ফরাসীদের সম্বোধন করে তিনি নাকি বলেছিলেন—'ফায়ার দি ফার্স্ট শট!' হোক না যুদ্ধক্ষেত্র, ইংরাজবাহিনী প্রথমগুলি ছুঁড়বে না। ইংরাজের 'আণ্ডার স্টেটমেন্ট' বা নীচু-গলায় কথা বলার উৎকৃষ্ট নমুনা: বোমা পড়ে বাড়ি বিধ্বস্ত; ইংরাজ ভদ্রলোক তবু বলবেন—'উই হ্যাড এ বিট অব এ পিকনিক্ লাস্ট নাইট!' ঝড়ো-হাওয়া ডেক থেকে উড়িয়ে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় ছুঁড়ে দিলেও ডুবে যাওয়ার আগের মুহূর্তে ইংরাজ ভদ্রসন্তান বলেন—'রাদার উইনডি, ইজ নট্ ইট!' ইংরাজের আইন-নিষ্ঠার এমনই এক তুলনাহীন নমুনা দেখেছিলাম ম্যানচেস্টারে। পার্কে একটিও রেলিং নেই, কিন্তু গেট তালাবদ্ধ। ঘটনাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সঙ্গী ইংরাজ-সাংবাদিক বললেন—ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারছ?—তেমন কিছু নয়। চারদিক খোলা বটে, কিন্তু এই তালাটি বলছে—পার্ক-বন্ধ! আমরা অতিশয় আইন-নিষ্ঠ জাতি কি না,—এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

আইননিষ্ঠার এমনই আরও অনেক নমুনা শুনেছি ক্রমে ক্রমে। এক ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গেছেন। কবরের স্মৃতিফলকে তিনি এই কথা কয়টি লেখাতে চান—'আওয়ার লস, হেভেনস গেন!' গোরস্থান কর্তৃপক্ষ জানালেন—এ বাক্য চলবে না, কেননা, মর্তে কোনও মানুষের মৃত্যু হলে স্বর্গের তাতে লাভ হয় না লোকসান—এ-বিষয়ে কেউ কি সঠিক কিছু বলতে পারেন? আর একবার সমুদ্রতীরবর্তী হোটেল মালিকেরা স্থির করেন তাঁরা বি. বি. সি'র বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কারণ, বি. বি. সি অনেক সময় এমন আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রচার করে যা 'ডিস্কা-রেজিং',—আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আইনে ইংরাজের মন আছে বই কি!

কাগজে পড়ছিলাম এক ভদ্রমহিলা অভিযোগ করেছেন—স্বামী তাঁকে খেতে পরতে দেন বটে, কিন্তু হাতে নগদ পয়সা

দেন না। ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে বললেন—তা আর কী করা যাবে বলুন, আইন অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর কাছে নগদ পয়সা চাইতে পারেন না। স্ত্রী বললেন—তার মানে, ইচ্ছে করলে তিনি ওই পয়সা অন্য স্ত্রীলোকের জন্য খরচ করতে পারেন? ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তর—'দ্যাট ইজ দি ল।' এহেন আইন এবং আইন নির্ভর লোকেদের জন্য নাগরিকদের ভাবনার অন্ত নেই। যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক-আউটে সলিসিটারদের যে-ক্ষতি হচ্ছে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক ইংরাজ লিখেছিলেন—যুদ্ধের আগে ওঁরা বিস্তর রোজগার করতেন, এখন দিন চলে না। ব্ল্যাক আউটের জন্য ডিভোর্স কমে গেছে।—'অ্যাডলটারি' প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে কে কাকে সনাক্ত করে!

আইন ছাড়াও আছে লিখিত অলিখিত নানা নিয়ম। বলা নিষ্প্রয়োজন, কখনও কখনও সেগুলো রীতিমত হাস্যকর। তা সত্ত্বেও নিয়ম—নিয়ম। যথা: ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যান বা ফিল্ডসম্যান চোট পেলেও অকুস্থলে হাত বুলাতে পারবেন না।…খাদ্য দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন—আজ থেকে চাল এবং চালজাত দ্রব্যাদির দাম আরও কমল। তবে আমরা দুঃখিত, এ-সপ্তাহেও দোকানে চাল পাওয়া যাবে না।…ওল্ড বেইলি'র আদালতের রায়ে 'লেডি চ্যাটারলি' মুক্তি পেয়েছেন আজ অনেক দিন। তারপর চার অক্ষরের সেই নিষিদ্ধ শব্দটি হামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে গল্পে উপন্যাসে। এমন কি মহিলাদের কলমে পর্যন্ত। কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশিনারির পাতায় এখনও সেই শব্দটি অনুপস্থিত। অক্সফোর্ড অভিধানের তরফ থেকে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছিল জানেন?—আদালতের রায়ের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। উই ডুনট টেক ইনটু একাউন্ট এনিথিং বাট কমন ইউসেজ! (We don't take into account anything but common usage)! বলা নিষ্প্রয়োজন, ওই বিশেষ শব্দটি মুখে মুখে চালু আছে শত শত বছর ধরে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ওই বিশেষ শব্দটি মুখে মুখে চালু আছে শত শত বছর ধরে। এ-জাতীয় গোঁড়ামি কিংবা পাগলামির দৃষ্টান্ত হয়তো সবদেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু পশু-প্রেমিক ইংরাজ সত্যই বিশ্বে তুলনাহীন। ঘরে ঘরে পশু, পাখি। দুই কোটিরও বেশী ইংরাজ নরনারী কোন না কোন মনুষ্যতর প্রাণী প্রতিপালন করেন। দেশে আদুরে কুকুর আছে কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ, বেড়াল—আরও পঞ্চাশ লক্ষ। তৎসহ আরও নানা জীবজন্তু, এমন কি বেবুন পর্যন্ত। 'লাভ মি, লাভ মাই ডগ'—কোনও বাড়াবাড়ি কথা নয়, ব্রিটেনে মানবিক ভালবাসা আর পশুপ্রেম যেন একই কথা! রানী ভিক্টোরিয়া নাকি বলতেন—যে সভ্যতায় মুক এবং অসহায় প্রাণীদের ঠাঁই নেই, সে সভ্যতা অসম্পুর্ণ। সে মানদণ্ডে ব্রিটেন আজ, বলা চলে—অতি সভ্য। টেনিসন এক ভদ্রমহিলাকে বলেছিলেন—স্বামী যদি তোমাকে তাঁর কুকুরটির চেয়ে বেশী ভালবাসেন তবে জানবে তুমি পরম ভাগ্যবতী! আজকাল নবীনা জননীরা কেউ কেউ নিজের সন্তানকে আপন বুকের দুধে লালন করছেন। তাই দেখে এক সাহেবের উক্তি—তাজ্জব কি বাত্! এদেশের মেয়েরা তো জানতাম চিরকাল কুকুর-বেড়ালের বাচ্চাকেই মানুষ করে! ব্রিটেনে সত্য সত্যই অনেক সময় মানুষের চেয়ে জন্তুর খাতির বেশী। রয়াল সোসাইটি ফর দি প্রিভেনসান অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল-এর বার্ষিক বাজেট ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার! শিশুদের রক্ষার জন্য যে জাতীয় সোসাইটি তার বার্ষিক বাজেট এর চেয়ে ঢের কম। খবরের কাগজে পড়ছিলাম—ইস্ট ইসলিংটন-এর 'মাদারস অ্যাণ্ড বেবিজ ওয়েলফেয়ার সেণ্টার'-এর তহবিলে চাঁদা পড়েছে—৪৯ পাউণ্ড ১০ শিলিং ৮ পেনি, আর কোনও এক ছোট্ট শহরে 'পিপলস ডিসপেনসারি ফর অ্যানিম্যালস অব দি পুওর'-এর তহবিলে চাঁদা মিলেছে—১১৮১২ পাউণ্ড!

ব্রিটেনের আর-এস-পি-সি-এ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। ১৮২৪ সনে

রিচার্ড মার্টিন নামে এক পশুপ্রেমিকের উদ্যোগে যে সংস্থার পত্তন আজ দেশের সর্বত্র তার শাখা প্রশাখা। সাকুল্যে তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। পার্লামেণ্টেও তাদের বিলক্ষণ প্রভাব। জ্যান্ত খরগোসের উপর জ্যান্ত কুকুর লেলিয়ে দিলে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়, কুকুরের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা না-করে কেউ যদি নতুন ডিজাইনের কোনও কোট কুকুরের জন্য বাজারে ছাড়তে চান তবে দেশময় হল্লা শুরু হয়ে যায়। রুশা-কুকুর লাইকাকে নিয়ে যে কান্নাকাটি সেটা মোটেই লোক দেখানো নয়, ব্রিটেনে জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন এর চেয়েও অনেক বেশী আজব কাণ্ড ঘটে। কিছু নমুনা শোনানো যেতে পারে।

চার্চিল নাকি তাঁর মনের গোপন কথাবার্তা বলতেন তাঁর প্রিয় কুকুরের কাছে। একজন পত্রলেখক জানাচ্ছেন—আমার একটি বুলটেরিয়ার আছে। একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই শতকরা ৯৯ ভাগ চেনাজানা মানুষের সঙ্গে আমার যতখানি মিল তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী মিল এই কুকুরটির সঙ্গে। একজন নাটক-লেখিকা রীতিমত নাটকীয় ভাষায় জানাচ্ছেন—বস্তুত এই নাটকটি আমি আর আমার কুকুর দু'জনে মিলে লেখা। জিমি যখন সমর্থনসূচক ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করত তখন আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হতাম যে, কাহিনী সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আর একজন লিখছেন—আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি একটু সময় করে বসে বসে কুকুরের লেজ নাড়িয়ে দিলে সে খুব হাসিখুশি থাকে! আর একজনের বক্তব্য: আমার কুকুরটি যাকে বলে নিখুঁত ভদ্রলোক, না বলে দিলেও সে দিব্যি বুঝতে পারে কে মান্য অতিথি, আর কে অতিথির ভৃত্য মাত্র। অতিথিদের প্রতি তার সে কী নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার। সাউথ ডেভন-এ এক হোটেলে বিজ্ঞপ্তি: কুকুরের জন্য দেয় দৈনিক ১ শিলিং অথবা ১ শিলিং ৬ পেনি। পার্থক্য নির্ভর করবে কুকুরের আকার প্রকার এবং সামাজিক মর্যাদার

ওপর। আর কুকুরের মর্যাদা? একটা কাহিনী বলি। ট্রেন চলেছে লণ্ডন থেকে ম্যানচেষ্টার-এর দিকে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। করিডর-বোঝাই যাত্রী। সচরাচর এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। কোনমতে উঠা গেল। উঠে অবাক। করিডরে ভিড় বটে, কিন্তু কামরাগুলো প্রায় ফাঁকা। ব্যাপার কী? ভেতরে উঁকি দেওয়া মাত্র স্পষ্ট হয়ে গেল বিষয়টা। গাড়িতে কুকুর। হ্যাঁ, মানুষের আসনে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন একাধিক সারমেয়; পাশে মনুষ্য দেহধারী তস্য সহচর কিংবা সহচরী। এক ফরাসী ভদ্রমহিলা আর পারলেন না। কামরায় ঢুকে পড়লেন। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে ইংরাজ যাত্রিনীকে বললেন—ম্যাডাম, আপনার এই কুকুরটির পাশে ফাঁকা জায়গাটুকুতে আমি বসতে পারি কি? অন্য পক্ষ ততোধিক মোলায়েম ভাষায় উত্তর দিলেন—পামেলা হ্যাজ হার টিকিট, ম্যাডাম! —অবশ্যই। কিন্তু একখানা টিকিট নিশ্চয়ই। বললেন ফরাসী মহিলা। মেমসাহেবের সগর্ব উত্তর—নো, ফর দি এণ্টায়ার সাইড! তারপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পরে শুনেছি এই ঘটনা নিয়ে ফরাসী মহিলা খবরের কাগজে লেখালেখি করেছিলেন। রেলকর্তৃপক্ষ বিদেশিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখেছিলেন—পামেলা দেশের বিখ্যাত কুক্কুরী। সেই জন্যই তাকে বিশেষ খাতির দেখানো হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, সঙ্গিনী ভদ্রমহিলার উচিত ছিল—ওর নীচে একখানা কম্বল পেতে দেওয়া!

কুকুর আর কুকুর। একজন পরদেশী লেখকের উক্তি: ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ যেন মানুষের দেশ নয়, 'ডগ্‌স কিংডম অন ম্যান্‌স আর্থ,' মানুষের পৃথিবীতে কুকুরের রাজ্য। বলেছিলেন—জীব-জন্তুদের যদি কোনও পোপ থাকতেন, তবে তাঁর ভ্যাটিকান হত ব্রিটেন! এমন কুকুর-পাগল জাতি সত্যিই ভাবা যায় না। কুকুরের জন্য রকমারি পোষাক, খাদ্য, ফ্যাশন-প্যারেড, দৌড় প্রতিযোগিতা,—এমন কি কুকুরের জন্য 'চেস্টিটি বেল্ট' পর্যন্ত!

কুকুরের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চিন্তায় উদ্ভাবিত ওই যন্ত্রটির দাম ২৪ শিলিং ১১ পেনি। ছয়টি সাইজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন—'ম্যাক্সিমাম অ্যাংজাইটি!' মানুষের কবরের জন্য স্থানাভাব—, কোথায় যেন পড়েছিলাম, আজকাল প্রতি সাত জনের জন্য তিন জন ইংরাজকেই সমাধিস্থ করার বদলে দাহ করা হয়,—অথচ কুকুরের জন্য চমৎকার সব কবরখানা। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রদর্শনীতে কুকুরের খাদ্য পাঠায়, বি. বি. সি কুকুরকে দিয়েই কুকুর সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে-অনুষ্ঠানের নাম—'কলিং অল্ ডগ্স।—বাই ডগ্স, ফর ডগ্স।'

সমান খাতির বেড়ালের। সুদূর কেনিয়ায় মারা গিয়েছিল একটি বেড়ালছানা। বিমানে তার দেহ বয়ে নিয়ে আসা হয় ব্রিটেনে। কারণ, ন্যাশন্যাল সেভিংস-এর পোস্টারে যে বিখ্যাত বেড়ালটির ছবি ছাপা হয়েছিল এ-বেড়াল তারই পুত্র। তাকে 'স্বদেশের' মাটিতে কবর দেওয়াই শোভন ও সঙ্গত। শুধু কুকুর বেড়াল নয়, সব ধরণের প্রাণী নিয়েই সাহেবরা যেন সর্বক্ষণ অতিশয় ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন। এক ভদ্রলোকের মোটর সাইকেলের সীটের তলায় রবিন পাখি বাসা বেঁধেছে, সুতরাং প্রতিদিন বারো মাইল হেঁটে তিনি অফিস যাতায়াত করছেন। আর এক ভদ্রলোক জানাচ্ছেন—তিনি আর তাঁর পত্নী লণ্ডন এবং আশপাশের সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছেন—বৃহত্তর লণ্ডন এলাকায় পাখির সংখ্যা বাইশ লক্ষ। ভদ্রলোক সেখানেই থামেন নি। তিনি হিসাবটা বুঝিয়েও দিয়েছেন; চড়ুই—১৫৫৮৯৯৩টি, বন্য পায়রা—২৩০০৩৬টি এবং পায়রা—৩২০৪০টি···। আর একবার হঠাৎ কে একজন টেলিফোনে জানালেন—একটি পায়রা আর একটি পায়রাকে আক্রমণ করেছে। ঘটনাটা ঘটছে রয়াল এক্সচেঞ্জের ছাদে। এক্ষুনি একটা কিছু বিহিত করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে দমকলের লোকেরা এসে হাজির। ষাট ফুট মই খাটিয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে

পৌঁছে দেখলেন পায়রা দুটি লড়াইয়ে মত্ত নয়, আসলে ভালবাসায় মগ্ন! এসব নাটুকে ব্যাপার হামেশা ঘটে। সেবার নাইরোবি থেকে একটি শামুক কী করে যেন বিমানে চেপে এসে হাজির হলেন লণ্ডনে। বিমান বন্দরে তাই নিয়ে হৈ চৈ। শামুকটি তখনও জ্যান্ত। সুতরাং, শুরু হল বিশেষজ্ঞদের দৌড়াদৌড়ি। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল সে আর-এস-পি-সি-এ'র হস্টেলে!

এ-জাতীয় কিছু কিছু পাগলামি বাদ দিলে সাহেব-মেমরা আমাদেরই মত। কখনও কখনও ওরা আবার আমাদেরই মত, নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। একদল সাহেব-মেম কিছুদিন আন্দোলন চালিয়েছিলেন—পরীক্ষাগারে প্রাণী হত্যা চলবে না। তার বদলে গবেষণাগারে ব্যবহার করা হোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের। অনেকটা আমাদের দেশের ইঁদুর-বাঁদর নিয়ে কান্নাকাটির মত ব্যাপার। আর একবার কাগজে পড়ছিলাম প্লিমালথ-এর শহর কর্তৃপক্ষ অবিবাহিতা জননীদের 'হোম'-এর জন্য আর বছরে একশ' পাউণ্ড করে খরচ করবেন না। ওই অর্থ তাঁরা এবার থেকে খরচ করবেন শহরে কুকুর-বেড়ালদের জন্য যে আশ্রম আছে তার বাবদে।

মানুষকে বঞ্চিত করে পিঁজরাপোল-এ টাকা ঢেলে দানবীর আখ্যালাভের নমুনা এই গরিব দেশেও বোধ হয় দুর্লভ নয়।
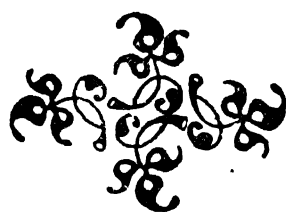
'তোমাদের আগে ভালবাসা পরে বিবাহ ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকার শাস্ত্রে।

প্রমথ চৌধুরী-পড়া বঙ্গ সন্তান। অতএব প্রথম প্রথম মনে হতো বোধ হয় ওঁর কথাই ঠিক। ওরা ওদের মত, আমরা আমাদের মত। সাহেবদের সঙ্গে কোন মিল নেই আমাদের। মিল নেই 'শাড়িপরা এলোচুল আমাদের মেমদের' সঙ্গে ওদের মেমদের। তফাৎ শুধু চর্মে নয়, মর্মে-মর্মে। তোমরা তোমরা, আমরা আমরা। ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট।

কিন্তু দিন যত এগোয় ফারাকও যেন ক্রমেই কমে। ফর্সা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে আসে, কালো কেমন যেন শ্যামলা ঠেকে। কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবধানই নেই। রইল না। হয়ত দোষটা আমার চোখের। আমার কানের। তবু না বলে পারছি না, ওসব বানানো কথা। ওদের সঙ্গে সত্যিই আমাদের কোন পার্থক্য নেই।—সাহেবদের স্বভাব চরিত্র একেবারে আমাদের মত। 'কালা আর শাদা বাহিরে কেবল···'।

জানি, সাহেবদের মধ্যেও প্রমথ চৌধুরী আছেন। কিপলিং উত্তরাধিকারীহীন নন। অনেক সাহেব হয়ত আপত্তি করবেন, কিছু কিছু মেমও। একজন তো অবশ্যই। তিনি একটি খবরের কাগজে কাজ করেন। বয়স চল্লিশের ওপর। সুতরাং রোমান্টিসিজমের অপবাদ দেওয়ার বিশেষ সুবিধে নেই। বলেছিলেন—সিদ্ধান্ত আমার সব দেখে-শুনেই। দেখে-শুনেই বলছি—তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তারপর তিনি যে ইংরাজী বাক্যগুলো বলেছিলেন বাংলায় বললে তার অর্থ—আমরা তোমাদের পায়ের নখের যুগ্যিও নই। এঁকেও নিরস্ত করা দরকার। সুতরাং,এ উপাখ্যান দু'তরফের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। আমরাই বলব, আমরাই শুনব তা হয় না। তোমরাও শোন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা থাক। সেগুলো মোটা ব্যাপার। আপাতত মিহি বিষয়েই কথা হোক।

তোমাদের নাকি আগে প্রণয়, পরে বিবাহ। উত্তম কথা। বিবাহ প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তার আগে প্রণয় প্রকরণ একবার খতিয়ে দেখা যাক।

তোমার শহরের পথে পথে জোড়ায়-জোড়ায় ঘুরে বেড়াও। বাসস্ট্যাণ্ডে যুগল মূর্তি হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক। বাসের পর বাস চলে যায়, তবু নড় না। পার্কে তোমরা আরও ঘনিষ্ঠ। ঘনিষ্ঠ আণ্ডার-গ্রাউণ্ডেও। এক এক সময় টিউব-এর কামরাগুলোকে মনে হয় নোয়ার-তরী। সবাই জোড়ায় জোড়ায়। সিনেমা ঘরে তোমরা কখনও কখনও এক সীটে দু'জন বস। ব্রাইটনের সমুদ্র-সৈকতে, ছুটির দিনে মার্গেট কিংবা ডোভায়-এও তোমাদের দেখেছি, দেখেছি সন্ধ্যার কফি-বারে, রাত্রির ক্লাব ঘরে। হাতে হাত, গালে গাল, ঠোঁটে ঠোঁট। কিন্তু এতে কি কিছু প্রমাণ হলো?

কিছুই প্রমাণ হল না বোধহয়। সত্য, আমাদের কফি-বার নেই, আমাদের মধ্যবিত্তের ক্লাব নেই। কিন্তু আমাদের পথে,

আমাদের মাঠে, আমাদের সিনেমা ঘরে—এ দৃশ্য অনায়াসে তোমরা দেখে যেতে পার। আমাদের টিউব নেই, কিন্তু ট্যাক্সি আছে। ঘরের কোণে সমুদ্র নেই, লেক আছে। বলতে পার, ব্যবধান পরিমাণগত। অবশ্য। কিন্তু গুণগত ব্যবধান শূন্য। কেননা, আমি নিজের চোখে দেখেছি—বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ইংরেজ তাঁর পাশের দৃশ্যটাকে অনুমোদন করতে পারছেন না। বাসে গুছিয়ে বসার পরও তাঁর আপত্তি কাটছে না; বিড়বিড় করে বলছিলেন—নির্লজ্জ! নির্লজ্জ! অন্যদিকে তরুণ-তরুণীর উক্তি—অদ্ভুত দেশ আমাদের, নির্জনতা নেই। এই দুটি অভিযোগই, সবিনয়ে বলি, আমরা এতদ্দেশেও শুনি?

তারপর প্রণয়ের দ্বিতীয় পাঠ। আমাদের বিবাহের পর প্রণয়—এ কথা ষোল আনা সত্য নয়। বিবাহের পরেও নিশ্চয় অনেকের প্রণয় হয় না। ঠিক তেমনই, নিশ্চিত জানি প্রণয় হলেই তোমাদের বিবাহ হয় না। উদ্যোগের অন্ত নেই। মাস্টার মশাইরা চোখ রাখেন। চোখ রাখেন দিদিমণিরাও। এমন কি দূর থেকে সরকারও। ছেলে মেয়েরা আজকাল কম বয়সেই সাবালক সাবালিকা হয়ে উঠছে। সুতরাং শিক্ষা-দপ্তরের নির্দেশ—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ আচার-আচরণ সব দিকে নজর রাখা চাই। ওদের নিছক ছেলেমানুষ না ভেবে ভাববে—ইয়ং অ্যাডাল্ট! ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভালবাসা হলে তাকে 'কাফ্‌লাভ' বলে তাচ্ছিল্য করবে না, এমন ভাবে চলতে সাহায্য করবে যাতে অন্তে বিয়ে হয়।

যে-সব স্কুলে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়ে না সে-সব স্কুলের পরিচালকেরা মাঝে মাঝে অন্য স্কুলের সঙ্গে পরামর্শ করে যৌথ পার্টির বন্দোবস্ত করেন। কখনও পিকনিক, কখনও বা অন্য কোন প্রোগ্রাম। ছেলেরা আর মেয়েরা একসঙ্গে মিলিত হয়, হৈ-হুল্লোড় করে।

স্কুলে আমাদের এত সুযোগ নেই। কলেজে আছে। তোমাদের মত এমন অখণ্ড স্বাধীনতা হয়ত নেই, কিছু কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু ফলাফল সেই এক। কিছু ছেলে মেয়ে মনের পাতায় 'ইতিহাস' সঞ্চয় করে, কিছু ডানা পোড়ায়, কিছু গোল্লায় যায়, যৎসামান্য বিয়ে করে। আগস্ট মাসে ব্যাঙ্ক হলিডে উপলক্ষে হোটেলে হোটেলে তরুণ তরুণীর সে কি ভিড়। যেখানেই যাওয়া যাক, ঠাঁই নেই। হোটেলওয়ালারা জানেন 'ম্যান অ্যাণ্ড ওয়াইফ' সেজে যাঁরা ঘর দখল করেছে তাদের শতকরা আশীভাগই মেকি স্বামী-স্ত্রী। সাক্ষী—কাছাকাছি গহনার দোকানগুলো। সেখানে মাত্র ছয় পেনির বিনিময়ে লভ্য বাহারি 'ওয়েডিং রিং'—স্ত্রী সেজে হোটেলে ঢোকার টিকিট। একজন দোকানী বলছিল—খদ্দেরের মুখ দেখেই বুঝতে পারি, কোন নববধূ নকল, কে—আসল। এ সময়ে আংটির বিক্রি দশগুণ বেড়ে যায়, কিন্তু সে তুলনায় গির্জা নাকি প্রায় ফাঁকা।

বলেছি, কিছু গোল্লায় যায়। এই গোল্লায় যাওয়াটা কিঞ্চিৎ বিশদ করা প্রয়োজন। ১৯৫৬ সনের একটি রিপোর্টে পড়ছিলাম: যে-সব মেয়ের বয়স পনের থেকে আঠারো তাদের ৫০ জনের মধ্যে একজন সতের পূর্ণ হওয়ার আগেই মা হয়। প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে একজন বিবাহপূর্ব সম্পর্কের কথা বলে। প্রতি কুড়িটি নবজাতকের মধ্যে একজন 'অবৈধ'। প্রতি আট জনের মধ্যে একজন তা-ই হত যদি না তার আগেই বাপ-মা বিয়ে করে ফেলত। প্রতি ছয় জনের মধ্যে একটি শিশু মায়ের বিয়ের আগেই গর্ভস্থ হয়। গর্ভপাত আইন শিথিল হওয়ার পর সাম্প্রতিক (১৯৭০) সংবাদ—এক বছরে একমাত্র সরকারী হাসপাতালেই প্রায় ৪০ হাজার নারী গর্ভপাত করিয়েছেন। আগে তার জন্য কালোবাজারে ঘোরাঘুরি করতে হত, কিংবা হাতুড়ের শরণাপন্ন হতে হত। বিত্তবানের বান্ধবী

কিংবা ঘরণী অবশ্য পালিয়ে যেতেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে এসব সমস্যার মীমাংসা সহজ! অবশেষে তোমরাও ফরেন এক্সেঞ্জের মূল্য বুঝেছ বটে! নব্য-আইনে কত বাঁচল।

আমরা অঙ্ক এত ভাল জানি না। আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে হালের শান্তিলাল শাহ কমিটি, সকলে এক বাক্যে বলেন—এ জাতীয় দুর্ঘটনা এতদ্দেশেও ঘটে। সুতরাং, এ-সব নিয়ে তোমাদের গর্ব অশোভন।

আরও অশোভন, কারণ সাক্ষীরা আমাকে যা বলেছেন সে-সব কথা হুবহু আমাদের কথারই প্রতিধ্বনি যেন। একজন সমাজ-সেবক বলেন—স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা নাকি যৌন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে চায় না। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়—'ফানি!' নয়ত 'ডার্টি।' ভাষা প্রয়োগে আমাদের ছেলেরা অন্তত, নিশ্চয় অনেক বেশি বাহাদুর! দ্বিতীয়ত, যে মেয়ে খুব 'ফরোয়ার্ড' কিংবা অতিশয় 'প্রগ্রেসিভ' সে বান্ধবদের সমাদর লাভ করে বটে, কিন্তু আড়ালে সকলে তাকে ঘৃণা করে। পরিচিত মহলে তার পক্ষে বর পাওয়া দুষ্কর। এই 'ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড' কি আমাদের অপরিচিত? তৃতীয়ত, শুনেছি তোমাদের দেশের মেয়েরা অভদ্র ছেলেদের আদৌ পছন্দ করে না। অতি ভদ্রদেরও খাতির নাকি অতিশয় কম। আমাদের মেয়েদের মনের কথাটিও তাই নয় কি?

সুতরাং, তোমরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ, আর আমাদের এখানে অন্তহীন খরা চলেছে—এ-সব সংবাদ, অতঃপর মেনে নেওয়া ভাল—ঝুটা। সেক্সপীয়রের জুলিওর বয়স ছিল চৌদ্দ, কালিদাসের শকুন্তলার বয়সও চৌদ্দ। এই দুটি মেয়ে জানাতে কিছু বাকি রাখেনি। মা'রা তবু মানেন না। আমাদের দেশে যদি জোর করে ফ্রক-স্কার্ট চাপাবার চেষ্টা, তোমাদের দেশে তবে 'পিগটেল' 'পনিটেল' জুড়ে দিয়ে সোমত্ত মেয়েকে নাবালিকা বানাবার

প্রয়াস। বাবারা তোমাদের দেশে উদাস। আমাদের দেশেও। তোমাদের ছেলেরা প্রত্যেকে রোজগার করে। শুনেছি, গড়ে সব তরুণ সপ্তাহে তিন পাউণ্ড (তেষট্টি টাকা) উড়াতে পারে। ১৯৬০ সনে বারো থেকে চব্বিশ বছরের ছেলেরা নাকি প্রতিদিন গড়ে তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড উড়িয়েছিল। বাবারা আপত্তি করেন না, বলেন—এ বয়স তো জীবনে একবারই আসে! লেট দেম এনজয় দেমসেলভ হোয়াইল দে ক্যান! আমাদের বাবারা অবশ্য অন্য ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু পকেট বাঁচাতে পারেন না। তোমাদের খুকির ভরসা মা, আমাদের ভরসাও—মা।

বিয়ে অবশ্য হয়। তোমাদের দেশে হয়। আমাদের দেশেও হয়। তোমাদের বিয়ে মানেই যে প্রেমের বিয়ে নয় লণ্ডনের তিরিশটি জমজমাটি প্রজাপতি অফিস তার প্রমাণ। আর আমাদের বিয়ে যে সব ঘটকের অধ্যবসায় ফল নয়, তার প্রমাণ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার-এর অফিসগুলো। কখনও কখনও তোমাদেরও মনে হয় দেশে মেয়ে বড় কম। বাউল নামে একটি গ্রাম। সেখানে দু'শ পাত্র আছে, পাত্রী মাত্র দু'জন। নর্থ গ্রীমস্টন-এ একশ চল্লিশ তরুণ, বিবাহযোগ্যা তরুণী মাত্র একটি। মাঝে মাঝে অতএব তোমাদেরও স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়। আমরা হামেশাই তা করি। মাঝে মাঝে তোমাদের মনে হয় চারিদিকে মেয়ে বড় বেশি, কিন্তু বৌ করে ঘরে আনার মত মেয়ে বড্ড কম। রবিবার সকালে পাত্র-পাত্রী সমাচার যাঁরা পড়েন তাঁদেরও একই অভিমত। লণ্ডনের একটি প্রজাপতি অফিসে বসে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল—শহুরে বাবুরা গাঁয়ের মেয়ে পছন্দ করেন। শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী হবে বটে, তবে বেশি বুদ্ধিমতী দরকার নেই, দরকার গেরস্থ মেয়ে। 'গৃহকর্মে নিপুণা' আমাদেরও পছন্দ। —মেয়েরা কী চায়? অফিসের অধিকর্ত্রী ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—সিকিউরিটি। অর্থাৎ স্থায়ী চাকুরি,

কিংবা জোতজমা। শুধু ফটো নয়, বিলাতী প্রজাপতি অফিসে বংশাবলীও দরকার হয়। বড়ঘরের মেয়ে পাড়ার বেকার ছোকরার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কালিঘাটে বিয়ে করে। ওদেশেও লর্ডের মেয়ে বাস কণ্ডাক্টার-এর সঙ্গে গ্রেটনাগ্রীনে পালিয়ে যায়। রাজকুমারী মালা দিয়েছে ফটোগ্রাফারের গলায়। কিন্তু শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, সমান ঘরেই বর অথবা কনে খোঁজে। ঢাকার ছেলে ঢাকার মেয়ে পেলে যেমন খুশী, পশ্চিমবঙ্গীয় রাঢ়ী যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী পেলে—তেমন খুশী ইয়র্কশায়ারের মেয়ে ইয়র্কশায়ারেই ঘর পেলে! অতএব, তোমাদের মধ্যে জাতিপাঁতির বিচার আমাদেরই মত। অন্তত সমাজবিদরা তা-ই বলেন। পাড়ার নাচঘরে চারজনের মধ্যে একজন কনে নাকি বর খুঁজে পায়, চারি দম্পতির মধ্যে তিনজোড়ারই পিত্রালয়ের দূরত্ব বড়জোর আধমাইল। তবে হ্যাঁ, এই প্রণয়-বিবাহ পরবে এক জায়গায় আমরা তোমাদের কাছে হার মেনেছি। সে প্রেমপত্র রচনায়।

এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেমের চিঠি লিখে দেওয়া কারও পেশা হতে পারে তা আমরা ভাবতেও পারি না। অথচ ইংল্যাণ্ডে পার্কার এণ্ড ব্রেইনব্রিজ দিব্যি তা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যের হয়ে এক আধখানা চিঠি যে আমরাও না-লিখি তা নয়। কিন্তু তার জন্যে কেউ তিরিশ শিলিং ফী দেয় না। বড় জোর এক কাপ চা কিংবা কফি!

বিয়েতে তোমাদের যৌতুক লাগে না। কিন্তু বিস্তর পাউণ্ড শিলিং লাগে। আমি 'ইকনমিস্ট'-এর পাতায় পড়েছি বছরে গড়ে ওই ছোট্ট দেশে বিয়ে উপলক্ষ্যে খরচ হয় কমপক্ষে ৩০০ থেকে ৪০০ লক্ষ পাউণ্ড। পোষাক, গয়না, ফুল, খাওয়া-দাওয়া, ট্যাক্সি ভাড়া—খরচের খাতাগুলো আমাদের দেশেরই মত। টিনটার্ন অ্যাবির পাশে ছোট্ট একটি রেস্তোঁরা। হঠাৎ সেখানে এসে

হাজির মস্ত এক বরযাত্রী দল। সঙ্গী ইংরাজ বন্ধু বললেন—ওই যে দেখছ সব জমকালো পোষাক, সব ভাড়া করা। মনে পড়ল ভাড়া নয়, ধার করা কোট নিয়ে আমিও একবার বরযাত্রী সেজেছিলাম।

ইচ্ছে করলেই রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করতে পার তোমরা। কিন্তু কর না। প্রতি চারটি বিয়ের মধ্যেই তিনটি বিয়ে হয়ে থাকে চার্চে। চার্চের স্বাদ নাকি অন্য রকম, একজন বলেছিলেন —বড্ড রোমান্টিক লাগে। আমাদের শানাই, শামিয়ানার নেশার মতই তোমাদের চার্চের নেশা। তাছাড়া শুনেছি সেটা সংস্কারও। অতি-আধুনিক মেয়েরও মনে মনে বাসনা ওই শাদা গাউনটি,—লাল চেলির মায়ার মত। আমাদের বিয়েতে আজকাল হিন্দি সুর বাজে, তোমাদের বিয়েতেও 'পপ্' গান নাকি এসে গেছে। বুড়ো পাদ্রী আপত্তি করেন, কিন্তু সব সময় ঠেকাতে পারেন না। তোমাদের রুচি পালটাচ্ছে। আমাদেরও।

বিয়ের পর ঘর-সংসার। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তোমাদের দেশে ধনীদের মধ্যে ডিভোর্স বেশী, সম্ভবত আমাদের দেশেও। তোমাদের দেশে ছেলেরা বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেশী মেয়েরা। আমাদের দেশেও বোধহয় পরিস্থিতি একই। বিষ খাব, গলায় দড়ি দেবো—এ জাতীয় হুমকি এদেশেও প্রাত্যহিক। বিয়ে সব সময় তোমাদের কাছে সুখের হয় না। সম্ভবত আমাদের এদিকেও না। অ-সুখের কারণগুলো তোমাদের মেয়েরা বলে—স্বামী স্বার্থপর, অলস, সহানুভূতিহীন ; তাছাড়া ধরে নিয়েছে স্ত্রী তো আছেই। ছেলেদের তরফে কারণ—ঘ্যানঘ্যানানি, ত্রুটিধরা, বদমেজাজ এবং গুজবপ্রিয়তা। তলিয়ে দেখলে আমাদের সাংসারিক অশান্তির মূলেও এসব তথ্যই পাওয়া যাবে বোধহয়। তোমাদের মেয়েরা চায় স্বামী হবে সহানুভূতিশীল,

দায়িত্বশীল, বাধ্য, সচ্চরিত্র, উদার এবং প্রেমিক। আমাদের মেয়েরাও সম্ভবত তা-ই চায়। তোমাদের মধ্যে চলতি কথা, টাকা যদি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় ভালবাসা তবে সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে উধাও। আমাদেও একই অবস্থা। তোমাদের ছেলেরা চায় স্ত্রী হবে সতী-সাধ্বী, গৃহকর্মে নিপুণা, হাসিখুশি, স্বাস্থ্যবতী। আমাদের ছেলেরাও নিশ্চয় কুটিলা-জটিলা প্রার্থনা করে না।

চাইলেই পাওয়া যায় না। তোমাদের মেয়েদের কাগজগুলো অনবরত স্বামী পালন পদ্ধতি শেখাচ্ছে, সবাই তবু শিখল কই? মেয়েদের একটি কাগজে দেখছিলাম এক স্বামী লিখছেন—আমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে আমি কিছু গোলাপের পাপড়ি এনে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম বিছানায়। আমার রোমান্টিক স্ত্রীর মন্তব্য: হোয়াট এ মেস! এ ভাবে পয়সা নষ্ট করার কোন মানে হয় না!

তোমাদের মেয়েরা অদ্ভুত। অদ্ভুত আমাদের মেয়েরাও। আমরা তাই বলি—দেবা ন জানন্তি। অদ্ভুত তোমাদের পুরুষেরাও। তরুণ-তরুণীদের কথা স্বতন্ত্র। এমনিতে কোন সাহেবকে দেখলে মনেই হয় না—সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে। মেয়েদের প্রতি যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। টিউবে সামনেই হয়ত বসে আছে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। কিন্তু খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলবে না সাহেব। ভীষণ লাজুক তোমরা। খবরের কাগজের অফিসে শুনেছি অধিকাংশ পুরুষ রিপোর্টার নাকি লিখতে বসে নায়িকার পোশাকের বর্ণনার জায়গাটায় আটকে যায়। পাকা দু' ঘণ্টা ইণ্টারভিউ, তবুও ওরা কিছুতেই মনে করতে পারে না ভদ্রমহিলার স্কার্টটির রং কী ছিল, গলায় কিছু ছিল কি না! এর চরম প্রকাশ দেখিয়েছিলেন নাকি এক ইংরাজ স্বামী। পাশপোর্টের ফর্ম লিখতে বসে তিনি আটকে গেলেন, স্ত্রীর চোখের রঙ লিখতে হবে: —তাইত, কলম থামিয়ে ভদ্রলোক তাকালেন স্ত্রীর চোখের দিকে। সেই প্রথম শুভদৃষ্টি। অথচ চব্বিশ বছর ধরে এই মহিলার

সঙ্গে ঘর করছেন নাকি তিনি। তারপরও নাকি স্বামীকে উড়ু-উড়ু মনে হলেই ইংরেজ স্ত্রী প্রথমেই দোকানে গিয়ে চুলের স্টাইল পালটে আসেন,—বেচারা!

তোমাদের পুরুষদের চোখ লাজুক। লাজুক হাতও। কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া আর শিশু—এই চারিটি প্রাণী ছাড়া ইংরাজ নাকি সহজভাবে কাউকে স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি পোশাকে হাত ঠেকাতেও ভয়ে তার বুক দুরু দুরু। মেয়েদের কিছু কিছু পোশাক কোন কোন পুরুষ কিছুতেই দোকানে গিয়ে কিনতে পারে না। লজ্জায় নাকি গলা দিয়ে স্বর বের হয় না।

আমাদের পুরুষরাও তাই। প্রত্যেকে এক একজন মূর্তিমান লজ্জা। তাকাতে ভয়, ছুঁতে ভয়। শুচিবাইগ্রস্তের মত পথে চলি আমরা, মেয়েদের ছায়া মাড়ালেও যেন পাপ। অথচ তোমরা জান, আমরাও জানি,—আমরা আসলে বকধার্মিক মাত্র। লণ্ডনের বিশাল পাতালপুরীটি বাঁচিয়ে রেখেছে কারা? কারা বাঁচিয়ে রেখেছে অন্ধকার কলকাতার আমোদ-মহল গুলো? স্ট্রীপটিজ ক্লাবে বস্ত্রহীন দেহের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে তোমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি মিনি-মিনি-স্কার্ট পরে কেউ ক্রিকেটের মাঠে এলেই। আমাদেরও তা-ই। আড়ালে এদেশে সবই চলে।

তোমরা যদি পাপী, পাপী তবে আমরাও। তোমরা তাপী। আমরাও তাপী। শুনেছি, কোন ইংরেজ নিজেকে চিরতরে ভাসিয়ে দিতে চায় না। দুষ্কর্মের জন্য তোমরা এখনও লজ্জিত বোধ কর। আমরাও তা-ই করি। তোমরা 'স্কেপগোট' বা 'বুধো' খোঁজ,—আমরাও তাই খুঁজি। তোমরা বলতে চাও দোষ মেয়েদের। নয়ত ওরাই কেবল 'ফলেন' হবে কেন? আমরাও বলি 'পতিতা'। মিল শুধু এখানেই নয়, অন্যত্রও। তোমরা এত কাণ্ড করেও দাম্পত্য জীবন নিয়ে গৌরবান্বিত। আমরাও। তোমাদের লোকসঙ্গীতে বিরহ নেই। আমাদেরও নেই বললেই চলে। তোমাদের সমাজে

রক্ষিতারা সনাতন। কিন্তু সাহিত্যে তারা প্রায় অনুপস্থিত। আমাদের সাহিত্যেও কদাচ তাদের দেখা মেলে। দশম বিবাহ বার্ষিকীতে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাই না বটে, কিন্তু দশকের পর দশক নিঃশব্দে ঘর করি। তোমাদের মতই আমরা ঘর ভালবাসি। এত দুঃখের মধ্যেও তোমরা জীবনের দিকে তাকাও মে মাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, ডিসেম্বরের নয়; আমরাও আলোর দিকেই তাকাতে চাই।

এসো, আমরা অন্ধকারকে ভুলে যাই।

সাহেবরা আজ এমন কি সমান উৎসাহী শ্যালিকাদের সম্পর্কে।

ব্যাপারটা একটু বিশদ করা দরকার। আমি তখন বার্মিংহামে একটা কাগজে কাজ করি। অর্থাৎ প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে আড্ডা দিই। সেদিনকার মত কাজ আমার পাঠক-পাঠিকাদের চিঠিপত্র বাছাই করা। ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ হাত পড়ল একখানা চিঠি। জনৈক ভদ্রমহিলা লিখেছেন—যাকে বলে 'নিউজ সেন্স' বা সংবাদজ্ঞান তা আমার আছে কি না জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা অবিচার করেছ। কোন ব্যারণ যখন তাঁর শ্যালিকাকে বিয়ে করেন তখন কি চার ছত্রে ব্যাপারটা চুকিয়ে দেওয়া ঠিক? আমার তো মনে হয় তোমাদের উচিত ছিল অন্তত আধ-কলম জায়গা এই ঘটনা উপলক্ষে ব্যয় করা। বিশেষত, পাত্র এবং পাত্রী দু'জনেই

যখন সদ্বংশীয়। —ইত্যাদি। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মশাইকে চিঠিটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম—যাবে ?

—আলবৎ। উত্তর দিলেন তিনি। —মনে রাখবে কুকুর কিংবা বিড়ালের মতই এ-কাগজে শ্যালিকা-সংবাদ 'অবশ্য'।

কেন, সে-রহস্য ভেদ করতে হলে একটু পেছনে তাকানো দরকার।

'শ্যালকী,—লিকা,—লী স্ত্রী [শ্যালক + স্ত্রী
ঈ, আ (ঙীপ্, টাপ) ; শ্যাল + স্ত্রী ঈ]
পত্নীর ভগিনী ; শালী।'.........

অভিধান অনুযায়ী শ্যালিকা মানে সোজা কথায় 'শালী,' অর্থাৎ স্ত্রীর বোন। অবশ্য সম্পর্কে স্ত্রীর কোনও 'তুতো' বোনও নয়, এমন মেয়ের ভাগ্যেও কখনও কখনও এই সম্বোধনটি জুটে থাকে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ শালীনতা বর্জিত আচরণ। 'শালী' তখন নেহাৎই গালি ; যথা : 'দেই গালি বলে শালী, কোথা পালি চোরে : হেদে বুড়ি শালী।' ভারতচন্দ্রের এই 'শালীকা'কে নিয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। মেয়েটিই যে সত্যি সত্যিই ছিল কবির স্ত্রীর আপন বোন।

চতুরা, মধুরা সেই সব শালিনীরা যে সংখ্যায় একজনই ছিলেন এমন কথা কেউ বলবেন না। ('বৃহৎসংহিতা' অনুযায়ী 'শালিনী' মানে সুন্দরী। এবং তারা সকলেই যে 'শালাবতী, বা গৃহস্বামিনী নন সে কথা বলাই বাহুল্য, বিস্তর সমৃদ্ধ-শালিনী নিশ্চয় এখনও অবিবাহিতা।)। সংখ্যায় আজ যদি তারা অগুন্তি, তবে সেদিনও তাই। আর কেবলই কি মাথাগুন্তিতে ? প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি শালিবাহনের কথা জানি না, এদিককার নগর গঞ্জের কাহিনী কিছুটা অনুমান করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' গল্পের শ্যালিকাদের কথা স্মরণ করুন। রায়বাহাদুর পুর্ণেন্দুশেখরের পুত্র নবেন্দুশেখরের রাজভক্তি বিন্দুমাত্র

কম ছিল না। তবু যে শেষ পর্যন্ত সব গোলমাল হয়ে গেল সে শুধু শ্যালিকাদের জন্যই। পরিস্থিতিটা অনুমেয়। 'শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুই জোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল ; এবং তাহার সম্মুখে ফুল চন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, 'তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করো, তাহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক !'

ঘটনার বিবরণ এখানেই শেষ নয়। তারপরও রকমারি লাঞ্ছনা। মজার ব্যাপার এই নবেন্দু কিন্তু তবু শ্যালিকাদের বিরুদ্ধে পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাঠান নি। কারণটা স্পষ্ট। 'নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না ; বিশেষত বড়ো শ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি ; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।'

শ্যালিকা লাবণ্য কী করে রাজভক্ত নবেন্দুকে কংগ্রেস ভক্তে পরিণত করে বোনকে 'রায়বাহাদুরণী' হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল সে-কাহিনী এখানে অবান্তর। আমাদের বক্তব্য শুধু এই, শালীদের হেলাফেলা করবেন না। সাহেবরাও তা করে না। কেন না, তারা যে শুধু সুহাসিনী সুমধুর-ভাষিণী তাই নয়, দেখা গেছে অন্তত জামাইবাবুদের জীবনে রীতিমত প্রভাবশালিনীও বটে। বস্তুত বলশালী, ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ইত্যাদি শব্দে তাদের উপস্থিতি থেকেই আঁচ করা যায় শালাকে অবহেলা করলেও শালীদের এড়িয়ে চলা দায়। বলতে গেলে আমাদের জীবনে

শালীদের প্রভাব নিয়ে রীতিমত একটা গবেষণামূলক বই লিখে ফেলা যায়। 'বাঙালী জীবনে রমণী' স্টাইলে নাম হতে পারে তার 'বাঙালী জীবনে শালী'। সে কেতাবে অনায়াসে প্রমাণ করে দেওয়া যায়—স্ত্রীরা স্ত্রী বলেই কিছু নন, শালীরা শালী বলেই অনেক কিছু। তা না হলে কি আর রূপচাঁদপক্ষী সাধে লিখেছেন—'বাপের বেটি মুড়কি পায় না, শালীর মণ্ডা রোজ।'

কোন কোন শ্যালিকার এই মণ্ডা অবশ্যই প্রাপ্য। ভারতচন্দ্রের যে শ্যালিকাটির কথা উল্লেখ করেছি তাঁর কাহিনীটি স্মরণীয়। ভারতচন্দ্র গৃহত্যাগী হয়েছেন। জীবনে বৈরাগ্য এসেছে তাঁর। গেরুয়া ধরেছেন। সংকল্প করেছেন অন্যান্য বৈষ্ণব-সঙ্গীদের সঙ্গে তিনিও বৃন্দাবন যাত্রা করবেন। হঠাৎ বিভ্রাট। একজন চরিতকারের রচনা থেকে ঘটনার বিবরণ তা পড়ে শোনাচ্ছি।

'শ্রীক্ষেত্র থেকে যাত্রা করে প্রথমে তাঁরা হুগলি জেলার খানাকুল, কৃষ্ণনগরে এসে উপস্থিত হলেন। এই খানাকুল গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালিকার বাড়ি। তাঁরা খবর পেয়ে ভারতচন্দ্রকে পাকড়ে নিয়ে গেলেন। নাপিত ডেকে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে গেরুয়া ছাড়িয়ে সন্ন্যাসীকে সংসারী সাজালেন।'

এ শ্যালিকা যদি পরিবর্তে ভাল রেস্টুরেণ্টে চিংড়ি কাটলেট খেতে চায় তবে কি তাকে না করা চলে? মাগ্যি গণ্ডার দিনে শ্যালিকার ভাগ্যে নিত্য মণ্ডা জুটত কেন, রূপচাঁদপক্ষী সে রহস্য ভেদের চেষ্টা করলেন কই?

সমস্যাটা মণ্ডা মিঠাই, সিনেমার টিকিট কিংবা কারি-কাটলেট নিয়ে নয়, সেবার যে-কাণ্ডটা হল তা রীতিমত একটা অসামাজিক অশালীন ব্যাপার। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবি অবশ্য বলেছেন—কী আর করা যাবে,—'শালী যদি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি।' কিন্তু ইংরাজদের ধর্ম্মমঙ্গলের নাকি এসব কৈফিয়ত অচল!

ব্যাপারটা ঘটেছিল বৃটেনে। ঘটেছিল বললে সামান্যই বলা

হল ; আসলে যা হয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে—'শালী বাঁচাও' আন্দোলন। বছরের পর বছর ধরে সে এক তুমুল কাণ্ড।

উপলক্ষ্য—শ্যালিকা। অর্থাৎ স্ত্রীর বোন। রসিক জামাই-বাবুরা যাকে এদেশে বলেন 'ফাউ', বিলাতে তাদের আদর করতে মানা এমন নয়। 'শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ যখন উঠল জমে' তখন সব জামাইবাবু নিশ্চয় সেখানেও 'রায়বেশে নাচ নাচের ঝোঁকে' তার মাথায় গাট্টা মারেন না, কিন্তু সে সব ফষ্টিনষ্টি এক কথা, আর শালীকে বিয়ে করে ঘরে তুলে আনা অন্য। ইংরাজরা একবাক্যে বললেন—এ শাস্ত্র বহির্ভূত। (প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, ওঁদের তর্কে কোন তৃতীয়পক্ষ ছিল না। অর্থাৎ শালী নিয়ে এ সওয়ালে দিদিরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শালীকে বিয়ে করার প্রস্তাব বা বাসনা সর্বক্ষেত্রেই ছিল স্ত্রী-বিয়োগের পরে।)

কোনও দেশের মানুষই কোনকালে পুরোপুরি শাস্ত্র মেনে চলতে পারে না। সাহেব মেমদের পক্ষের স্বভাবতই তা সম্ভব হত না। অষ্টম হেনরি ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবাকে বিয়ে করলেন। ঠিক তেমনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেউ কেউ শালীকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতলেন। তবে সংগোপনে? কেননা, আইন নেই। কাজটা হৃদয়ের দিক থেকে যত পবিত্রই হোক, আইনত অসিদ্ধ। তাতে অসুবিধা অনেক, বিশেষত ছেলেমেয়েদের। সুতরাং, শুরু হল আন্দোলন। দাবি—শালীকে (স্ত্রীর অবর্তমানে) বিয়ের অধিকার চাই। সেটা ১৮৩৫ সনের কথা।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য স্পষ্ট। পৃথিবীর সর্বত্র শালী চল। আমেরিকায় তো বটেই, ইউরোপের কোথায় শালীদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বৃটেন। অথচ এখানেও রাশি রাশি ভদ্রসন্তান শ্যালিকাদের নিয়ে বাস করেন। যাঁরা বিত্তশালী তাঁরা বাইরে গিয়ে বিয়ে করে আসেন, যাঁরা গরিব

তাঁরা বিয়ে না-করেই সংসারধর্ম পালন করে চলেছেন। এঁদের সন্তান সন্ততিদের 'অবৈধ' বলে কেন চিহ্নিত করব আমরা?

কিন্তু আরও সোচ্চার প্রস্তাবের প্রতিবাদী দল। তাঁদের বক্তব্য দ্বিবিধ। এক—শাস্ত্রীয়, দুই—লৌকিক। তাঁরা বললেন—বাইবেলের অনুশাসন এই আচারের বিরুদ্ধে। এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা আছে—'None of you shall approach any that is near of Kin.' (Leviticus Chapter 18, 6) একই কেতাবের ১৬ নম্বর শ্লোকে আছে—'than shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife.' বিজ্ঞরা বললেন—ভায়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা যদি অশাস্ত্রীয় তবে বোনের বোনকে বিয়ে করাও। সংস্কারবাদীরা কণ্টকে কণ্টক তুলতে চাইলেন। তাঁরা তাক থেকে অন্য এক শাস্ত্র নামালেন। তাতে বলা হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত। লেভিটিকাস-এর অন্য দুটি শ্লোকও খুঁজে বের করলেন তাঁরা। তাতে বলা হয়েছে—স্ত্রীর বর্তমানে তার বোনের দিকে নজর দিয়ে তাঁর বিরক্ত উৎপাদন করো না। 'স্ত্রীর বর্তমানে' এই কথা কয়টির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন তাঁরা; —স্ত্রী বেঁচে থাকতে তো আর কেউ শ্যালিকাকে বিয়ে করছে না। তবে আর আপত্তি কেন? তা ছাড়া বাইবেলে কোথাও তো এমন নির্দেশ নেই যে, স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর বোনকে বিয়ে করো না। অন্য পক্ষ জবাবে বললেন—তা বাইবেলে তো এটাও লেখে নি যে নিজের বোনকে বিয়ে করবে না। তা বলে কি কেউ নিজের বোনকে বিয়ে করে? তা ছাড়া আরও একটা কথা ভারবার আছে। বলা হয়েছে—'...অ্যাণ্ড দে টু স্যাল বি ওয়ান ফ্লেস,' —বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী এক অস্তিত্ব; সুতরাং শালীকে বিয়ে করা আর বোনকে বিয়ে করা একই ব্যাপার নয় কি?

নানা কূট তর্ক। সুতরাং ১৮৪১ সনে 'শালী বিবাহ' সম্পর্কে একটি বিল পার্লামেণ্টে তোলা হল বটে, কিন্তু সেটা পাস হল না। বছরের

পর বছর জুড়ে তর্কই চলল শুধু। এই তর্কের বহর বোঝা যাবে একটি তথ্য শুনলেই। ১৮৮৭ সনে শালী বিষয়ক গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছিল। তাতে ঠাঁই পেয়েছিল তিনশ' পুঁথিপত্রের নাম। স্বকীয়া, পরকীয়া—বউদের নিয়েও অল্পকালের মধ্যে এত গবেষণা বই কোথাও বের হয়েছে কিনা সন্দেহ! দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, গবেষণা—কোন কিছুরই কমতি নেই। মেম-শ্যালিকারা পৃথিবীর শালী-সমাজকে যে উপহার দিয়ে গেছে তাতে রীতিমত সমৃদ্ধশালী একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলা যায়।

শাস্ত্রের কূটতর্ক শুধু বাইবেলেই সীমাবদ্ধ রইল না। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মন্থন শুরু হল। অনেকটা আমাদের দেশের সতীদাহ নিরোধ আন্দোলন-কালের পরিস্থিতি। প্রসঙ্গত এ সাদৃশ্যের কথা উল্লেখও করেছিলেন একজন। তিনি ম্যাক্সমূলার। তিনি বলেছিলেন—হিব্রু পণ্ডিতরা যেভাবে লেভিটিকাস-এর উক্তিকে ব্যাখ্যা করছেন তা দেখে আমার মনে পড়ছে হিন্দু পণ্ডিতদের কীর্তির কথা। ঋক্‌বেদের একটি শব্দের অর্থ বিভ্রাটের ফলে হাজার হাজার ভারতীয় নারীকে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে হয়েছে। এও যেন তা-ই।

আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ারের ডালহৌসি তখন স্বদেশে। তর্কে তিনিও যোগ দিলেন, তবে রাজকীয় ভঙ্গীতে। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে তিনি পাঁতি চেয়ে পাঠালেন। মোটামুটি সকলেই একমত,—শালীতে কারও অনিচ্ছা নেই! এডিনবরা থেকে বিখ্যাত একজন অধ্যাপক লিখেছিলেন—যে বাক্যটির অর্থ আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা ভাষাতত্ত্বে খুঁজতে গেলে ভুল হবে, মীমাংসা মিলবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলে তবেই!

বিরুদ্ধবাদীরা এসব কথা শুনে মোটেই দমলেন না। তাঁরা জবাব দিলেন আমরা তো কাণ্ডজ্ঞানের কথাই বলছি। ম্যাথু আর্নল্ড বললেন—আমার ভাবতেও লজ্জা করছে মহান এই ইন্দো-

ইউরোপীয় জাতি একটি ঘরোয়া ব্যাপারের মীমাংসা খুঁজছে সেমটিকদের প্রাচীন জীর্ণ পুঁথির পাতায় যাঁদের, বিজ্ঞতম নরপতির স্ত্রী ছিল সাত শ', রক্ষিতা তিন শ'। আর্নল্ড শ্যালিকা-বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বলতেন—এ রুচি-বিগর্হিত। একবার শালী নিয়ে ঘর করার অনুমতি দিলে, বহুবিবাহ, বহু স্বামীত্ব সবই মেনে নিতে হবে একদিন, এই ছিল তাঁর ধারণা।

কাণ্ডজ্ঞানপন্থীরা আরও নানা কথা তুললেন। একটি কাগজ বলল—পরিস্থিতিটা ভেবে দেখুন। স্বামী স্ত্রীর সুখের সংসার। মাঝে মাঝে শ্যালিকা আসে বোনের খোঁজখবর নিতে, দু' একদিন থেকেও যায়। হাসি ঠাট্টা তামাসায় সময় কাটে। স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দময় পরিবেশ। এই আইন পাশ হলে মুহূর্তে সব অন্যরকম হয়ে যাবে। বোন বোনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে। ভগ্নিপতির চোখেও অন্য দৃষ্টি যেন।

এ যুক্তি শোনালেন অনেকে। তাদের মধ্যে মেয়েরাও আছেন। জামাইবাবুর সঙ্গে মধুর সম্পর্ককে বিষাক্ত হতে দিতে পারে না তারা। কেউ কেউ এমনও বললেন—আমি গরীব গৃহস্থবধূ। আমার ছোটবোন এসে মাঝে মাঝে আমার কাছে থাকে। ছেলে মেয়েদের দেখাশুনা করে, গৃহস্থালী কাজে আমাকে সাহায্য করে। দোহাই তোমাদের, ওসব অলক্ষুণে আইনের কথা বলো না, তা হলে জেন আর আমাদের বাড়ির ছায়া মাড়াবে না।

অলক্ষুণে অন্য লক্ষণেও, বললেন অন্যেরা। আরার্গ থেকে ডেনমার্ক—যত বড় ঘরে এ জাতীয় বিয়ে-সাদি হয়েছে সর্বত্র ঘর ভেঙ্গেছে, সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেছে। সুতরাং, এ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। তাছাড়া একবার তাকিয়ে দেখ অতি আধুনিক আমেরিকার দিকে, সেখানে শ্যালিকাকে বিয়ে করতে মানা নেই, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদও বাড়ছে দিনকে দিন,—কুড়ি বছরে তিন লক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা সেদেশে! ডিউক অব মার্লবরো

পার্লামেন্টে মার্কিন কাগজ থেকে একটি ঘটনা পড়ে শোনালেন। একজন পাঠক লিখেছেন :

আমি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছিলাম। তাঁর একটি কুমারী মেয়ে ছিল। একদিন আমার বাবা এখানে বেড়াতে এলেন। মেয়েটিকে দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। মেয়েটিও ভালবাসল তাকে। বাবা ওকে বিয়ে করলেন। আমার বাবা এখন যেমন একদিক থেকে আমার জামাতা, অন্যদিকে আমার মেয়ে আমার বিমাতা। কিছুকাল পরে আমি পিতা হলাম। সে সম্পর্কে এখন আমার বাবার শালা নয় কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা কি এদেশেও একজাতীয় বিভ্রাটই কামনা করি? ডঃ জনসন বলেছিলেন —না। এতে সম্পর্কনির্ণয় ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে, দেশে দেখা দেবে 'কনফিউশান অব প্রজিনি!'

এর পর দেখবে স্বামীরা গোপনে স্ত্রীদের বিষ খাইয়ে মারছে শালীপ্রাপ্তির বাসনায়—চারদিকে আতঙ্ক ছড়াবার চেষ্টাও চলল।

রকমারি আপত্তি—সন্দেহ, শঙ্কা। সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্যালিকা দিদির বর দখল করলেও তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর অধিকার পেলনা! উনিশবার হাউস অব কমনস বিলটিকে পাস করিয়েছিল, কিন্তু তবু আইন হল না তা। তেরো বার সেটি খারিজ করে দিল হাউস অব লর্ডস। কখনও বা বাতিল করে সিলেক্ট কমিটি ১৮৫৫ এভাবে গড়াতে গড়াতে ১৮৮৩ সনে পড়ল। ক'বছর আগে (১৮৭৯) প্রিন্স অব ওয়েলস, পরবর্তীকালের সুখ্যাত সপ্তম এডোয়ার্ড ৩২৫৮ জন কৃষকের তরফ থেকে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন পার্লামেন্টের দরবারে। লর্ড বেকন্সফিল্ড হাজির করেছিলেন ১১৫২ জনের স্বাক্ষরযুক্ত আর একটি আবেদন পত্র। বক্তব্য : আমরা গরীব চাষী। স্ত্রী মরে গেলে শ্যালিকারা আমাদের সহায় হয়। আমরা শহুরে বাবুদের মত বউ খুঁজে বেড়াতে পারি না। আমোদের সে-সময় নেই, অর্থও নেই।...

বক্তৃতার সময় কেউ কেউ এমন ঘটনার কথাও বললেন যেখানে তাঁরা নিজের কানে শুনছেন মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে কেঁদে বলছে—তুমি আমার বোনকেই বিয়ে করো, তা হলে ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে মরার সময় আর দুশ্চিন্তা করে মরতে হয় না।

প্রজার দরখাস্ত, রাজপুত্রের সওয়াল ; বাগ্মীদের বক্তৃতা—আইন কিন্তু তবু পাস হল না। ভূতপূর্ব জামাইবাবুর সঙ্গে যাঁরা ঘর করছিলেন তাঁরা বে-আইনি স্ত্রী হিসাবেই পুরো উনিশ শতক যাপন করতে বাধ্য হলেন। এল বিংশ শতাব্দী। নতুন কালের হাওয়া দেশে। এবার আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না শ্যালিকের দাবি। ১৮৮৬ সনে ক্লয়টন-এ নিজের শালীকে বিদেশে বিয়ে করে যখন ঘরে ফিরলেন জনৈক উইলটন সাহেব, তখনই জানা গেল হাওয়া অন্যদিকে। ছোট্ট শহর ক্লয়টন সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছিল নব দম্পতিকে। পথের মোড়ে মোড়ে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। শহরের ব্যাণ্ড পার্টি বাদ্য বাজিয়েছিল। ধ্বনি উঠেছিল—'হোম, সুইট হোম!' অতএব ১৯০৬ সনে পাস হল কলোনিয়াল ম্যারেজ বিল। তার মর্ম : পাত্র পাত্রী কোন উপনিবেশের বাসিন্দা হলে ভূতপূর্ব ভগ্নিপতি এবং শ্যালিকার বিয়ে সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। পরের বছরই (১০০৭) উঠল—'ডিসিসড, ওয়াইফস্ সিসটার বিল,' অর্থাৎ মৃত স্ত্রীর বোন সম্পর্কিত আইনের প্রস্তাব। সেদিন ১৪ আগষ্ট। পরের দিন পাশ হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক বিল। তৃতীয় দফায় ভোটাভুটির ফল : পক্ষে—৯৮ জন, বিপক্ষে—৫৪ জন। তার পরও যাজক মহল প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে হার মানতে হল ১৯১২ সনে। সেদিন থেকে কি রাষ্ট্রীয় আইনে, কি গির্জায়, কি ঘরে—ভূতপূর্ব শ্যালিকা স্বামীর স্ত্রী হিসাবে গৃহীত, স্বীকৃত, সম্মানিত। ১৯২১ সনে গোঁড়াপন্থীরা আরও একবার হার মানলেন। এবার স্বীকৃত হল মৃত ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করার অধিকার। অবশ্য ব্রিটেনে এ-জাতীয় বিয়ে

কম হত। মেমরা স্বামীর ছোট ভাইকে দেবর বলে না। ডালহৌসি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন (১৮৮২)—শ্যালিকা বিবাহের ঘটনা যেখানে একশ, বৌদিকে বিয়ের ঘটনা সেখানে মাত্র তিনটি! তবু এ আইন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; অষ্টম হেনরির মত আজ আর কাউকে বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয় না! অবশ্য বিবেক তাঁর ছিল কিনা সে অন্যকথা।

বিলাতী শ্যালিকারা মুক্ত হলেন। এ লড়াইয়ে দাম দিতে হয়েছে বেচারাদের অনেক। সদর রাস্তা ছেড়ে গলিতে বাড়ি নিতে হয়েছে, গির্জার অঙ্গনে ছাড়পত্র ছিল না তাদের, ভালবাসার ফসল সন্তান সন্ততিদের অধিকার ছিল না বাপ মায়ের সম্পত্তি ভোগ করবার। শুধু তাই নয়, রাত্রি দিন অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ছাড়াও কখনও কখনও চরমমূল্যও দিতে হয়েছে তাদের। একজন ভূতপূর্ব শ্যালিকার ফাঁসি পর্যন্ত হয়েছে ভূতপূর্ব ভগ্নিপতীকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। তার ওপর অসংখ্য রঙ্গচিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, নানা স্থূল সূক্ষ্ম রসিকতা। এত ভোগান্তির পরেও সমাজপতিরা কিন্তু সব কটি সুতো হাতছাড়া করেন নি, ভগ্নিপতিরা শেষ বাঁধনটি কাটতে সমর্থ হয়েছেন এই সেদিন, ১৯৬০ সনে, অর্থাৎ মাত্র দশ বছর আগে। সেবার স্থির হয়েছে শালীকে বিয়ে করতে হলে স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, শ্যালিকাটিকে যদি মনে ধরেই থাকে তবে স্ত্রীকে তালাক দিলেই খালাস। অর্থাৎ এবার আর স্বায়ত্বশাসন নয়,—পূর্ণ স্বাধীনতা। এখন যে কোনও জামাইবাবু যে কোনও শালীকে বিয়ে করতে পারেন। যে-কোন বোনকে ঠেলে দিয়ে দখল করে নিতে পারে তার ঘর।

তাজ্জব ব্যাপার এই, এই স্বাধীনতা অর্জন করতে ওদের লেগে গেল একশ' বছরেরও বেশি সময়, অথচ আমরা সেই কবে থেকে শালী-সংস্কার মুক্ত।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, শালী-বিবাহের নামে সবাই

একালে উন্মাদ। প্রকাশ্যে এ-ব্যাপারে অনেকেরই মতামত এখনও সেই সেকেলে বিলাতী নায়কের মত।

নির্বাচনী সভা। প্রতিপক্ষের একজন শ্রোতা চেঁচিয়ে উঠলেন—শ্যালিকদের বিয়ে করা সম্পর্কে আপনার মত কী? আপনি কি স্ত্রী মারা গেলে শ্যালিকাকে বিয়ে করবেন? সঙ্গে সঙ্গে বক্তার জিজ্ঞাসা—আপনি কি বিবাহিত? উত্তর হল—হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন: এই সভায় আপনার স্ত্রী কি উপস্থিত আছেন?—না, উত্তর দিলেন শ্রোতাটি।—মাইন ইজ! আর কথা না বাড়িয়ে বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

উপসংহারে সবিনয়ে কবুল করি, শ্যালিকা-বিষয়ক এই সন্দর্ভ আমার ব্যক্তিগত গবেষণার ফল নয়। এ বিষয়ে আমার যাবতীয় বিদ্যা খবরের কাগজের সেই বন্ধুটির কাছ থেকেই পাওয়া। একাধিক বৈঠকে অতি যত্ন সহকারে তিনি এই 'অতি-প্রয়োজনীয়' বিষয়টিতে আমাকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। পাঠ-শেষে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সত্যি বলতো, এত শিখলে কী করে?

বন্ধুর সহাস্য উত্তর—ঠেকে!

পা আর পা।—ওহ্, আই অ্যাম সো হার্টিলি সিক্ অব সিয়িং লেগস! বলেছিলেন নাকি একজন ইংরাজ টিকিট কালেক্টার। যে কামরার দরজা খুলি সেই কামরাতেই সার সার নগ্ন পা।—লেগস্, লেগস্, অ্যাণ্ড লেগস্!—ইংরাজ মেয়েদের হল কী, তাই ভাবছি!

এসব তিরিশের যুগের কথা। স্কার্ট তখনও হাঁটুর ওপরে ছয় ইঞ্চি, আট ইঞ্চি ওঠেনি। 'ভি'-গলার ব্লাউজের নাম তখন—'নিউমোনিয়া ব্লাউজ'। লণ্ডন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মেয়েদের ওপর তখন কড়া নির্দেশ—জামায় অন্তত চার ইঞ্চি হাতা থাকা চাই। 'মিনি-স্কার্ট' তখনও মোটেই 'মিনি' নয়। তবু ট্রাম যাত্রীরা ছোট মাপের পোষাক দেখলেই প্রতিবাদে গাড়ি থেকে নেমে যায়। লিভারপুলের কারখানা মালিক দুঃসাহসী মেয়েদের ডেকে ধমকান—হয় ওই নির্লজ্জ পোষাক ছাড়, না হয় চাকরি!

আর আজ? সমুদ্র সৈকতে যে সব দৃশ্য দেখা যায় তার বিবরণ নাই বা দিলাম। আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্টেশনের সিঁড়ির দু' পাশে আণ্ডারওয়ার-এর সে সব সচিত্র বিজ্ঞাপন সেগুলোও না-হয় ছবি মাত্র। ট্রেনের কামরায় কিন্তু ছবির মানুষগুলোই সহযাত্রিনী। দেখলে বিশ্বাসই হয় না, এই দেশের ভদ্রজনেরা একদা টেবিলের পায়েও পাজামা পরাতেন, কুপিডকেও পোশাক পরিয়ে রাখতেন।

সাউথ কেনসিংটন-এর শো-কেসের সামনে হঠাৎ একদিন ভিড়। —কী ব্যাপার? উঁকি দিতে গিয়ে দেখা গেল—দুটি নগ্নপ্রায় মেয়ে স্রেফ্ আণ্ডারওয়্যারে শো-কেসে দাঁড়িয়ে,—জীবন্ত, বিজ্ঞাপন ওরা। সোহের দুয়ারে দুয়ারে হাতছানি,—স্ট্রীপটিজ ক্লাব। অক্সফোর্ডে ছোট্ট নদী ধরে লগি ঠেলে চলছি। চলতে চলতে এক সময় ফুরিয়ে গেল পথ। সামনে বন। নেমে ক'পা হাঁটতেই নিষেধ। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা—ভদ্রমহিলারা আর যেন না এগোন। সঙ্গে অবশ্য কোনও ভদ্রমহিলা ছিলেন না। তবু পিছু হটতে হল। বোঝা গেল—আমরা এক ন্যুডিস্ট ক্লাবের দোর গোড়ায়।

ব্রিটেন, সনাতন ব্রিটেন স্পষ্টতই আজ ইতিহাসের ব্যাপার। আর যাই হোক, দেখেশুনে মনে হয় মেয়েদের ফ্রকের দৈর্ঘ্য নিয়ে এদেশে আজ আর কারও কোনও মাথাব্যাথা নেই। হাওয়া নিশ্চিত ভাবে বাহুল্যবর্জনের দিকেই।

ব্যাপারটা কাপড়-চোপড় নিয়ে। অতএব বিস্তারিত আলোচনা বোধ হয় অবান্তর হবে না।

এই পৃথিবীতে যত মানুষ, আর এই মানুষের যত মত, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রশ্নে তা ভাগ করা চলে মোটামুটি দু'ভাগে। একদল মনে করেন—মানুষ ক্রমেই মনে মনে আদিম মানুষ হয়ে উঠছে। পুরুষরা আদম হতে চান, মেয়েরা—ইভ। তাদের চোখের সামনে অনেক প্রমাণ; মিনি ফ্রক, মাইক্রোমিনি, টপলেস, সর্টস ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, সংবাদপত্র। ১৯৩৬ সনে লণ্ডনের সেণ্ট পল গির্জার একটি মেয়ে হঠাৎ নিজের কাপড়-চোপড় সব খুলে দিগ্‌বসনা হয়ে যান। খবর পেয়ে কাগজের রিপোর্টাররা সব ছুটে এসেছিলেন, কিন্তু মুশকিলে পড়লেন বার্তা-সম্পাদক মশাইরা, ঘটনাটা কথায় প্রকাশ করা যায় কী করে? কী বলা যায় মেয়েটিকে? কেউ লিখলেন—'আনক্লোদড্', কেউ—'অ্যানক্ল্যাড,' কেউ বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্যভাবে বুঝিয়ে

বলতে চাইলেন ঘটনটা। একটি কাগজ অবশ্য ব্যবহার করে ছিল 'ন্যুড' শব্দটা, কিন্তু কেউ সাহস করে লিখতে পারলেন না—'নেকেড'। নগ্নসত্যও সেদিন 'নগ্নভাবে' প্রকাশ করতে পারেন না ওঁরা।

আর আজ? চারি অক্ষরের সেই কুখ্যাত বা বিখ্যাত শব্দটি শুধু লরেন্সের বইতেই যে আবার ঠাঁই পেয়েছে তাই নয়, আজকাল মেয়েরা পর্যন্ত উপন্যাসে ওসব আকথা কুকথা যদৃচ্ছ ব্যবহার করছেন। অতএব পোশাকবাদীদের মন্তব্য: দুনিয়া গোল্লায় গেল। দ্বিতীয় দলকে বলা চলে—এক ধরনের দেহবাদী। তাঁরা বলতে চান—মানুষ অহেতুক বস্ত্রভারে পীড়িত। পোশাক যাঁরা, আঁটতে আঁটতে আর কাটতে কাটতে ক্রমেই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, তাঁদের দিকে কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই এঁদের। এঁদের মতে এসব অসভ্যতা, বস্ত্র বাহুল্যের চেয়েও নিন্দনীয় বস্ত্রের স্বল্পতা। তবে ওঁরা কী চান? চান—বস্ত্রের শাসন থেকে দেহের মুক্তি,—পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই দুই দলের মধ্যে ভোটাভুটি লেগে গেলে জিতবেন কারা তা নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা, মন্দ নয় বোধহয়। হালে বিলেতে ভোটারদের মনের খবরও রটেছে কিছু কিছু। এখানে ওখানে, এখন তখন দ্বিতীয় দলের প্রবক্তাদের দেখা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের মুহূর্তে ক'টি তরুণ-তরুণী নাকি প্রকাশ্য রাস্তায় ধর্না দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে! তাঁদের কথা ছিল: কাউকেই ভোট দিও না। কারও মাথায় কিছু নেই। ইহাই সত্য। আর 'বেয়ার ট্রুথ' বা নগ্ন সত্যেরই প্রতীক আমরা। হিপি-ইপি দেখে অভ্যস্ত মার্কিনীরা ওঁদের নিয়ে খুব মাথা ঘামাতে রাজী হন নি। অন্তত প্রচারিত সংবাদে সে-রকম কোন উদ্বেগের কথা ছিল না। কিন্তু ব্রিটেনে যা হয়ে গেল, সে—খবরের কাগজের ভাষায় বললে, উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। টেলিভিসনে হঠাৎ একরাত্রে আবির্ভূত হলেন ঝাঁক ঝাঁক আদম-ইভ। পতনের

আগের অবস্থা, কারুর অঙ্গে ডুমুরপত্রটিও নেই। দর্শকরা শিহরিত চমকিত, ক্রুদ্ধ। পরদিন ঝাঁক ঝাঁক চিঠি বি. বি. সি'র দফতরে,—একি অসভ্যতা! শেষে 'ন্যুডিস্ট ক্লাব' ও দেখালে?

কিন্তু সত্যিই কি সব দর্শকই সে রাত্তিরে অতিশয় ক্রুদ্ধ? পোশাকমণ্ডিত মানুষ কি সত্যিই অন্য মানুষকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে অপছন্দ করেন? টেলিভিসনের ওই দৃশ্যগুলোর দর্শকদের মধ্যে এমন কেউ কি একেবারেই ছিলেন না যারা ক্রুদ্ধ না হয়ে কৌতুক অনুভব করেছেন, বিরক্তির বদলে যাঁদের মুখে ফুটেছে তৃপ্তি? নিশ্চয়ই আমুদেরাও ছিলেন। ছিলেন কৌতূহলীরাও। অন্তত ইতিহাস আমাদের তাই বলে। নয়তো খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক শিল্পীরা মানুষের দেহে যে-রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন, শতকের পর শতক ধরে আজ অবধি শিল্পীরা সেখানে অপরূপকে খুঁজে বেড়াতেন না। ছবির নগ্ন মানুষ বা 'ন্যুড', আর জীবন্ত মানুষের বস্ত্রমুক্ত শরীর অবশ্য এক নয়। দ্বিতীয়টিকে 'নেকেড' বা উলঙ্গ বলে ধরে নেওয়াই ভাল। কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনকালে বোধহয় দর্শকাভাব ঘটেনি। স্মরণীয়: 'পিপিং টমে'র উপাখ্যান।

প্রজাদের করভার থেকে মুক্ত করার জন্য আর্লপত্নী গডিভিয়া একদা বস্ত্রভারমুক্ত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বের হয়েছিলেন নগর-পরিক্রমায়। কথা ছিল, তিনি যখন বের হবেন, কভেনট্রির পথে তখন কেউ থাকবে না,—জানালা-দুয়ার সব বন্ধ থাকা চাই। তবু কৌতূহল দমিত হল না। উঁকি দিল জনৈক টম। বিনে পোশাকে মহামান্য আর্ল-গিন্নীকে সে দেখে ফেলেছিল।

শোনা যায়, টম নাকি এই পাপে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তবু চোখ বুঁজে থাকতে রাজী হল না কিন্তু। সেই থেকে উঁকি দেওয়ার পালা সমানেই চলেছে। যেখানেই 'ন্যুডিস্ট', সেখানেই দর্শক। উনিশ শতকের বিলেতে বর্ষীয়ান কুমারীরা নাকি চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে সাগ্রহে ওঁৎ পেতে থাকতেন—কখন লোকেরা

সমুদ্রে স্নান করতে আসবেন তারই প্রতীক্ষায়। সেকালে 'বিকিনি' ছিল না, ছিল না কোন সাঁতারের পোশাকও। সুতরাং, এই আগ্রহ বোধহয় খুব অস্বাভাবিক নয়। একালেও একই আগ্রহ দেখি 'ন্যুডিস্ট' ক্লাবগুলোকে ঘিরে। প্রেস-ফটোগ্রাফাররা উড়োজাহাজে করে তাদের মাথার ওপর ঘুর ঘুর করছে। কাগজে সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। অবশেষে বি. বি. সি'র টেলিভিসনে সচিত্র বর্ণনাও পরিবেশিত হল।

প্রশ্ন হল—মানুষ পোশাক খুলে ফেলে দিচ্ছে কেন? সবাই খুলছেন না আমরা সেটা জানি, জিজ্ঞাসাটা যাঁরা খুলছেন তাঁদের সম্পর্কেই। আমাদের দেশের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। ভারতের জলহাওয়ায়, অনেকে মনে করেন, পোশাকের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক কারণ। তাছাড়া, আমাদের দেশ এখনও পোশাকী সভ্যতার দেশ বলে চিহ্নিত হয়নি, 'জাতির জনক' পরদেশে খ্যাতি পেয়েছিলেন—'অর্ধ-উলঙ্গ ফকির'। সুতরাং, তর্কাতর্কি যাঁদের ঘরে, সেই পশ্চিমের কথাই হোক।

এত বাবুয়ানার মধ্যেও কেন আজ কেউ কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন অঙ্গের সব আবরণ?

উত্তর নানাবিধ। সপ্তদশ শতকের লণ্ডনে এক যাজক আবির্ভূত হয়েছিলেন নাগা সন্ন্যাসী সেজে। তিনি হাঁক দিতেন—'রিপেন্ট। রিপেন্ট!' হে মানুষ, অনুশোচনা কর। কীসের জন্য অনুশোচনা? সম্ভবত এই মর্ত্য জীবনের জন্য, স্বর্গ থেকে পতনের জন্য। ছিটগ্রস্ত বস্ত্র-বিদ্রোহীও ছিলেন অনেকে। সার চার্লস সেডলি কবি ও নাট্যকার। উলঙ্গ হয়ে লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার অপরাধে পাঁচ শ' পাউণ্ড জরিমানা হয়েছিল তাঁর। আদালতে তিনি নাকি বলেছিলেন—বেশ করেছি। বিখ্যাত কবি উইলিয়াম ব্লেইক আর তাঁর স্ত্রী নাকি তাঁদের ল্যামবেথ-এর বাড়ির বাগানে আদম-ইভ সেজে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও কখনও ঘাসে শুয়ে 'প্যারাডাইস

লস্ট’ পড়তেন। আবার এমন শৌখিনও দেখা গেছে যাঁরা স্বর্গ-দর্শনের আনন্দ খুঁজে পেতেন নগ্ন-সৌন্দর্যের মধ্যেই। যেমন—লর্ড ওয়ার্ড। তিনি নাকি কালো সাটিনে মোড়া সোফায় তাঁর স্ত্রীকে অনাবৃত অবস্থায় বসিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। ত্যক্ত বিরক্ত ভদ্রমহিলা বিষয়টা পিত্রালয়ের গোচরে আনেন। মা বাবার উত্তর হয়ে দিলেন—দেখ, ওসব তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। আমরা কোন কথা বলতে চাই না। পরে জানা গিয়েছিল এই বিরক্তির অন্য কারণও ছিল। লেডি ওয়ার্ডের অনিন্দ্য সুন্দর দেহটি নাকি আরও একজন লর্ডের প্রশংসাধন্য ছিল। এবং প্রশংসা ছিল পারস্পারিক।

এসব ব্যক্তিগত রুচি এবং মেজাজ মর্জির কথা। ‘ন্যুডিস্ট ক্লাব’ বলতে যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ধারণা, তাঁদের বক্তব্যও শোনা দরকার। হোরেস ওয়ালপোল ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নাকি বলতেন—কাপড়-চোপড় খুলে ফেললে আমি সব চিন্তা থেকে মুক্তি পাই। তবে কি আমাদের চিন্তা ভাবনা সবই পোশাকী ? পোশাককে আশ্রয় করেই তাদের অস্তিত্ব এবং পুষ্টি ? ‘গলিভার ট্রাভালস্’-এ গালিভারের এক প্রভু বলছেন—আমি কিছুতেই ভেবে পাই না প্রকৃতি যা আমাদের দিয়েছে তা আমরা ঢেকে রাখব কেন ? নগ্নতাবাদের সমর্থকদের আর একজন বলেন—মানুষের দেহ এত সুন্দর, এমন পবিত্র যে পোশাক সেখানে হাস্যকর ! পোশাক মনের বিকার, পাপীর ধ্যান। বার্নার্ড শ’র অভিমত শুনতে চাওয়া হয়েছিল একবার। তিনি বলেছিলেন—আমার মনে হয় ওঁরা ‘আদি পাপে’র ধারণাকে ভাঙতে চান, পোশাকের বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করতে চান।

ধর্ম, দর্শন, সৌন্দর্যবোধ—ইত্যাদি তত্ত্ব ছাড়াও বিদেশী দিগম্বর-দিগম্বরী সম্প্রদায় স্বাস্থ্যের কথাও তোলেন। তাঁদের একটি সংগঠনের নাম—ন্যাশন্যাল সান অ্যাণ্ড এয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

মুক্ত হাওয়ায় রোদ্দুরে গা ভাসিয়ে দিলে শরীর এবং মনের মুক্তি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যুক্তির অভাব নেই; তবু এখনও অনেকের কাছে অসহ্য এই নব্য প্রকৃতি-পূজারীর দল। চেস্টারটন বলেছিলেন—ওঁদের হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। অন্যরা অনেকেই তুরকোমুখো। কেউ বলেন—ওঁদের ঠাঁই হওয়া উচিত পাগলা গারদে। একজন যাজক রায় দিয়েছিলেন—যত যুক্তিই দেখান না কেন ওঁরা, আমি বলছি যাঁরা একবার কোন 'ন্যুডিস্ট ক্লাবে' যোগ দিয়েছেন, সমাজে তাঁদের পতিত বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। অতঃপর তাঁরা—না লেডি, না জেণ্টলম্যান। আর একজন অনেক ভেবেচিন্তে বললেন —প্রকৃতির বিধান বলে, শ্বেত অঙ্গ উন্মুক্ত রাখার জন্য নয়। ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অভিমত চাওয়া হয়েছিল গান্ধীজীরও। তিনি নাকি বলেছিলেন—মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকবেন এমন ধারণা আমি সমর্থন করতে অক্ষম। কেন না, সকলের হৃদয় মন সমান পবিত্র নয়।

তীব্র সমালোচনা তো বটেই, প্রথম যুগের নগ্নতাবাদীদের ভাগ্যে জুটেছে প্রচণ্ড কুৎসাও। খবরের কাগজে হেড-লাইন 'ইন এ ন্যুডিস্ট ক্যাম্প। (সামহোয়ার ইন ইংল্যাণ্ড) নেকেড ট্রুথ অ্যাবাউট ন্যুডিজম!' কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন— অদ্ভুত সে স্বর্গ। যখন তখন যাকে খুশি নিয়ে আড়ালে চলে যাও। বিবাহিতা অবিবাহিতা বাছবিচার অনাবশ্যক, এখানে সবাই সমান। চারদিকে রটে গেল—আসলে সব যৌনবিকারগ্রস্ত-দের আড্ডা এই সব ক্লাব, সেখানে না আছে নীতি, না ধর্ম।

'ন্যুডিস্ট'রা এখানকার মত তখনও আড্ডা গাড়তেন লোকালয় থেকে দূরে, বনের আড়ালে। তবু ভদ্ররা খুঁজে বের করতে চাইলেন তাঁদের। সুযোগ পেলেই চলে আক্রমণ। রকমারি পুস্তিকা বের হল তাঁদের বিরুদ্ধে। একদল রটাতে চাইলেন—

এসব আসলে ইহুদি-জার্মান-রুশ চক্রান্ত, ইংরাজকে ওরা দুশ্চরিত্রে পরিণত করতে চায়। অন্য দল বলেন—এঁদের মতলব খৃষ্টান ধর্মকে বেইজ্জত করা। নানা ধরণের পদ্য এবং গান রচিত হল তাঁদের উদ্দেশ্যে। সবই রঙ্গ কিংবা ব্যঙ্গাত্মক। একটি গানে প্রথম কলি—'হোয়াট ক্যান ইউ গিভ এ ন্যুডিস্ট অন হিজ বার্থডে?'—জন্মদিনে আমাদের এই আদমকে কী উপহার দিই? আর একটি গানের একজন বলছেন—আমি একটি ন্যুডিস্ট ক্লাবে ভৃত্যের কাজ পেয়েছি। দ্বিতীয়ের প্রশ্ন—সেখানে তুমি কী কর? প্রথমের উত্তর—'আই কীপ দি স্টোন সীট্স ওয়ার্ম ফর দি মেম্বারস!' ১৯৩৭ সনে জরিমানা গুনতে হয়েছিল এই গানের সুরকারকে।

চারদিক থেকে এই আক্রমণের মধ্যেও কিন্তু ন্যুডিস্ট'রা নিজেদের ব্রতে অবিচল। তাঁদের মতবাদের সপক্ষে তাঁরাও বই ছাপিয়ে চললেন। প্লেটো-মোর থেকে শুরু করে সমর্থনে অনেক চিন্তাশীল মানুষকে খুঁজে বের করলেন। যৌনতার অভিযোগের প্রতিবাদে একজন মহিলা কাগজে লিখলেন—আমরা নারী পুরুষ এক কম্বলের নীচে ঘুমিয়েছি, কিন্তু কোন দিন নিজেদের মনে ওসব চিন্তা উঁকি দেয় নি। গ্ল্যাডস্টোন লিখেছিলেন—বৃথাই ওঁরা প্রাচীন নজির খুঁজে বের করেছেন। আমি বিশ্বাস করি না প্রাচীন গ্রীসের মেয়েরা সত্যিই অতিথিকে নিজেদের হাতে স্নান করিয়ে দিতেন, তাঁদের অঙ্গে তৈল মর্দন করতেন। উত্তরে একজন নগ্নতাবাদীর মন্তব্য: লিবারেল প্রধানমন্ত্রী তো; সুতরাং, তিনি কী করে ভাববেন যে, এর পরও অতিথিরা আর কিছু না চেয়ে থাকতে পারতেন!

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা মাঝে মাঝে ওঁদের আস্তানার দিকে ধাওয়া করতেন অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করতে। ফলাফল অনেক সময়ই পাঠকদের আশাভঙ্গ করেছে। ১৯৩৮ সনে ব্রিটেনে নাকি কমপক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষ আদম-ইভ

আড্ডার সদস্য। 'জনবুল' নামে একটি কাগজের লোক গিয়েছিলেন একটি আড্ডায় উঁকি দিতে। ফিরে এসে বললেন—যা ভাবছেন তেমন কিছুই নয়। ব্যাপারটা অনেকাংশে পারিবারিক। গোটা পরিবার এসেছেন একসঙ্গে। তাছাড়া মধ্যবয়স্করাই সংখ্যায় বেশি। আর একটি কাগজের রিপোর্টার ওঁদের সঙ্গে ক'দিন কাটিয়ে এসে বললেন—স্নায়ুরোগগ্রস্তদের উত্তম ওষুধ এইসব ক্লাব। তাছাড়া অষ্টপ্রহর যৌনচিন্তায় যাঁরা মগ্ন তাঁদের জন্য এ এক অদ্ভুত মোহমুদ্গর। এমন কি তদন্ত শেষে পাবলিক মর‍্যালিটি কাউন্সিলও বলতে বাধ্য হলেন—না, ওরা অসভ্য নয়। তবে, কারও কারও মতে—ব্যাপারটা হাস্যকর, এই যা। কিংসলে মারটিন বলেছিলেন —আত্মসচেতন উলঙ্গ নারী-পুরুষ একসঙ্গে বসে কাব্য পাঠ করছেন কিংবা খেলছেন, এ দৃশ্য দেখে না-হেসে পারা যায় না।

ন্যুডিস্টরা কিন্তু সব সময় সিরিয়াস। কোন কোন ক্লাবে সদস্যরা পৌরাণিক দেব-দেবীর নাম গ্রহণ করেন। সে দেবলোকে বিধিনিষেধ খুবই কঠোর। দেব-দেবীদের চা পরিবেশন করেন যাঁরা তাঁরা মর্যাদায় স্বভাবতই একটু নীচে। সুতরাং, কড়া হুকুম —ভৃত্যদের উলঙ্গ হওয়া চলবে না। ওঁরা কাজ কর্ম করেন কোমরে একফালি কাপড় জড়িয়ে। কোন কোন ক্লাবে নতুন সদস্য বা সদস্যা নেওয়ার আগে রীতিমত যাচাই করে দেখা হয়—তাঁদের বস্ত্রমুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আছে ; কি নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, 'খাতা-ভর্তি' উত্তর। সিলেকসন কমিটি সব দেখে-শুনে তবে পাকা সিদ্ধান্ত জানান—'ইয়েস' অথবা 'নো'। স্ত্রী সদস্য হতে চাইলে স্বামীর লিখিত অনুমতি চাই, স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর। সাধারণত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই কোন ক্লাবে। আর অভব্যতা ? অনেক দর্শকই এ বিষয়ে একমত যে, এমনিতে আমাদের সামনে যা চলে, যে সব কথাবার্তা কিংবা ভঙ্গী, ওঁদের ক্লাবে সে সব সাধারণ রসিকতা বা অঙ্গভঙ্গীও অচল। সর্বত্র সব সময় আশ্রমের

আবহাওয়া। যুদ্ধের আগে নুডিস্ট ক্লাবগুলো এত গোঁড়া ছিল যে, যেই শোনা গেল অমুক সদস্যটি আসলে 'ডিভোর্সড' স্বামী, সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ জারী হয়ে গেল তাঁর ওপর—অনুগ্রহপূর্বক আপনি এবার যেতে পারেন। আর এক সদস্যকে বের করে দেওয়া হয়েছিল নাকি 'খারাপ ভাষা' ব্যবহারের জন্য।

সে সব কড়াকড়ির দিন এখনও বহাল আছে কিনা জানি না। কিন্তু একটি বিষয় জানি—নগ্নতাবাদ বিদায় নেয়নি। এই মতবাদের প্রবক্তারা একদিন আশা করেছিলেন, সমালোচকরাও একদিন পথে আসবেন, শিষ্য এবং অনুরাগীর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়বে। বস্তুত ওঁদের একটি কাগজে এই আশা প্রকাশ করে একটি ছড়াও প্রচারিত হয়েছিল একবার ঃ

"Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
In a naturist sort of way ;
When a Policeman espied her,
And a Magistrate tried her,
And ?—The Three Formed A 'GROUP' Right Away !"

সহজ অর্থ। প্রকৃতিরূপা মিস মাফেটকে দেখলেন পুলিস। বিচার করলেন ম্যাজিস্ট্রেট। ফলং—তিন জনে মিলে নতুন একটি 'নুডিস্ট ক্লাব'। টেলিভিসনে বি. বি. সি.র ওই চমৎকার আয়োজনের পর ক্লাবে ক্লাবে নতুন সদস্য-সদস্যাদের লাইন পড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা।—তাই নয় কি? কে জানে, হয়তো বিখ্যাত সেই উপন্যাসের স্বপ্নও ফলে যেতে পারে একদিন। উপন্যাসটির নাম 'দি স্টর্ম ইন লণ্ডন'। প্রকাশকাল—১৯০৪। এক অদ্ভুত ঝড়ের বর্ণনা, সব কাপড় উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝড়ো হাওয়া। কোথায়ও একফালি সুতো নেই। অতএব, রাজা রাণী, ডিউক ডাচেস সবাই বস্ত্রহীন। প্রথম কয়দিন প্রবল অস্বস্তি। তারপরই সব স্বাভাবিক,

কেউ বলছে না--ডাচেসের পরনে কাপড় নেই। কেউ বলছে না—ডিউক তাঁর বাটলার-ভ্যালেদের মতই বস্ত্রহীন।

দেশে মুক্ত-আবহাওয়া। ফলে লণ্ডনে আজ ফলাও কারবার স্ট্রীপটিজ ক্লাবগুলোর। বিবসনা মেয়েদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদের রেওয়াজ ওদেশে বরাবরই ছিল। তবে সে সব চলত গোপনে। এখন প্রায় সবই প্রকাশ্য। একুশ শিলিং নজরানা গুনতে রাজি থাকলে যে-কেউ উঁকি মারতে পারেন সোহোর স্বল্পালোকিত সেই ঘরগুলোতে, মেয়েরা যেখানে ঘটা করে দর্শকদের সামনে পোষাক ছাড়ে। শুনেছি ইদানীং ওদের কারবার কিছু মন্দা। কারণ আর কিছু নয়, পুলিশের উপদ্রব। ১৯৬০ সনে লণ্ডনে নাকি স্ট্রীপ-টিজ ক্লাব ছিল প্রায় দু'শ, অন্যত্র আরও শতেক। এখন কত, সঠিক জানি না। কিন্তু সোহোর পথে পথে এখনও প্রতি তিন পা অন্তর সচিত্র স্বাগতম। এমন একটি ক্লাব ছিল নাকি যার সদস্য ছিলেন দশজন এম-পি, আটজন কোটিপতি, ষাটজন নাইট এবং ছত্রিশ জন পীয়ার। স্বভাবতই কারবারীরা তখন রীতিমত দুঃসাহসী। সোহোর পথে মেয়েদের দিয়ে মিছিল বের করিয়েছিলেন ওঁরা। শত শত মেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে বের হয়েছিল রাস্তায়। তাতে লেখা— 'উই আর নাইস্ গার্লস। —উই আর স্ট্রীপারস। —সো হোয়াট?'

বাদ সাধলেন শুচি বাইগ্রস্ত এক সাংবাদিক। তিনি কেনেথ অ্যালসপ। অ্যালসপ সাপ্তাহিক 'স্পেকটেটর'-এ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। আলোচ্য বিষয়—স্ট্রীপটিজ ক্লাব। সেটা ১৯৬০ সনের আগস্ট মাসের কথা। তাঁর অভিযোগ গুরুতর। যদিও ক্লাবের মেয়েরা আইন বাঁচিয়ে চলে, কিন্তু ওদের কাণ্ডকারখানা শুধু কুরুচিপূর্ণ নয়,—উদ্দেশ্যপূর্ণও বটে। 'স্পেকটেটর' এক সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশ করে। তার বক্তব্য—এসব কথা লিখবার মত নয়। ক্লাবে যা দেখা যায় তার হুবহু বর্ণনা লিখতে

বসলে কোনও মুদ্রাকর তা ছাপতে রাজি হবে না, কোনও প্রকাশক তা প্রকাশ করবে না। লেখালেখির ফলে 'পাবলিক মর‍্যালটি কাউন্সিল' আসরে অবতীর্ণ হলেন। দেশের নৈতিকতা রক্ষার নৈতিক দায় এই সুপ্রাচীন সংঘের। বাধ্য হয়ে পুলিসকে হস্তক্ষেপ করতে হল। কিন্তু স্ট্রীপটিজ-কন্যাদের শাসন পুলিসের পক্ষেও সহজ কাজ নয়। পঞ্চাশ-হাজার সদস্যওয়ালা একটি ক্লাবের মেয়েদের জব্দ করার আগে ছদ্মবেশে একই পুলিসকে নাকি আসরে হাজিরা দিতে হয়েছে পাঁচবার। বিস্মিত ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন—পাঁচবার যেতে হল কেন? বিব্রত পুলিসের উত্তর—ওই ডিং-ডং মেয়েদের ধরা খুবই শক্ত। ওরা যা করে সবই করে 'শিল্পসম্মত' উপায়ে!

সুতরাং, সংখ্যায় কিছু কমলেও স্ট্রীপটিজ ক্লাব এখনও বহাল তবিয়তে। শুধু কি তাই? আনুষ্ঠানিক ভাবে 'শিল্পসম্মত উপায়ে' পোষাক বর্জনের খেলা যেন ক্রমে অন্যদেরও পেয়ে বসছে।

মিস লিজ মেয়ো বাকিংহামশায়ারে চেহাম শহরের ইয়ং কনজারভেটিভদের সভানেত্রী। বয়স তার কুড়ির সামান্য কিছু ওপরে। স্থানীয় গির্জার হলে অগুন্তি দর্শকদের সামনে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে বস্ত্র-বর্জনের পালা অভিনয় করলেন। শেষদৃশ্য অবশ্য গোঁজামিল দিয়েছিলেন তিনি একটি ওভারকোট জড়িয়ে নিয়ে। তবু চারদিকে হল্লা। ওয়েস্ট এণ্ড ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ. এল, হাজার পাউণ্ড নগদ দেব মিস, দোহাই তোমার, একদিন আমাদের এখানে এসে খেলা দেখিয়ে যাও! শেষপর্যন্ত অবশ্য মিস মেয়ো নিজের ক্রুটি স্বীকার করেছিলেন। এবং স্থানীয় যাজকও তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তবু ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, মেয়েটি কনজারভেটিভদের সভানেত্রী!

এ-জাতীয় খবর প্রায়ই প্রায়ই শোনা যায়। বার্কশায়ারে এগারো বছরের এক কিশোরী পারসিক বাঁদীর পোষাকে নাচতে

নেমেছিল আসরে। কেম্ব্রিজের পঞ্চকন্যা স্থির করেছে উর্ধাঙ্গে কিছু না-পরে তারা অভিনয় করবে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য বস্ত্রহীন অবস্থায় ঝাঁপ দিয়েছে জলে। ইত্যাদি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পরিবেশ আর যাঁর পক্ষেই অভিপ্রেত হোক, 'মিসেস গ্রুণ্ডি'র পক্ষে নিশ্চয় নয়। ব্রিটেন থেকে তাঁর 'পালাই, পালাই' অবস্থা। বিশেষত, গত বছর (১৯৬৯) আর্ট কাউন্সিল জানিয়েছেন—তাঁরা শিল্প-সাহিত্য থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা, তথা সেন্সারসিপ্ তুলে নেওয়ার পক্ষে! আজকের ব্রিটেন অতএব শুধু পোষাকের ব্যাপারে নয়, বাহুল্য বর্জিত সর্ব বিষয়েই।

রোমানরা ব্রিটেন আক্রমণ করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দে। আর নর্মানরা খ্রীষ্টীয় ১০৬৬ অব্দে। নর্মান বিজয়ের পর আর কোনও বিদেশী যে স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ছাউনি ফেলতে চায়নি তার পেছনে দুটি কারণ। এক, ইংলিশ খানা। দুই, ইংলণ্ডের রবিবার।

ইংরাজের খানা তবু খেতে খেতে সয়ে যায়। না-খেলেও অনাহারে প্রাণ হারাবার ভয় নেই। সর্ব দেশের সব ডিস যত্রতত্র লভ্য; এমন কি—'যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালীর ভাষাতে!' কিন্তু

মুশকিল ওই রবিবারটিকে নিয়েই। এমন বিষণ্ণ রবিবার বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হয় না।

ইংলিশ চ্যানেলের ওপারেও রবিবার প্রাণচঞ্চল। কিন্তু এপারে প্রায় মৃত। ইউরোপের অন্যান্য দেশে রবিবার দিন মানুষ যত্ন করে দাড়ি কাটে, ভাল মন্দ খায়, সেরা পোষাকগুলো তোরঙ থেকে নামায়, তারপর সদলবলে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। ব্রিটেনে ঠিক তার উল্টো। রবিবারে শহর খাঁ খাঁ। ঘরে ঘরে বিষণ্ণতার ছায়া। ভরসা একমাত্র রবিবাসরীয় কাগজগুলো। এক সময় অবশ্য সেগুলোও ফুরিয়ে যায়। তখন একমাত্র করণীয়—নিঃশব্দে সোমবারের জন্য অপেক্ষা।

ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। অস্থির এবং বেপরোয়াদের জন্য রবিবার অবশ্যই অন্য রকমও হতে পারে। মনে হয় ধীরে ধীরে তাই হচ্ছে। কিন্তু আমাদের চেনা জানা হৈ হুল্লোড়ময় যে রবিবার, ব্রিটেনে তার আবির্ভাব এখনও বোধ হয় দূরবর্তী। এমন কি এখনও অধিকাংশ পল্লীতে সিগারেট ভক্তেরও রবিবারে একমাত্র ভরসা স্লটমেশিন!

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই নিরানন্দ রবিবারের পিছনে কিছু ইতিবৃত্ত আছে।

নরফোক-এ একটি মেয়ে কাপড় কাচছিল এমন সময় একজন সুদর্শন তরুণ এসে হাজির। ছেলেটি বলল—আচ্ছা, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?— কেন, বেঠিক কী হল? কাজ বন্ধ করে আগন্তুকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ধোপানী। তরুণ বলল—আজ যে রবিবার তাও ভুলে গেলে? ধোপানী বলল—গরিবের আবার রোববার সোমবার কী। কাজ করব না তো কী করব?—না খেয়ে থাকব নাকি? বলেই সে আবার নিজের কাজে মন দিল। হতাশ এবং ক্রুদ্ধ তরুণ স্বর্গে ফিরে গেল। ধোপানী তাকে পাড়ার-ছেলে ভেবেছিল বটে, কিন্তু সে আসলে দেবদূত। কিছুক্ষণ পরেই ধোপানীর সামনে এসে

দাঁড়াল একটি কিম্ভুত জন্তু। কালো কুচকুচে তার রঙ, ঠিক বরাহ নয়, কিন্তু দেখতে অনেকটা বরাহেরই মত। ধোপানী ভাল করে তাকে দেখবার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। বাঁদিকটায় চেপে বসল। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। ক্রমে শহরে শহরেও।—রবিবারে কাজ করেছিল ধোপার মেয়ে, ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন তাকে। খবরদার—রবিবারে কোন কাজ নয়। রবিবার ছুটি।

শনিবারে হাফ, রবিবারে মাফ—লোকসঙ্গীত আমাদেরও। শনিবার দুপুর হলেই মন উড়ু উড়ু। নিত্যযাত্রী ছোটেন ইষ্টিশনের দিকে, অন্যরা কেউ মাঠে, কেউ ঘরে, কেউ প্রমোদকেন্দ্রে। মাঠ নানা মাপের, নানা জাতের। খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সভার মাঠ। আমোদের আয়োজনও বহুবিধ, রবিবার বৈচিত্র্যময়। পুরোদিন ছুটি। সকাল থেকে রাত্রি—হাতে আস্ত একটা দিন। বলি ছুটির দিন। কিন্তু সত্যিই ছুটি কী? আপিস নেই সত্য, কিন্তু ছয়দিনের বকেয়া কাজ অপেক্ষা করে থাকে এই একটি দিনের নামে। ঘুমিয়ে, তাস পিটিয়ে আর সিনেমা দেখে যাঁরা রবিবার কাটান সেই ভাগ্যবানরা, বলা নিষ্প্রয়োজন সংখ্যায় নামমাত্র। বাজার করা, 'মেনু' ঠিক করা, কাগজ পড়া, মেয়েকে ক্লাসের বই পড়াবার ভান করা, বাইরের ঘরের নতুন করে কিছু করা যায় কিনা তা-ই নিয়ে ভাবা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, এবেলা আত্মীয় সন্দর্শন, ওবেলা সিনেমা দর্শন—ইত্যাদি লক্ষ কর্মে প্রত্যেকের রবিবার ঠাসা।

ওদেরও তাই ছিল। ধোপানী কাপড় কাচত, তাঁতী কাপড় বুনতো, দোকানী খদ্দের আপ্যায়ণ করত। বিকেলে খানা-পিনা-গানার আসর বসত, নেচে হেসে দিনটা কাটিয়ে দিত। কিন্তু বাদ সাধলেন দেবদূতেরা। ত্রয়োদশ শতকে রোম থেকে

পোপ তৃতীয় ইননোসেণ্ট একজন দূত পাঠালেন বিলেতে, দূতের সঙ্গে একটি চিঠির কপি। বক্তব্য: চতুর্থ কমাণ্ডমেণ্ট অমান্য করো না। রবিবার প্রভুর দিন। এদিনে সব কাজ কর্ম আমোদ আহ্লাদ বন্ধ রাখা চাই। নয়তো তোমাদের মাথায় পাথর বৃষ্টি হবে, ফলের বাগিচা সব শুকিয়ে যাবে, বর্বরেরা এসে দেশ দখল করবে। যেন তাতেও যথেষ্ট হয় না, পত্রে পুনশ্চ দিয়ে আরও বলা হল—অদ্ভুদ এক জন্তু এসে মেয়েদের বুক ছিঁড়ে দিয়ে যাবে। চিঠিটা নাকি স্বর্গ থেকে ঝরে পড়েছিল জেরুসালেমের চার্চের বেদীতে। এ চিঠি মিথ্যা হতে পারে কখনও? সুতরাং নরফোক-এ ধোপানীর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জন্তু। সঙ্গে সঙ্গে দেশময় দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি—ঝাঁপ ফেল, ঝাঁপ ফেল!

ইংরাজেরা সেই থেকে রবিবার ঝাঁপ ফেলেই আছে। অফিস আদালত দোকানপাট তো বটেই, প্রাণদায়ী পানশালা, থিয়েটার, গানের আসর, ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধূলা সব বন্ধ। বন্ধ, তবে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র নয়। লণ্ডন শহরেও কোন কোন এলাকায় রবিবার কিছু কিছু দোকান খোলা থাকে, সিনেমা আছে, টেলিভিশন চালু থাকে। একটু খুঁজে নিলে আমোদ এখনও সম্পূর্ণ দুর্লভ নয়। সেটা কি ঠিক? ছয়শ' বছর আগেকার সেই চিঠিটির কথা কি এখনও ভুলে থাকব আমরা? প্রশ্ন তুলেছেন কিছু ধর্মপ্রাণ ইংরেজ। ১৯৬৮ সনে আবার তাঁরা পার্লামেণ্টে 'বিল' উত্থাপন করছেন একখানা—রবিবারকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া চাই। রবিবার ইজ রবিবার। সেদিন কিচ্ছু করা চলবে না।

এই 'বিল'টির ভবিষ্যৎ এখানে বসেই অনায়াসে অনুমান করা যায়। কেন না, রবিবারের নামে ছয়শ' বর্ষব্যাপী লড়াইয়ের কাহিনী জানিয়ে গেছে—ধরে এনে মাথা মুড়িয়ে দিলেও এই 'গরীব ঘরের মেয়েটির' বুক থেকে ছুটির উত্তেজনা কোন দিন কেড়ে নেওয়া যাবে না। মাথা মুড়িয়ে দেওয়াটা বাড়াবাড়ি কোন কথা নয়।

তার চেয়েও অনেক বেশি নিগ্রহ ভোগ করেছে বেচারা। নিকোলাস রুডক বয়সে তরুণ। ক্যাথরিণ কেংকার সুদর্শনা তরুণী। রবিবার পালন সূত্রেই দুজনের আলাপ কোন এক চার্চে, কোন এক রবিবার। পরিচয় থেকে ক্রমে প্রণয়। তারপর আর এক রবিবার চার্চ ফেরার পথে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা। দুয়ার বন্ধই ছিল, তবু ওরা ধরা পড়ে গেল। ক্যাথারিণই ধরিয়ে দিল। ওর দেহ বিশ্বাসঘাতকতা করল। তার দিকে তাকিয়ে বুড়ো যাজক নাকি বুঝে গেলেন—প্রণয় ফলপ্রসূ হতে চলেছে। সুতরাং শাস্তি নির্দিষ্ট হল—প্রকাশ্য জনপথে চাবুক মারা হোক ওদের। তাই করা হল। আশ্চর্য, রবিবারের আত্মা তবু হার মানে না। শতকের পর শতক নির্মম আক্রমণ চালানো হয়েছে এই দিনটিকে করুণ বিষন্ন এবং প্রাণহীন করবার জন্য। কিন্তু গরীবের 'হলিডে' থেকে 'আই'কে সরিয়ে তবু কিছুতেই 'ওয়াই' বসানো যাচ্ছে না।

যাজকেরা তো বটেই, চেষ্টা রাজাও কম করেননি। রাজা জন-এর আপত্তি ছিল জবরদস্তিমূলক 'লর্ড'স ডে' পালনে। লোকেরা জোর করে রবিবার অন্যদের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে শুনে তিনি তাদের পাকড়াও করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাই শুনে ধার্মিকদের সে কি মন খারাপ, নিশ্চয় রাজাকে শনিতে পেয়েছে, অর্থাৎ শয়তানে। পাপী রাজা, অতএব প্রজারা তো পাপী হবেই। রটে গেল—রবিবারে এক গেরস্থ বৌ পুডিং বসিয়েছিল সোমবারের আগে সেটা কিছুতেই জমল না। একজন কেক তৈরী করেছিল, কামড়াতে গিয়ে দেখল নাক থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে! ইত্যাদি। এসব শুনে ঘাবড়ে গেলেন রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড। তিনি বললেন—রবিবারে ফুটবল টেনিস সব বন্ধ রাখতে হবে। সপ্তম হেনরী—হাটবাজার মেলা বন্ধ করলেন। অষ্টম কিঞ্চিৎ উদার। তিনি বললেন—কাজের লোক ঘরে বসে কাজ করলে আমার আপত্তি নেই। মেয়েরা নিজের চরকায় তেল দিক, বাইরে গিয়ে নাচানাচির

চেয়ে সেটা ভাল। কুইন মেরী বললেন—বাইরে যেতেই হবে, রবিবার চার্চে না গেলে মাথাপিছু জরিমানা বারো পেনি। বারো পেনি তখন তাঁতীর একদিনের রোজগার। রানী প্রথম এলিজাবেথ এত দজ্জাল নন, তিনি নিজে একটু আমুদে প্রকৃতির। রবিবার তাস খেলতেন। অন্য আমোদ আহ্লাদেও দিব্য রুচি ছিল তাঁর। চারটি ছেলেমেয়ের জনক এক গৃহস্থ তাঁর কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন—আমি গরিব মানুষ। হপ্তাভর খাটি। রবিবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতে খেলাধূলার অনুমতি পেলে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। রানী বললেন—তথাস্তু।

বলা চলে, রাজা রানীরা গড়ে মোটামুটি মধ্যপন্থার পথিক। কিন্তু শোধনবাদীরা (বর্তমান অর্থে নয়) কোন আপসেই রাজী নন। অবশ্য 'রবিবার বাঁচাও' আন্দোলনের একজন নায়ক রাজাদের কড়াকড়ি থেকে ছুটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন —রাজারা মর্তে ঈশ্বরের প্রতিভূ। একদিক থেকে তাঁরাও ঈশ্বর। সুতরাং মানুষের পক্ষে যা অবশ্য কৃত্য রাজার পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। 'ছুটি মানে ছুটি' আন্দোলনের সমর্থকরা, বলা নিষ্প্রয়োজন, এ যুক্তি শুনে হেসেই খুন। প্রথম জেমস ১৬১৮ সনে অনেক ভেবেচিন্তে প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত নির্দেশাবলী,—'বুক অব স্পোর্টস।' রবিবার কী চলবে, কী চলবে না—তার ফর্দ প্রণয়ন করলেন তিনি। দেখা গেল, 'শাস্ত্রীয়' রবিবার যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁরা বিশেষ কিছু পাননি, রাজকীয় সহানুভূতি যেন 'অ্যাজ ইউ লাইক'-এর দিকেই বেশী। দেশে তুমুল হৈ-চৈ। প্রথম চার্লস পুঁথিটি পুনর্মুদ্রণ করলেন। হয়ত সে পাপেই তাঁর মাথা কাটা গিয়েছিল। তা যেতে পারে বই কি! এমন কথাও শোনা গেছে ১৫৮০ সনে দেশে যে ভূমিকম্প হয় তার জন্য দায়ী এই যদৃচ্ছ রবিবার পালন। এই অপরাধের জন্য কী কী শাস্তি হতে পারে একজন যাজক অনেক খুঁজে পেতে

তারও একটি ফর্দ তৈরী করেছেন। সে পেনাল-কোড এ পঞ্চান্ন রকম সাজার ফতোয়া।

রাজার আমলে তবু রবিবারটা একরকম কেটে যেত। কিন্তু বিপ্লবের পরে তা যেন আর কাটাতেই চায় না। ক্রমওয়েল্স ক্রিসমাস ইস্টার সব বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরে রাখলেন লর্ডস-ডে। সাবাথ-এর দিনে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ভ্রমণ করলে জরিমানা দশ শিলিং। কাজ করলে—পাঁচ শিলিং। খেলা-ধূলায় মাতলে—পাঁচ শিলিং। ক্রমওয়েলের এই দশমিক আইনের উদ্দেশ্য কী তিনিই জানেন। দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে ফিরে আসার পর তাঁর শিক্ষক নাকি বলেছিলেন—ইওর ম্যাজেস্টি, গুরুবার নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না, গুরুর কথা শুনুন। সাধারণ লোক যদি রবিবার একটু আমোদ আহ্লাদ করে তবে তাতে আপনারই সুবিধা। ওরা দলাদলি করার সময় পাবে না, বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকবে না। রাজা গুরুবাক্য শুনেছিলেন। পার্লামেন্ট, প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত তখন রবিবার খোলা। 'পবিত্র রবিবার'-এর রক্ষীদল বললেন—ঘোর কলি!—ঘোর কলি! তাঁরা পার্লামেন্টে একটি 'বিল' পেশ করলেন। সে 'বিল'কে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এম-পি-দের মধ্যে এমন 'পাপী' খুঁজে পাওয়া ভার। সুতরাং বিষণ্ণ বিমর্ষ রবিবারের নকশা পাস হয়ে গেল। বাকি শুধু রাজার সই। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার—ঠিক তখনই কাগজখানি উধাও। সে কাগজটি এখনও নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি!

আধুনিককালে রবিবার হননের চেষ্টা আরও সুসংগঠিত, সংহত। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ছয়জন ধর্মপ্রাণ তরুণ গঠন করলেন এক প্রতিষ্ঠান। বাংলার নাম দেওয়া যায় আচার—'আচার শিক্ষক দল।' চুয়াল্লিশ বছরে তাঁরা এক লণ্ডন শহরেই এক লক্ষের চেয়েও বেশী 'পাপীকে' সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্রমওয়েলের আমলে

নাকি স্থির হয়েছিল ঘরে কে কীভাবে রবিবার যাপন করছে তা তদন্তের জন্য দরকার হলে সরকারী লোক প্রজাদের ঘরে উঁকি দিতে পারবে। আমুদে দ্বিতীয় চার্লস-এর বেরসিক রানীও নাকি রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন—রুটি কারিগরদের বাড়ী থেকে পুডিং পাই বের হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য। নবীন সোসাইটি নিজেরাই গুপ্তচরের ভূমিকা নিল। কে কোথায় কবেকার কোন আইন অমান্য করছে তা বের করার জন্য সে কী উদ্যম। ইনফরমারা নাকি সেই থেকেই আরও ঘৃণ্য। লোকেরা ওদের বলত—'টাইগারস্ অব পিস'। ওরা 'রিফরমার' নয়, লৌকিক পদ্যে নানা ব্যঙ্গ ওদের নিয়ে, যথা—'রি'স্থানে 'ইন' পড়!

ক্রমে আরও সম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন আসরে। উইলিয়াম উইলবারফোর্স মানবতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের মুক্তির জন্য তাঁর সংগ্রামের কাহিনী সকলের জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না রবিবারকে শৃঙ্খলিত করার জন্যও সমান পরিশ্রম করে গেছেন তিনি। তাঁর নামে গরিব ঘরের ওই মেয়েটির নাকি এখনও মুখ শুকিয়ে যায়, বুক কাঁপে। রবিবারের ইতিকথায় তুল্য প্রাতঃস্মরণীয় আর একটি নাম—সার এনড্রু অ্যাগনু্য। তিনি ১৮০২ সনে প্রতিষ্ঠিত আর এক 'শুদ্ধ রবিবার' আন্দোলনের নেতা। তাঁর কবরে লেখা আছে একটি মাত্র ছত্র—'অবজারভ লর্ডস ডে।' খ্যাতিমান এবং কীর্তিমান অবশ্য অদ্যাবধি জীবন্ত বিখ্যাত 'লর্ডস ডে সোসাইটির' নায়ক মার্টিন সাহেবও। এ কালের মানুষ তিনি। মারা গেছেন মাত্র ক'বছর আগে, ১৯৫৪ সনে। একালে থিয়েটার বন্ধ থেকে শুরু করে নানা রবিবাসীয় ব্যবস্থার জন্য দায়ী তিনি। পার্কে রবিবারে যাতে ছোটদের দোলনা দেওয়া না হয় সেজন্যও চেষ্টা করে গেছেন তিনি। একবার পার্লামেণ্টে কঠোর রবিবারের জন্য গণস্বাক্ষর সমেত দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন মার্টিন। সে দরখাস্ত লম্বায় দশ মাইল। খবরের কাগজ নাম দিয়েছিল তাঁকে 'মিজারী

মার্টিন।' সমান দুঃখী তাঁর উত্তরাধিকারী হ্যারল্ড লিগারটন। কর্মঠ মানুষ। মিনিটে দুশ শব্দ বের হয় মুখ দিয়ে। টেলিভিশনে দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু রবিবারে তবুও হায়, অপরিবর্তিতই থেকে যায়। চার্চ বাঁয়ে রেখে পিঠে বান্ধবী ফেলে পবনের বেগে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে চলেছে একালের তরুণ। কোথায়, কীভাবে রবিবারে পালন করবে ওরা কে জানে?

এ পতনের জন্য কালের হাওয়া অবশ্যই দায়ী। কিন্তু আগেই বলেছি, বিদ্রোহ সেকালেও অজ্ঞাত ছিল না। সোম মঙ্গল বুধ সবাই জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আসে, গরিব ঘরের মেয়ে রবিবার আসে পায়ে হেঁটে—পুরো ছয়দিনের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি নিয়ে। তাকে কেউ কেবল ধর্মকথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে? অথচ ওদের দাবি তাই। সকালে চার্চ, বিকেলে চার্চ, ফাঁকে ফাঁকে চার্চে শোনা কথাগুলি নিয়ে নিবিষ্ট মনে জাবর কাটা। রবিবারে এমন কি উনুন ধরানো পর্যন্ত মানা। গরিবরা বলল—তবে যে বড়মানুষরা অন্যরকম করছেন, তার বেলা? লর্ড স্যানডান নামে এক মস্ত মানুষ উত্তর দিয়েছিলেন তার। তাঁর কুখ্যাত উক্তি—ধনীদের আমোদ তাদেরই ব্যাপার, গরীবদের আমোদ প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র সমাজে।—তাই বুঝি? গরীবদের সে কি হাসি। চার্চ থেকে বেরিয়ে দুই সঙ্গী মাঠে বেড়াতে চলল। পাহারাওয়ালা বলল—হয় ঘরে ফিরে যাও, না হয় ছয় পেনি জরিমানা দাও।—তাই দিচ্ছি বাবা, গরিবের মেয়েরা খুঁট থেকে পয়সা বের করে গুনে দিল,—সারা সপ্তাহ ধরে পয়সা বাঁচিয়েছি তো তোমারই জন্য!

ওঁরা যদি কেতাব ছড়িয়েছেন বাজারে, ছড়িয়েছেন তবে এঁরাও। এক বছর ২৮০টি বই পোড়ানো হয়েছিল। কারণ তাতে স্বাধীন রবিবারের পক্ষে সওয়াল ছিল। ওঁরা গুপ্তচর সেজেছেন। সেজেছেন এরাও। এনড্রু সাহেবকে নাজেহাল করার সে কি চেষ্টা। এনড্রু বক্তৃতা করেছিলেন পার্লামেন্টে-এ। একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে

বললেন—ইহা কী সত্য যে, মাননীয় সদস্য ওমুক তারিখে শনিবার রাত্রে বারোটা বেজে তিন মিনিটে ওমুক হোটেলে এক-খানা মটন চপ-এর অর্ডার দিয়েছিলেন? এনড্রু, বলা নিষ্প্রয়োজন, অতঃপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি গোড়াকাটা গাছের মত ধপ করে পড়ে গেলেন। আর একবার পার্লামেণ্টেই কথা উঠল,—ইহা কী সত্য আপনি গত রবিবার রাত্রে ঠাণ্ডা মাংস গরম আলু দিয়ে খেয়েছেন? প্রশ্ন শুনে মূর্তিমান নৈতিকতা এনড্রু আলুথালু।

কাল স্বাধীনপন্থীদের আরও সাহসী করে তুলেছে মাত্র। রেল এল। দাবি উঠল রেল রবিবার বন্ধ রাখতে হবে, স্কটল্যাণ্ডে রবিবার ট্রাম বন্ধ রাখা হয়। খবরের কাগজের লোক বেরিয়ে পড়ল—চারদিকে। খনি মালিকের মুখের ওপর প্রশ্ন: আপনার খনি কি রবিবার বন্ধ থাকে?—অবশ্যই। একমাত্র পাম্প কাজ করে। কাগজে বের হল এ জাতীয় অসংখ্য খবর। রেল বাঁশি বাজাল। কথা উঠল ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইত্যাদি রবিবার খোলা রাখা দরকার। প্রবল আপত্তি দিকে দিকে। কিন্তু আপত্তি টিকল না। ১৮৯৬ সনে দুয়ার খুলে দিতে হল। একজন বিশপ বললেন—রবিবার কাগজ ছাপা ঘোরতর পাপ কর্ম। টাইমস লিখল—নিউইয়র্কের কাগজ খোলা। দেখবে ওর শুধু কাগজ নয়, কাগজে সুন্দরী মেয়েদের নানা কর্মকাণ্ডের ছবিও ছাপছে। শুধু ছবি নয়, রঙীন ছবি পর্যন্ত। আর একবার রবিবার-ঘাতক একটি 'বিল' সম্পর্কে লিখেছিলেন ওঁরা—ওই কাগজটিতে চমৎকার 'ফুলস ক্যাপ' হয়, যাকে বলে—গাধার টুপি!

হাওয়া যেখানে এমন সেখানে রবিবারের ভূত যাই হোক, ভবিষ্যত যে উজ্জ্বলতর সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রাজা প্রজা উভয়েরই মতি আজ অন্য দিকে। ডিউক অব এডিনবরা রবিবারে পোলো খেলেন। তস্য পত্নী ইংলণ্ডের রাণী

দ্বিতীয় এলিজাবেথ বসে বসে তা-ই দেখেন। শুধু তাই নয়, খেলার মাঠ থেকে ফিরে ওই রবিবারেই দুইজন রুশ রাষ্ট্রনায়ককে আপ্যায়ন করেন। 'রবিবার বাঁচাও' কমিটি খবর শুনে মর্মাহত। প্রকাশ্যে তাঁরা ডিউক এবং রানীকে তিরস্কার করেছেন। এখনও সনিষ্ঠায় ওঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের যুদ্ধ। কিন্তু ওঁরা যে হারলেন বলে, পূবের এই পাপী স্বচক্ষে তা দেখে এসেছে। সেদিনই প্রথম রবিবাসরীয় ক্রিকেট। বিখ্যাত একটি বিলাতী কাগজের ফটোগ্রাফার রিপোর্টাররা চলেছেন মাঠে। সঙ্গে এই তৃতীয় পক্ষ। সকলের আশঙ্কা কোন লঙ্কাকাণ্ড হবে।—কিন্তু কই, যুদ্ধ কোথায়? বুকে প্রতিবাদলিপি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বয়স্ক কয়েকজন নারী এবং পুরুষ। তাঁদের পাশ কাটিয়ে একাল টিকিট কাটছে, হাসতে হাসতে যে যার আসনে গিয়ে বসেছে। একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল—আচ্ছা, কাজটা কী ঠিক করলে? কেন, বেঠিক কী দেখলে—এর চেয়ে নির্দোষ, সাত্ত্বিক, নিরামিষ, রবিবার-যাপন আর কী হতে পারে?

সাত শ' বছর পরে সেই ধোপার মেয়ের মত একই কথা একালের সাধারণ ঘরের মেয়ের মুখে।

এবার কিছু সাংস্কৃতিক সমাচার।

প্রথমে খবরের কাগজের খবরাখবর দিয়েই শুরু করা যাক।

শুরু লাডগেট সার্কাস-এ, শেষ টেম্পল বার-এ। সিকি মাইল রাস্তা। রাস্তাময় লাল বাস, কালো ট্যাক্সি, হলুদ ভ্যান, বাদামী গাড়ি আর সাদা মানুষের হুড়োহুড়ি। শহর লণ্ডনে এ দৃশ্য অভূতপূর্ব নয়। তবুও মন্থর হয়ে যায় ট্যুরিস্ট কোচগুলো, জানালা দিয়ে উঁকি দেয় রাশি রাশি কৌতূহলী মুখ। ফুটপাথে দাঁড়িয়েই দেখা যায় মুখের কাছে মাইক্রোফোন নিয়ে চোখ বুজে বক্তৃতা করে চলেছেন গাইড। না শুনেই বলা যায় যাত্রীদের কী বলছেন তিনি বাঁ-দিকে আঙুল তুলেছে না এইমাত্র লোকটি? নিশ্চয় তবে বলছে—ওই দেখ, কোণের বাড়িটার দেওয়ালে লেখা আছে ফ্লীট স্ট্রীট, ই. সি. ফোর। এই সেই ফ্লীট স্ট্রীট, সাংবাদিকের মক্কা, সংবাদপত্রের আপন ভ্যাটিক্যান, অ্যাভেন্যু অব অ্যাডভেঞ্চার ..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম ষাট মিনিট সত্যিই যেন রূপকথার রাজ্যে। 'আইরিশ্ ইনডিপেনডেনট' পেছনে পড়তে না পড়তেই সামনে বিভারব্রুক-এর কালো কাচের মস্ত প্রাসাদ,—'ডেইলি এক্সপ্রেস আর 'সানডে এক্সপ্রেস। ক'কদম পরেই 'বার্মিংহোম পোস্ট', 'দি স্কটসম্যান', 'বক্সিং নিউজ' (উক্ত কলা বিষয়ে নাকি একমাত্র কাগজ)।

এখান থেকে তাকালে আকাশ আর 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর চূড়া দেখা যায়। বাঁয়ে নাতিদীর্ঘ আর একটি রাস্তা, ব্যুভারী স্ট্রীট। সেখানে 'ওয়াণ্ডার অব দি-ওয়ার্ল্ড'—জগতের বিস্ময় (বিক্রি হয় কমপক্ষে ৬২৫১৩১৬ কপি) 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড'; (ফ্লীট স্ট্রীটের সদাচারীরা রসিকতা করে বলেন, 'নিউজ অব দি আণ্ডার ওর্য়াল্ড'!) রাস্তার উলটো দিক থেকে তার দিক থেকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে—'পাঞ্চ'। ওপাশে হোয়াইট ফ্রেয়ার স্ট্রীটে—'ডেইলি মেল', ডাইনের মোড়ে—'ডেইলি স্কেচ'। ভ্যান ছুটছে, লরি থেকে নিউজপ্রিন্ট নামছে, লোকেরা হাঁটছে, বার-এর দরজাগুলো ফাঁক হয়েই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, ফ্লীট স্ট্রীট তবুও যেন কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। ফুরোতে চাইছে না। নিউজপ্রিন্ট-এর রীলের মতই অফুরন্ত এই আপাত নীতিদীর্ঘ পথ। গলির পর গলি। থেকে থেকেই চেনা-অচেনা নামের প্লেট।

অনেকটা আমাদের কলেজ স্ট্রীটেরই মত। ফ্লীট স্ট্রীট একটি রাস্তা হলেও আসলে একটি রাজ্যের নাম। সে রাজ্য সিটি অব্ লণ্ডন-এর মানচিত্রে অনুল্লেখিত। কিন্তু পথিক দ্বিতীয় ঘণ্টায় মনে মনে জেনে যান টমসন সাহেবকে 'ব্যারন টমসন অব ফ্লীট' বলা হয় কেন। ফ্লীট অনায়াসে একটা শায়ার বা কাউন্টি'র নাম হতে পারত। লাডগেট সার্কাস-এর ওদিকে ব্ল্যাকফ্রায়ার স্টেশনের অদূরে বিখ্যাত প্রিন্টিং হাউস স্কোয়ার,—'দি টাইমস', এবং 'দি অবজারভার' দুই প্রবীণের পীঠ। (প্রথমটির বয়স যদি বয়স যদি ১৮৫ বছর হয়, তবে রবিবাসরীয় কাগজ 'অবজারভার'ও ১৮০)। ঘুরে এসে আবার এ পাড়ায় ঢুঁ দিতে হবে। ক'মিনিট হাঁটলেই সু লেনের কোণে লণ্ডন-এর দুই সান্ধ্যের অন্যতম 'ইভিনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' অফিস; রাস্তার ওপারে——'মর্নিং অ্যাডভারটাইজার'। এক শ' গজ দূরে হোবর্ন-এ 'রাজার রাজা' সিসিল কিং-এর মায়াপুরী—'মিরার' অফিস। সিসিল কিং

অবশ্য এখন আর 'রাজা' নন। তাঁর প্রসাদে 'ক্য' হয়ে গেছে। কিং সিংহাসনচ্যুত। কিন্তু 'মিরার' এখনও নাকি চকচকে দর্পণ। (সতেরটা না সাতাশটা রোটারী একসঙ্গে কাগজ ছাপে, দৈনিক বিক্রি ৫০ লাখের ওপর।) রাস্তা পেরিয়ে ক'কদম এগোলেই গ্রে'স ইন রোড,—টমসন সাহেবের কুঠি; 'সানডে টাইমস', গার্ডিয়ান। তার চেয়েও বড় কথা এ-বাড়িতেই দিগ্বিজয়ী ক্যানাডিয়ান টমসন-এর রাজধানী। 'টাইমস' এ হাত দেওয়ার পর সত্তর উত্তীর্ণ এই প্রবীণ সম্রাট ১২৬ খানা দৈনিকের মালিক হয়েছেন। তার ওপর আছে শ' দেড়েক ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ইত্যাদি।—ওঃ আমি জানতাম না, টমসন ম্যাগাজিনের কারবারও করেন। আমার আছে শ' আড়াই।—একসময় সগর্বে বলেছিলেন সিসিল কিং। টমসন-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি। তিনি বলতেন—টমসন-এর নিজের কোন গুণ নেই, তবু যে তিনি সফল হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ 'ডেভিলস ওন লাক্', স্রেফ কপালের গুণ। কিং থাবা বাড়িয়ে ওডহাম প্রেস কেড়ে নিয়েছিলেন টমসন-এর হাত থেকে। কারণ কিছুই নয়, ওঁকে একটু জব্দ করা। কথা পাকা হওয়ার পর টেলিভিশন-এ মুখ খুলেছিলেন টমসন। প্রশ্ন করা হল—আপনি যে এভাবে খবরটা প্রকাশ করছেন ভয় করছে না? যদি আসরে অন্যরা এসে হাজির হন। ওডহাম প্রেসের সঙ্গে আমার বিয়ে ভাঙবার মত নয়,— উত্তর দিয়েছিলেন টমসন। সিসিল কিং টেলিভিশন দেখছিলেন। ব্রিটেন-এ তাঁর কাগজ আছে এক ডজন, বাইরে প্রায় আরও এক ডজন। তার ওপর অসংখ্য ম্যাগাজিন জার্নাল, কুড়িটা প্রকাণ্ড ছাপার কারখানা, বই ছাপার কোম্পানি, নিউজপ্রিন্ট কারখানা ইত্যাদি ইত্যাদি। টমসন-এর কথা শুনে তিনি হাসলেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? পরের দিন সত্যিই আসরে হাজির হলেন কিং। খরচ হল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ওডহাম প্রেস

তাঁর হল। কিং প্রকাশ্যেই বলেন—টমসনকে ভাল লাগে না তাঁর। যাঁরা এসে বলেন আমার একমাত্র লক্ষ্য টাকা করা তাঁদের আমি পছন্দ করি না। কী দিয়েছেন টমসন আমাদের? তাঁর একমাত্র অবদান, যদি কিছু থাকে, তবে সে তাঁর নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট-এ!

কে বড়, টমসন না সিসিল কিং—মনে মনে যখন সে তর্ক চলছে তখন হঠাৎ মনে পড়বে—এই যাঃ, 'সান' অফিসটা তো দেখা হল না! দেখা হয়নি 'নিউ স্টেটসম্যান', 'ইকনমিস্ট' এই দুই জনতা-অনাদৃত (প্রচার সংখ্যা দুইয়েরই আশী হাজারের নীচে), অথচ জনতাকারবারী সমাদৃত কাগজের বাড়ি দুটি। দেখা হয়নি একমাত্র রঙীন কাগজে ছাপা দৈনিক 'ফিনানসিয়াল টাইমস'-এর আস্তানাটিও। তারপরও বাকি রয়ে গেছে আরও কত কী। ১৩০টি দৈনিক কাগজ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, বৃহত্তর লণ্ডনেই সাপ্তাহিক কাগজ আছে ৯৩২ খানা, তার ওপর দেশময় সাড়ে চার হাজার রকমারী ম্যাগাজিন এবং জার্নাল। ফ্লীট স্ট্রীট তাদের ঠিকানা অথবা নিশানা। সুতরাং, দ্বিতীয় ঘণ্টা শেষে ক্লান্ত দর্শক যখন কোন কফি-বার-এ বসে পেয়ালার চুমুক দিয়েছেন তখন তাঁর মুখ থেকে একটাই সিদ্ধান্ত আশা করা যেতে পারে: ফ্লীট স্ট্রীট অরণ্য।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যান সেখানেও একই ব্যাপার, ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। মস্ত হলময় ছড়িয়ে আছে সার সার টেবিল চেয়ার,—নিউজরুম। সোনালী চুলে হেডফোন খাটিয়ে খুটখুট টাইপ করে যাচ্ছেন মেয়েরা, বাইরের রিপোর্টাররা খবর পাঠাচ্ছেন ফোনে, ওঁরা তাই টুকে নিচ্ছেন। এ পাশে নিউজ-ডেস্ক, নিউজ এডিটর এবং তাঁর সহকারিবৃন্দ। ওপাশে হেড-সাব। ওদিকে বৃহৎ নাতিবৃহৎ, ছোট—নানা সাইজের ঘর। কিংবা বেড়া-দেওয়া স্বতন্ত্র এলাকা। ফরেন ডিপার্টমেণ্ট, স্পোর্টস ডিপার্টমেণ্ট, ফীচারস ডিপার্টমেণ্ট, লিটারারি সম্পাদক, ঘোড়-দৌড় লেখক, ফ্যাশন-বিভাগ, ক্রসওয়ার্ড পাজল দফতর···আর্টিস্ট, ফটোগ্রাফার,

কার্টুনিস্ট এবং আরও নানাবিধ প্রাণীদের ঘর। বিরাট বিরাট মগ ভরতি চা আসছে, প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট পুড়ছে। থেকে থেকেই চেয়ার শূন্য হয়ে যাচ্ছে,—লোকেরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন মুখ আসছেও। একজন স্থানীয় অফিসার ঘুরে এসেছেন, হেড-সাবকে জিজ্ঞেস করছেন—জায়গা দিতে পার কিছু? (মনে ভাবখানা, না পারলেই বাঁচি)। হঠাৎ নিউজ এডিটার-এর টেবিলে এডিটার-এর আবির্ভাব, ফিস ফিস দু'চারটি কথা। নিউজ এডিটার আর একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সামনের দিকে তাকালেন। সামনে ইতঃস্তত দাঁড়িয়ে আছে কপি-বয় অথবা কপি-গার্লরা। তাঁদেরই একজনকে কাছে ডাকলেন তিনি।—ওগো রূপসী, ওখানে দাঁড়িয়ে করছ কী? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে। চা লাগাও। ডার্লিং, খুব তাড়াতাড়ি, কেমন? (এই সব কথা বলতে বলতেই একটি বিখ্যাত দৈনিকের বিখ্যাত বার্তা-সম্পাদক আমার দিকে ঘুরে বলেছিলেন—জান, একদিন আমিও এদের মতই ছিলাম। সাংবাদিকতা শুরু করেছিলাম কপি-বয় হিসাবে।) টেলিপ্রিণ্টার, টেলিফোন, চায়ের পেয়ালার ঠুনঠুন···টাইপরাইটার, হাঁক ডাক, জুতোর শব্দ, অনুচ্চ রসিকতা, সব মিলিয়ে ফ্লীট স্ট্রীটের ভেতরেও বাইরেরই আবহাওয়া। যেখানে তা নেই, যথা 'মিরার' কার্যালয়, কিংবা 'টমসন হাউস',—সেখানেও শব্দনিরোধক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার আক্ষেপ—দূর, এ আবার কাগজের আপিস নাকি! ছেঁড়া কাগজ, কালির ছোপ আর হৈ-হট্টগোল না থাকলে কাজে কখনও মন বসে? যে অফিসে 'মগজের আড়ত' বলে জনশ্রুতি (যথা: 'টাইমস'। সেখানে নাকি কুয়ালালামপুরের সঠিক বানান জানার জন্য একজন সাব-এডিটারকে সারাদিন ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এ বসিয়ে রাখা হয়। সাব-এডিটার বসে বসে প্রুস্ত-এর অনুবাদ করলে কেউ তাঁকে কিছু বলেন না।)

'টাইমস'-এর সাংবাদিকতা সম্পর্কে জর্জ মিকেস-এর একটি রচনা আছে। প্রসঙ্গত সারটুকু এখানে শোনানো যেতে পারে।

মূল সংবাদ ছিল—চারামাক নামে প্রশান্ত সাগরীয় একটি দ্বীপে বুবুরুক নামে উপজাতির বিদ্রোহ। ক্যাপ্টেন আর. এল. এ. টি. ডব্লিউ টিলবারি নামে ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে দশজন ইংরাজ এবং দুইজন আমেরিকার সৈনিক তাদের দমন করে। ২১৭ জন বিদ্রোহী বন্দী হয়! দুটো তেলের ট্যাঙ্ক ধ্বংস।

টাইম লিখবে—এই আক্রমণের ঘটনাকে বাড়িয়ে দেখা যেমন অত্যন্ত বিপজ্জনক, ঠিক তেমনই বিপজ্জনক একে অবহেলা করা। আমাদের সাফল্য যেমন একদিকে প্রমাণ করে নেটিভদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি ক্রটিহীন ছিল না, অন্য দিকে এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে ওরা আত্মরক্ষায় সব সময় অসতর্ক।...ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'টাইমস' যে কী বলতে চায় তা বোঝা শক্ত।

পার্লামেণ্টে 'হার ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্ট-'এর পক্ষ থেকে সমান হাস্যকর একটি বিবৃতি দেওয়া হল। কাগজের আলোচ্য বিষয় অতঃপর ক্যাপ্টেন টিলবারি। তিনি বেজওয়াটার-এর আর্ল-এর পঞ্চম সন্তান। এক সময় অক্সফোর্ডের ব্লু ছিলেন—ইত্যাদি। সাংবাদিক লিখবেন—কাল একটা আসরে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিন বলছিলেন—রিগি (ওঁর ডাক নাম) যুদ্ধবিগ্রহে সব সময়ই অতি উৎসাহী।

ঘটনার জের এখানেই শেষ হল না। দুদিন পরে 'টাইমস'-এ প্রকাশিত হল একটি চিঠি। বক্তব্য—এই চারামাক দ্বীপেই বিখ্যাত ইংরাজ কবি জন ফ্ল্যাট লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দি কড'। সেটা ১৬৯৩ সনের রচনা।...পরদিন আবার চিঠি,—'দি কড' কবিতাটি আসলে শেষ হয় ১৬৯৪ সনের জানুয়ারিতে।

এই সব পড়ে আমেরিকার 'দি ওকলাহামা সান'-এর সংবাদদাতা তার পাঠাল স্বদেশে—'ইয়াংকস কংকার প্যাসিফিক ওসান।'

সে যা হোক আজ নিউজরুম-এ কোলাহল এমন কি সেখানেও। একজন স্পষ্টই বললেন—যে-সব কাজ নিঃশব্দে করা যায় খবরের কাগজ ছাপা তার মধ্যে পড়ে না ভাই!

এমন অরণ্য ফ্লীট স্ট্রীট তবুও মায়াপুরী যেন। ব্রিটেনের মফঃস্বল শহরগুলোতে কাগজে কাগজে কাজ করছেন যে তরুণ-তরুণীর দল তাঁদের কাছে ফ্লীট স্ট্রীট টেনিস খেলোয়াড়ের কাছে উইম্বলডন-এর মত। 'অ্যাভেন্যু আর অ্যাডভেঞ্চার' 'বুল্যেভার অব ব্রেন', 'হাই স্ট্রীট অব বোহেমিয়া' কত নাম তার। যাঁরা সেখানে আছেন তাঁদের কাছে এগুলো পুরোপুরি অর্থহীন কথা এমনও বলা যায় না। আশ্চর্য মাদকতা এই ফ্লীট স্ট্রীটের। এডগার ওয়ালেস-এর মতই তাঁরাও বলেন—'ওয়ান্স ইউ আর ওয়েড টু ফ্লীট স্ট্রীট, ইউ আর হার্স্ ফর লাইফ!'

রোমাঞ্চের অভাব নেই। নিউজরুম-এ যদি ব্যস্ততা ছাড়া আর কিছু চোখে না পড়ে তবে নিউজ এডিটার-এর সঙ্গে চলে যান সকালের কনফারেন্স-এ। ফর্দ আগেই তৈরী হয়েছে। কোন্ খবরগুলো আসছে, কোনগুলো আসতে পারে, কোনগুলো আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, কোনগুলোকে ইচ্ছে করলে খবর বা ফীচার করা যেতে পারে তার দীর্ঘ তালিকা নিয়ে বার্তা-সম্পাদক মশাই ঢুকলেন কনফারেন্স ঘরে। সম্পাদক, ম্যানেজিং সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, রাজনৈতিক সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক (বা লেখকরা), বৈদেশিক সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, ফীচার সম্পাদক, বিজ্ঞান সম্পাদক—ইত্যাদি সম্ভাব্য সব বিভাগের সম্পাদকরা হাজির। তালিকায় তাঁদের ভাবনাও স্থান পেয়েছে। সবাই নিজ নিজ আসনে বসলেন। যাঁদের সেদিন এডিটারের-এর মুখোমুখি বসার

ইচ্ছে নেই তাঁদের জন্যও বন্দোবস্ত আছে; তাঁরা দু'জন পেছন রাখা দু'টি ইজিচেয়ার দখল করলেন। সভা আরম্ভ হল। বার্তা সম্পাদক ফর্দ ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এডিটাব বললেন—এটা বেশ। নাঃ, ওটা তত সুবিধের হবে বলে মনে হয় না। দেখ জ্যাক,—আমার মনে হয় কৃষি বিষয়ে কাল একটা কিছু দেওয়া দরকার। আচ্ছা, আমিই ব্যবস্থা করব। তুমি কিছু জায়গা রেখো। ...নিউজ এডিটর ফর্দ শেষ করলেন। তারপর চারদিকে তাকিয়ে বললেন—তা ছাড়া দুটি স্পেশাল স্টোরি আছে। এডিটার বললেন —সে পরে শুনব। (স্পেশাল স্টোরি সভায় আলোচনা হয় না। কেননা গোপনীয়তা ফ্লীট স্ট্রীটের ব্যবসায় অন্যতম মন্ত্র।) ফরেন এডিটর বললেন—তাঁর একজন লোক দরকার। নাইজেরিয়ায় গোলমাল হচ্ছে। নিজেদের যে লোক ছিল সে বিছানায় পড়ে আছে। কায়রোয় অবশ্য একজন আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে সেখান থেকে সরানো ঠিক হবে না। এডিটর বললেন—সে তুমি একজন নিউজ এডিটার-এর কাছ থেকে ধার নিয়ে নাও। তোমাদের দু'জনে তো খুব বন্ধুত্ব?—তাই না? প্রায় দেখি একসঙ্গে বার-এ ঢুকছ। পলিটিক্যাল এডিটর বললেন—আমার এবার উঠতে হয়। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে খেতে হবে। ফটো এডিটর বললেন—কিছু এক্সক্লুসিভ ছবি পাওয়া যাচ্ছে।—কিনব?—কত দাম নেবে? কেনার যোগ্য তো? অবশ্য, সে তুমিই ভাল বুঝবে! তবে বেশি টাকা খরচ করে মুশকিলে ফেলো না। জান তো, ম্যানেজমেণ্ট...। সাহিত্য সম্পাদক বললেন—একটা বইয়ের প্রুফ-কপি পড়ছি। বইটি ভাল। ধারাবাহিক বের করতে পারলে ভাল হয়।—এই যাঃ, তুমিও আবার টাকার প্রশ্নে ফেললে যে!—তা, তুমি যখন বলছ ভাল, তখন টাকা খরচ করতে হবে বই কি!...সভা প্রায় শেষ। এডিটার বললেন—এ প্রেট্টি ডাল্ ডে! কিছুই নেই; কী বল?—আচ্ছা তুমি তোমার ফীচার লেখিকাদের দিয়ে একটা কাজ

করতে পার? সে-ই ট্যাবলেটটা নিয়ে কিছু করা যায় না। ওরা নিজেরাও কেউ কেউ খাচ্ছে নিশ্চয়…।

দরকার হয় ব্রিটিশ সংবাদ পত্র সংবাদ 'উদ্ভাবনে'ও রাজি। তাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখেই হামবার্ট উল্ফ লিখেছিলেন—

One cannot hope to bribe or twist
Thank God, the British journalits,
But, seeing what the man will do
Unbribed, there's no occasion to.

'গার্ডিয়ান' অফিসে সভা হয় লণ্ডন আর ম্যানচেস্টার দুই অফিসের মধ্যে! সেখানে আরও মজার কথাবার্তা শুনেছি। ফীচারএডিটার বললেন—কাল ইলেকট্রনিকস নিয়ে যা একখানা ফীচার দিয়েছি। লণ্ডন থেকে এডিটার-এর প্রশ্নঃ কী আছে তাতে?

—দূর; আমিই কি ছাই তা বুঝেছি?

—তবে দিচ্ছ কেন?

—দিচ্ছি, কারণ পড়ে-বোঝা-যায়-না এমন আর কোন 'আইটেম' হাতে নেই! স্নবদের জন্যও খাদ্য চাই বই কি!

আসল কাজ শুরু হল সভার পরে। আদেশ, নির্দেশ, অনুরোধ; টেলিফোনে দিনের কাগজের ব্যবস্থা শেষ করে বিভাগীর কর্তারা চললেন লাঞ্চ এ,—দুপুরের খাবার খেতে। কাছেই একটি পাব-এ বসে বালকবন্ধুর সঙ্গে বীয়ার খাচ্ছিলেন একজন মেয়ে। পাব-ওয়ালা হাঁক দিল—মাদাম, আপনার টেলিফোন। ফরেন এডিটার-এর নির্দেশঃ মর্লি তোমাকে লেগস যেতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় প্লেন,—চটপট রেডি হয়ে নাও! রোমাঞ্চ বই কি! একজন মহিলা রিপোর্টার বলছিলেনঃ আমার হাতের এই থলিটিতে কী আছে জানেন? তবে শুনুন। একটা পাশপোর্ট, প্রেস কার্ড, তিনটে নোটবুক, টেলিফোন-বুক, ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার, একটা

অরেঞ্জ, কিছু অ্যাসপারিন, কিছু সিগারেট, ছোট্ট একটা প্রসাধন-থলি, নানা দেশের কিছু খুচরো পয়সা, জুতো পরিষ্কারের সরঞ্জাম, চেক বই, গ্যারেজ বই, কিছু হ্যাণ্ডসাউট, নিমন্ত্রণ-পত্র, ডাইরী··· ইত্যাদি। এমন বৈদেশিক সংবাদদাতাও আছেন যাঁদের বছরে এক থেকে দুই লক্ষ মাইল উড়তে হয়। বারো মাসের ছয় মাসই কাটাতে হয় বাইরে বাইরে। সব সময় যে অভিজ্ঞরাই যাবেন এমন নয়। সাধারণ রিপোর্টার। লণ্ডনের এখানে ওখানে ঘুরে খবর সংগ্রহই হয়ত তাঁর বরাবরের কাজ। হঠাৎ একদিন স্বয়ং এডিটর-এর ফোন,—তোমাকে জার্মানী যেতে হবে। এবং কাল-ই। —আচ্ছা, তুমি জার্মান জান তো? রিপোর্টার আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে, সে না জানার মতই। তবে আমি মোটামুটি ফ্লেমিশ জানি।—ওঃ ওয়াণ্ডারফুল! তুমি স্প্যানিশ জানো? খুব ভাল। আই উইস ইউ গুড লাক্, চলে যাও। এই ভদ্রলোক আজ লণ্ডনে একজন স্বনামধন্য বৈদেশিক সংবাদ-দাতা। ফ্লীট স্ট্রীট এসব কাহিনী জানে। জানেন বলেই হাতের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে বন্ধুর মুখে একটু চুমু খেয়ে তক্ষুনি নিজের ফ্ল্যাটের দিকে ছুটলেন সেই মহিলা সাংবাদিক। টাইপ-রাইটার নিতে হবে, নিতে হবে একটা হাল্কা বাক্সও। কত দিন পড়ে থাকতে হবে আফ্রিকায় কে জানে? তাছাড়া অফিসেও যেতে হবে একবার। ফরেন এডিটর-এর সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্লেনের টিকিট, ট্রাভেলার্স-চেক ব্যাগে পুরতে হবে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: ফ্লীট স্ট্রীটের সবাই সব সময় বিশ্বময় উড়ে বেড়াচ্ছেন না। 'টাইমস'-এর কথাই ধরা যাক। ওঁদের লণ্ডন অফিসে রিপোর্টার আছেন কুড়িজন, বৈদেশিক সংবাদদাতা সাকুল্যে দুই ডজন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সংবাদদাতা মাত্র—পুরোপুরি নিজেদের লোক নন। তবুও নানা সূত্রে বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রত্যেকটি বড় কাগজকেই রাশি রাশি টাকা খরচ করতে হয়। ডেইলি

টেলিগ্রাফ-এর ফরেন এডিটর-এর বাজেট বছরে ৩ লক্ষ পাউণ্ড!)
তাছাড়া, টুকিটাকি আরও অনেক করণীয়।

বিকেলের প্লেনে সত্যিই নাইজেরিয়ায় চলে গেল একটি মেয়ে। মেয়ে শুনে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সমাজের আর সব অঙ্গনের মত খবরের কাগজের অফিসেও ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে। অবশ্য অনেকে বলেন—ব্রিটেনে নারী এখনও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত। ওঁরা কাজ করেন ঠিকই, দেশের তিন ভাগের একভাগের কর্মী নারী। মোট শ্রমিক ২৫'৩ মিলিয়ন, তার মধ্যে নারী ৮'৯ মিলিয়ন। কিন্তু অনেক অফিসেই পুরুষের চেয়ে নারীর মাইনে কম, ব্যবধান নাকি কোথাও কোথাও সপ্তাহে গড়ে প্রায় তিন পাউণ্ড। অবশ্য কর্মী হিসেবে মেয়েরা কিছু সুবিধাও পান। যথা—ওঁদের রাত্তিরের সিফটে কাজ করতে হয় না। তাছাড়া ওঁরা বিধবা-ভাতা পান-ইত্যাদি। মেয়েরা তবু ক্ষুব্ধ। এমন কি ফ্লীট স্ট্রীটের মেয়েরাও। সবাই তাঁরা সংবাদ-বিভাগে নন। 'টাইমস' অফিসে একজন মাত্র মহিলা রিপোর্টার। তাও অতিসম্প্রতি তিনি সেখানে যোগ দিয়েছেন। ম্যানচেস্টার-এ 'গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্টারদের ঘরে একজনও মেয়ে নেই। কিন্তু অন্যত্র আছেন। সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য নন। খ্যাতিতেও কেউ কেউ রীতিমত স্বনামধন্যা। যথা 'গার্ডিয়ান'-এর সামরিক বিষয় সংক্রান্ত সংবাদদাতা ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ, কিংবা অবজারভার'-এর আর্থিক-সম্পাদিকা—মার্গট নেলর। তারপর জ্যা ক্যাম্পবেল, অ্যান শার্পলি এবং আরও কত নাম। এমন কি মেয়ে কার্টুনিস্ট পর্যন্ত রয়েছেন 'সান'-এ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলারা ফিস ফিস করে বলবেন—ফ্লীট স্ট্রীট আসলে পুরুষদেরই জায়গা। 'আমরা পুরুষদের দুর্গে মান্য অতিথি মাত্র'—বলেছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। এখানে মান স্থির করেছেন পুরুষরা, ভাল মন্দেরও তাঁরাই বিচারক। কোন মেয়ে ভাল লিখছে শুনলে জানবে, সে

পুরুষদের মত লিখবার চেষ্টা করছে। শুধু কী তাই? ফ্লীট স্ট্রীট যে এখনও পুরুষদেরই রাজত্ব সেটা আরও বুঝতে পারবেন যদি একবার এখানকার 'পাব'গুলোতে উঁকি দিলে।

'পাব' একটি নয়, সম্ভবত অগণিত। 'আল্টিস' (অর্থাৎ 'দি রোজ অ্যাণ্ড দি ক্রাউন') 'স্ট্যাব ইন দি ব্যাক' (অর্থাৎ 'হোয়াইট সোয়ান') 'পপস' (অর্থাৎ পপিনস কোর্ট-এর 'রেড লায়ন'), 'বার্নিস' (অর্থাৎ ফেটার লেন-এর 'হোয়াইট হর্স'), 'ফলস স্টাফ' 'এল ভিনো', 'কজারস' ইত্যাদির পরেও রয়েছে বিখ্যাত প্রেস-ক্লাব। দিনের কাজের শেষে সেখানে ফ্লীট স্ট্রীটের প্রাণ-খোলা আড্ডা। পিপের পর পিপে বীয়ার শূন্য হয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় ঘরে লণ্ডনের ফগ, তার মধ্যে ভেসে বেড়চ্ছে নানা খবর, গুজব কিংবা রহস্য-গল্প। কত গুজব এবং উপকথা যে প্রতিদিন জন্মায় ওখানে তার কোন হিসাব নেই। পাশের টেবিল থেকে এক সাংবাদিক শুনছেন এক ছোকরা তাঁর আফ্রিকা-অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছে। তিনি জানেন ঘটনাগুলো ঘটেছিল সব তাঁর নিজের জীবনে, বক্তা এখনও আফ্রিকা চোখে দেখেনি। তবুও প্রতিবাদের ইচ্ছে হচ্ছে না তাঁর। কেননা,—শুধু কথায় এই ভয়ানক জগতে বাস করা যায় না, কিছু উপকথাও দরকার। ফ্লীট স্ট্রীটে 'মাইথোম্যানিয়া' তা-ই একটি চালু কথা। সেখানে অর্থাৎ সেখানকার 'পাব'গুলোতে সবাই রাজা-উজির মারতে পারে, ভারতীয় সাংবাদিককে দাঁড় করিয়ে টোরি কাগজের লেখক সরবে ঘোষণা করতে পারে—ভারত এখনও, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ! (নেহরু নাকি একবার কাকে 'দশটি বব্' দিয়েছিলেন বীয়ার খাওয়ার জন্য!) এ সব আড্ডায় মেয়েরা পুরোপুরি গরহাজির এমন বলা চলে না। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায় জায়গা-গুলো তাঁদের জন্য নয়। কোথাও হয়ত নোটিস—মেয়েরা এখানে দাঁড়াবেন না। কোথাও তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে—পেছনের

দিকে ছোট্ট একটা খুপরি। পরিবর্তন অবশ্য হচ্ছে। কিন্তু পর্যবেক্ষক ঘুরে ফিরে দেখলে অভিযোগ অস্বীকার করতে পারবেন না—ফ্লীট স্ট্রীট এখনও পুরুষের দেশ! মেয়েরা এখনও সেখানে আগন্তুক মাত্র।

আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে পাব-এর টেলিফোনে ঝংকার, কাউকে টেবিলে না পাওয়া গেলে সম্ভাব্য নিকটবর্তী 'পাব'টিতেই খোঁজ করেন বিভাগীয় সম্পাদক (একটি অফিসে দেখেছি নিউজরুম-এর পাশেই নিজস্ব 'পাব'। নাম—'প্রিন্টার্স ডেভিল')। তখন আর উপায় কী? ধরা দিতেই হবে। ফ্লীট স্ট্রীটে ফাঁকি চলে, কিন্তু সব সময় নয়। কেননা সাপ আর মই-এর খেলা চলেছে। কোন কাগজ কখন উঠবে, কখন নামবে কেউ জানে না। সিসিল কিং বলতেন—এ অরণ্যে একমাত্র যোগ্যতমই বেঁচে থাকে। 'নিউজ ক্রণিক্যাল'-কাগজ মরে গেছে, মরেছে—'দি স্টার', 'সানডে গ্রাফিক', 'সানডে ডেসপ্যাচ, 'ডেইলি হেরাল্ড' এবং আরও আরও কাগজ। মাত্র কয় বছর আগে প্রাণ হারিয়েছে ছোটদের একমাত্র দৈনিক 'চিলড্রেনস নিউজপেপার'। তার প্রতিষ্ঠা কাল—১৯১৯। প্রচার সংখ্যা ছিল—৭০ হাজার। নতুন কাগজও অবশ্য জন্মাচ্ছে। কিন্তু নীট ফলাফল ক্রমেই যেন ছোট হয়ে আসছে। ১৯৪৮ সনে লণ্ডনে সকাল-সন্ধ্যা এবং রোববারের কাগজ সংখ্যা ছিল ২৩, এখন বোধহয় ২১। এ সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক দৈনিকের (সকালের) সংখ্যাও ২৮ থেকে কমে ২১ হয়েছে, সান্ধ্য দৈনিক ৭৭ থেকে ৭৫। সুতরাং, লড়াই ছাড়া বাঁচার চিন্তা বাতুলতা। আসল লড়াই অবশ্য করেন সম্পাদক এবং আর জনাকয়, কিন্তু শিবিরের আবহাওয়া বাড়িময়। ('It is like war,—of course—90% sitting on somebody else's laurels, the rest sheer panic.')

সম্পাদকমশাই অনাবরত ভেবে চলেছেন কী করা যায়। এবং

কাকে দিয়ে কী। (জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের মাইনে শুনেছি দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশি!) ফলে নিজের ঘরের লাজুক সাব-এডিটারই হয়ত একদিন ডাক পেলেন তাঁর খাস কামরায়।—তোমার হালকা লেখার হাত ভাল, একটা কলাম লিখবে? হয়ত একজন বিখ্যাত কলামনিস্ট-এর জন্ম হল। বাইরে বেড়াতে গিয়ে একজন অখ্যাত কার্টুনিস্ট তাঁর চোখে পড়ল। বললেন, আমার জন্য কিছু আঁকবে? কার্টুনিস্ট বিখ্যাত হলেন, সেই সঙ্গে কাগজের জনপ্রিয়তাও হয়ত বাড়ল। ('রিপলি' এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিলেন)। রাজবাড়িতে আর একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভেবে-চিন্তে সম্পাদক স্থির করলেন, এবার অন্যরকম করতে হবে। আদেশ হল তাঁর কুষ্ঠি তৈরীর। সেই থেকে কাগজে কাগজে চালু হল—সপ্তাহ কেমন যাবে। ফ্লীট স্ট্রীটে এসব কাহিনী এখনও প্রত্যহ জন্মাচ্ছে। একজন রিপোর্টার আমাকে বলেছেন—মফঃস্বল থেকে এত বড় কাগজে এলাম কী করে জান? একটা ভাল হেড-লাইন লিখে! লাইনটা ওঁদের চোখে পড়েছিল। —আমার কী হয়েছিল শুনবে? বললেন অন্য জন,—ইলেকশান বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছি। ভয়ে ভয়ে আছি। পরদিন সকালে স্বয়ং মালিকের টেলিফোন—তুমি কী জান, এবার থেকে তোমার আয় সপ্তাহে দশ পাউণ্ড বেড়ে গেছে? আমার কথা অনেকখানি ফলেছিল, তা-ই এই পুরস্কার।

তিরস্কারও জোটে কখনও কখনও। (জনপ্রিয় লেখককে ছাটাই করতে গিয়ে সম্পাদকের মন্তব্য—'আমি জানতাম না, তুমি পলিটিকসকে এত গুরুত্ব দাও!') একই তিরস্কার হয়তো শুনতে হয় স্বয়ং সম্পাদকমশাইকে ডাইরেক্টরের মুখে। ফ্লীট স্ট্রীটে সম্পাদকরাও চঞ্চল। 'ডেলি মেল' নাকি গত যুদ্ধের পর সাতজন সম্পাদক বদল করেছে, 'স্প্যাকটেটার'ও বদল হয়েছেন সাত জন। কিন্তু ভাবনা সেটা নয়। সর্বক্ষণ চিন্তা খেলা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতি অফিসে রেফারী, আইন-বিশেষজ্ঞ; থেকে থেকে তিনি বাঁশী

বাজাচ্ছেন—প্যারা ছাটাই হয়ে যাচ্ছে। কিংবা হয়ত গোটা খবর। তারপরও হয়ত সম্পাদকের ডাক পড়বে আদালতে। ফিরে এসে টেলিফোনে তিনি বলবেন—হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিলাম। সেটা কিছু নয়। জিনিসটি ভাল ছিল। চালিয়ে যাও। নোটিশ পাঠিয়েছে নিজেদের আদালত,—'প্রেস কাউন্সিল'; 'চেক-বুক সাংবাদিকতা'র দায়ে ফেলা হয়েছে বিখ্যাত কাগজকে; টাকা ছড়িয়ে এভাবে তথাকথিত চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ প্রকাশ কী রুচি-সম্মত? সে চিঠি একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন চাঞ্চল্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন আরও এক ডজন রিপোর্টার! খবর চাই। চাঞ্চল্যকর খবর।

ফ্লীট স্ট্রীটে অনেকের কাছে তাকেই বলে খবর, যা কেউ, কোথায়ও কোন কারণে, গোপন করে রেখেছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। দরকার হয় লড়াই করেই। এখানে লড়াই ছাড়া বাঁচা যায় না—বাঁচা সম্ভব নয়। নিজেদের মধ্যে লড়াই ('তোমরা কী জান, কী পরিমাণ বর্বর তোমরা, পরস্পরকে পেছন থেকে ছুরি মারছ, ব্যঙ্গ করছ, সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছ, আবার পরক্ষণেই একসঙ্গে বীয়ার গিলছ, খেলচ—' বলেছিল ফ্লীট স্ট্রীটের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের নায়িকা।), প্রতিপক্ষের সঙ্গেও লড়াই, সরকারের সঙ্গে, আইনের সঙ্গে লড়াই—ফ্লীট স্ট্রীট এক বিচিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। বিখ্যাত লেখক স্বর্গত 'ক্যাসেণ্ড্রা' (ডেইলি মিরার) একবার লিখেছিলেন—যুদ্ধ কেমন দেখলে জিগ্যেস করার পর একজন সৈনিক বলেছিল—ওহ্ দি নয়েজ! —ওহ্ দি পিপল! ফ্লীট স্ট্রীটে দুটোই আছে। তার ওপর উপরি-পাওনা পরদিন সকালে—রাশি রাশি টাটকা কাগজ।

নিরিবিলিতে কোন ভাল বাড়ি দেখলেই মনে হত কে জানে, হয়ত বা কোন লেখকের বাড়ি হবে। গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন আধবয়সী একজন ভদ্রলোক, মাথা ভরতি উসকো খুসকো চুল, চোখে পুরু কাচের চশমা; নাম না জানলেও যে গাড়িগুলো দেখলেই মনে হয় খুব দামী, সেই ধরনের গাড়ি—টকটকে লাল রঙ তার। কে জানে, কোন লেখক গেলেন হয়ত। সিট-এর এক পাশে একটা টাইপরাইটার ছিল যেন। ব্রাইটন-এ সৈকত জুড়ে নুড়ির শয্যার রোদে বুক পিঠ মেলে পড়ে আছেন রাশি রাশি মেয়ে পুরুষ। একজন ভদ্রলোকের পাশে ফ্লাস্ক-এর বদলে ফুল-দানির মত একটি তরুণী। অন্যরা যখন মনে মনে ঢেউ গুনছেন কিংবা শুনছেন, মেয়েটি তখন কোন দিকে না তাকিয়ে বসে বসে টাইপ করছেন। ঘাড়টি তাঁর একদিকে ঈষৎ হেলান। কে জানে, হয়ত বা স-সচিব কোন লেখক, গ্রীষ্ম এবং সমুদ্র-সৈকত মিলিয়ে কিছু লিখছেন। আমিও এক ধরনের লেখক, তা ছাড়া অনেক দেশজ লেখকের সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এসব এলোমেলো ভাবনার পিছনে কৌলিক কোন কারণ ছিল না এমন কথা বলতে পারি না। তবে তার চেয়েও বোধহয় প্রবল ছিল পারিপার্শ্বিকের পৃষ্ঠপোষকতা। স্ট্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ শেক্সপীয়র পরব লেগেই আছে। শুধু পঞ্চ পীঠে (শেক্সপীয়র-

এর বাড়ি, শেক্সপীয়র-এর মায়ের বাড়ি, শেক্সপীয়র-এর স্ত্রীর বাড়ি, জামায়ের বাড়ি ইত্যাদি) প্রণাম নয়, ভক্তির প্লাবন। সেই 'মা-কে দেখবেন' 'মা-কে দেখবেন' আবহাওয়া ; থালায় ঝনাৎ ঝনাৎ হাফ-ক্রাউন পড়ছে তো পড়ছেই। হ্যামস্টেড-হীথ-এ কীটস-এর নামে কেদার-বদরী তুল্য তীর্থঙ্করের ঝাঁক, লোক-ডিস্ট্রিক্ট-এ ওয়ার্ড-সওয়ার্থ-এর কুটির যেন জেরুসালেম-এর কোন মন্দির, ডেফোডিল কেবলই ফুল নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। যেখানেই কবি-লেখকের কোন স্মৃতি চিহ্ন সেখানেই অগণতির প্রণাম এবং প্রণামী। এমন যে দেশ লেখকেরা নিশ্চয় সেখানে সুয়েজ-এর পূব পাড়ের মত নন। বিশেষত যে সমাজে কিছু না করলেও লোকেরা নগদ কিছু পেয়ে থাকেন (বেকার এবং বুড়োদের জন্য প্রতি সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ একেবারে মন্দ নয়), যে সমাজে পাড়ার ছেলেরা' স্রেফ ওড়াবার জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে তিন পাউণ্ড পকেটে রাখতে পারেন, সে দেশে গাড়ি-বাড়ি সেক্রেটারি তো বটেই, কে জানে কবি-সাহিত্যিকরা হয়ত বা লর্ড-ব্যারণদের পুরানো ক্যাসেল-ভিলা ইত্যাদি সব শেষ করে রিভিয়েরা-য় কিংবা আলপ্‌স-এর উপত্যকায় দু'হাতে বাগান বাড়ি কিনে বেড়াচ্ছেন ; হয়ত বা সমুদ্রে কিনবার মত আরও কোন ছোট্ট দ্বীপ আছে কি না তা-ই জানবার জন্য দালাল লাগিয়েছেন। মোটর তো কোন্ ছার্, নিশ্চয় অনেকে এতদিনে হেলিকপ্টার কিনে নিয়েছেন ; হয়ত বা হুভারক্র্যাফ্‌ট। নিদেনপক্ষে অন্তত একটি প্রমোদতরী—একখানা ময়ূরপঙ্খী নাও! সমারসেট মম কি আর একজনই ছিলেন ?

বিদেশী বালকের হাতের রঙীন বেলুনটিতে হঠাৎ একদিন ক্রীড়াচ্ছলে আলপিন ফুটিয়ে দিলেন জনৈক ইংরেজ লেখক। নাম তাঁর রিচার্ড ফিণ্ডলেটার। আলোক-আমোদিত জুন-এর সকাল। খবরের কাগজে নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভিড়ে আধইঞ্চি পরিমাণ জায়গা জুড়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তি : 'দি বুক্‌স

অ্যাণ্ড দি রাইটারস :—হু আর দে ?'—লেখক রিচার্ড ফিণ্ড-লেটার।—পড়েছ ? জিজ্ঞেস করছেন—সোসাইটি অব অথারস। তাঁদের অনুরোধ—পড়ে দেখ। দাম মাত্র—দু' শিলিং। মাত্র দুই শিলিং-এর বদলে এভাবে মোহ-মুদ্গর লাভ হবে তখনও জানতাম না। তিন পাতা শেষ হতে না হতে মনে মনে গড়ে-তোলা সে-ই শোনা আধা-শোনা নাম লেখা তকমা-আঁটা প্রাসাদগুলো উধাও। টেমস-এর জলে মনে মনে যে তরীগুলো ভাসিয়েছিলাম বুদবুদের মত সেগুলোও মিলিয়ে গেল। চিলেকোঠা, শুকনো-রুটি, ঠাণ্ডা শয্যা, ধার-দেনা ইত্যাদি জড়িয়ে যে ভিক্টরীয় লেখক-সংবাদ তা-ই যেন আবার হঠাৎ সত্য হয়ে উঠল রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর এই রুপালি-আমলে।—তুমি জান, এ দেশের প্রতি তিনজন লেখকের মধ্যে দু'জনই বেঁচে আছেন গরিবের জন্য বরাদ্দ করা সাপ্তাহিক রাষ্ট্রীয় খয়রাতির চেয়েও কম অর্থে ? ব্রিটেন-সোসাইটি অব অথারস জিজ্ঞাসা করছেন দেশের পাঠককে,—তুমি জান, সপ্তাহে রোজগার তাদের ৬ পাউণ্ডের চেয়েও কম ?

আরও নানা অবিশ্বাস্য সংবাদ। সম্বৎসর লেখালেখিই একমাত্র সাধনা, তবুও প্রতি দু'জন ইংরেজ লেখকের মধ্যে একজনই মাত্র আশা করতে পারেন বই লিখে বছরে তিনি ৫০০ পাউণ্ড রোজগার করতে পারবেন ; প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন সপ্তাহে ৩০ শিলিংও পান কি না সন্দেহ। বছরে হাজার পাউণ্ড পেয়ে থাকেন বড়জোর প্রতি ছয় জনের একজন। তার ওপর যাঁদের রোজগার সেই ভাগ্যবানেরা সংখ্যায় যেমন এ দেশে, তেমনই ও দেশে। টাকা আর পাউণ্ড-এর ব্যবধান ভেবে মনে মনে খুশি হওয়ার কিছু নেই ; জীবনযাত্রার মান এবং আনুপাতিক খরচের কথা মনে রাখলে চিত্রটি মোটামুটি এক। সাগরের ওপারেও আজ উচ্চবিত্ত যদি দু'চারজন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত অনেক, আর দরিদ্র ?—অসংখ্য।

একটি বিখ্যাত দৈনিকের তত-খ্যাত-নন সাহিত্য-সম্পাদকের

মুখেও একই কথা : শুধু বই লেখা ভর করে থাকলে এ দেশে আজকাল সংসার চালান রীতিমত কষ্টকর। অনেক লেখকই উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে অন্য কিছু লেখেন,—রিভিউ, বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ, ইত্যাদি। তা ছাড়া উপায় নেই। একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীর দিন ক্রমেই যেন আরও ফুরিয়ে আসছে। আমার এক এক সময় মনে হয় কি জান,—লেখার জগৎ ক্রমেই লোক্যাল গভর্নমেন্ট-এর মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটিতে যেমন তাঁরাই সাধারণত কাউন্সিলার হন যাঁদের রোজগারের ভাবনা নেই, এখানেও তেমন লোকের পক্ষেই কলম আঁকড়ে থাকা সম্ভব। হয় পয়সাওয়ালা সৌখিন সাহিত্য-সেবক, না হয় বিবাহিতা মহিলা, আজকের অবস্থা চলতে থাকলে, এঁরা ছাড়া আর কেউ লেখালেখিতে আসবেন কি না সন্দেহ।

একজন তরুণ লেখকের (এঁর কোন বই এখনও ছাপা হয়নি) বক্তব্য : লেখার মান দিনকে দিন নামছে।—নামবে না ? ভাল লিখতে হলে খাটা চাই। খাটতে হলে সময় চাই,—আর বেশি সময় খরচ করা মানেই ছয় পাউণ্ড থেকে সাপ্তাহিক আয় তিন পাউণ্ড-এ নামিয়ে আনা। তা করলে দিন চলবে কী করে ? অতএব আমি উপন্যাস লিখছি না। চেষ্টা করছি নাটক্ লিখতে। আর কিছু নয়, একটা চান্স নেওয়া,...যদি লেগে যায়। তা ছাড়া নাটকের পাবলিশার পাওয়া যত সহজ উপন্যাসের বেলায় ঠিক তা নয়।

শ্রীযুক্ত পাবলিশার মহাশয়ের খাস কামরায়ও উঁকি দিয়েছিলাম। ছিমছাম অফিস। নরম চেয়ার জুড়ে বসে আছেন আধবয়সী ভদ্রলোক। মুখ থমথমে। বললাম—যা শুনছি তা কি সত্য ?—কী শুনছ ?—যেন ওঁর সম্পর্কেই কোন গুজব শুনে এসেছি আমি রাস্তা থেকে। উৎকর্ণ ভদ্রলোক নড়ে চড়ে বসলেন।—কী শুনেছ তুমি ? বললাম। ওঃ, তা-ই বল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন

যেন ভদ্রলোক;—অথরদের কথা বলছ? ওঁরা এসব বলে থাকেন।—কী বলেছেন?—এই আমরা পাবলিশাররা সব চোর জুয়াচোর, ঠগ, ধরে ধরে গলা কাটি, সাহিত্যের কিছু বুঝি না—এই সব কথা তো! বললাম—আজ্ঞে না। ওঁরা বলছেন—সাহিত্যিকরা তেমন পয়সা পাচ্ছেন না। তাঁদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি!

—হবে না কেন?—হবে না কেন শুনি? ভদ্রলোক অতঃপর তাঁদের দুর্দশা বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। লিখে ছাপালে অথারস সোসাইটি প্রকাশিত বইটির চেয়েও করুণ পুস্তিকা হতে পারত একখানা। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য আমাদের কলেজ স্ট্রীট পাড়ার মতই। বাজার নেই।—কিনে বই পড়েন ক'জন? একমত ভরসা লাইব্রেরি সেল। ওদিকে বাইরের বাজার একদম গেছে (ইস্টবেঙ্গল?)। এই ধর, আগে ইণ্ডিয়ায় কত বই যেত, এখনও কিছু কিছু যায়, কিন্তু আগের মত নয়। তা ছাড়া কাগজের দাম বেড়েছে, ছাপা খরচ বেড়েছে। লেখকদের রয়ালটি বেড়েছে। বই যে এখনও ছাপতে পারছি সে-ই তো যথেষ্ট! তবুও দেখ, লেখকদের কমপ্লেন-এর অন্ত নেই।—ওঁরা টাকা পান না?—হুঁ! পেপার-ব্যাক-এর লক্ষ লক্ষ টাকা সে তবে কারা পাচ্ছে! দেখবে আমার খাতা—আমি পেপার-ব্যাক ছাপি না, তবুও কী পরিমাণ টাকা দিয়েছি এক একজনকে!

ওঁর খাতা দেখতে হল না। মে মাসের শেষ সপ্তাহে খবরের কাগজে সংবাদ—পেঙ্গুইন কোম্পানি ছয়জন সাংবাদিক-প্রকাশক-লেখককে নিজেদের খরচে জার্মানী নিয়ে যাচ্ছেন বেড়াতে। উপলক্ষ: ওঁদের প্রকাশিত একটি বইয়ের ('ফিউনারেল ইন বার্লিন') চলচ্চিত্র তোলা হচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা তা-ই দেখবেন। বই ব্যবসায় নতুন ধরনের টেকনিক। সুতরাং সাংবাদিকেরা গিয়ে হানা দিলেন পেঙ্গুইন-এর দফতরে,—এই ফিকিরের মানে কী? এডিটরিয়্যাল

ডাইরেক্টার টনি গডউইন সিধে কথার মানুষ। তিনি উত্তর দিলেন —ব্যবসা বাঁচাতে হবে বইকি! দেখছ না, এক একটা কোম্পানি কী হারে অ্যাডভান্স দিয়ে চলেছে লেখকদের। দি অ্যাড-ভেঞ্চারারস'-এর জন্য হ্যারল্ড রবিনস পেয়েছেন ৫২ হাজার পাউণ্ড, 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর জন্য হেনরী মিলার পেয়েছেন ৩৪ হাজার পাউণ্ড, 'লুকিং গ্লাস'-এর জন্য-দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার পাউণ্ড। আমরাও দিচ্ছি। পেঙ্গুইন ১০ হাজার পাউণ্ড দিয়েছে ট্রুম্যান ক্যাপটস-এর 'ইন কোল্ড ব্লাড'-এর জন্য! কিন্তু তাতে চলবে কেন? এ তো সবাই দিচ্ছে।—বেঁচে থাকতে হলে নতুন কিছু দেওয়া চাই। জার্মানীতে প্রমোদ-ভ্রমণের আয়োজন তার-ই একটা চেষ্টা মাত্র।

একদিকে এই টাকার হরি-লুট, অন্যদিকে ওই ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না,—বিস্মিত বিদেশী দর্শক যখন মনে মনে তা-ই দেখে রীতিমত ভাবিত তখন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ ভাষ্যকার হিসাবে আবির্ভূত হলেন আর কেউ নয়, সুখ্যাত 'বীটল্' দল। জুন-এ গরমের বাজার আরও গরম করে বের হল তাঁদের নতুন রেকর্ড। হৈ হৈ কাণ্ড। গানের শিরোনাম—'দি পেপার ব্যাক রাইটার!' কথা আরও চাঞ্চল্যকর:

Dear Sir or Madam will you read my book
It took years to write···
will you take a look........
It is a dirty story of a dirty man
And his clinging wife does not understand.
ইত্যাদি।

পেপার-ব্যাক নিয়ে এমন ব্যঙ্গ বোধ হয় আর হয় না। গানের নায়ক বলছেন—কিছু কম অথবা বেশি—হাজার পাতার বই হবে আমার; স্টাইলটা যদি পছন্দ কর তবে আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে পারি ভয় পেয়ো না, লিখতে সময় লাগবে এক কি দু'সপ্তাহ।

চাই-কি ওগো পাবলিশার, ইচ্ছে করলে তুমি কপিরাইটও নিয়ে নিতে পার, কিন্তু দোহাই লাগে আমাকে পেপার-ব্যাক রাইটার বানিয়ে দাও।

অতঃপর পেপার-ব্যাক-এর চকচকে ঝকঝকে গৌরবের ইতিবৃত্ত আর কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। দেশের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবেন—তাঁরা বলেন পেপার-ব্যাক মন্দ এমন কথা কেউ বলবে না; বিদ্যা এবং সাহিত্যকে ব্যাপকতর পাঠক সমাজে পরিবেশন করে পেপার ব্যাক সমাজের যে মঙ্গল সাধন করেছে একমাত্র হয়ত খবরের কাগজের সঙ্গেই তার তুলনা চলতে পারে। কিন্তু আজ এই ব্যবসা যে পথে চলেছে সেটা নিতান্তই লোভের পথ,--সেখানে 'থ্রী-আর'-এর মানে আজ সম্পূর্ণ অন্য ('Riches. Ruffins and Rape');—গিলটিকে সোনা বলে মেনে নেওয়া চলে না। শক্তমলাটের খোলস ভেঙে আপন যোগ্যতার যাঁরা ওই কোমল আস্তরণ গায়ে জড়াচ্ছেন তাঁদের কথা অন্য—অধিকাংশই ইদানীং স্লট-মেশিন আর পেট্রোল-পাম্প-এ বিকোবার বাসনায় যাচ্ছেতাই লিখছেন। প্রকাশকরা দু'হাতে তাঁদের টাকা দাদন দিয়ে চলেছেন। 'ডেইলি মেল' জানিয়েছেন আমেরিকায় নাকি প্রকাশকরা এমন বইয়ের জন্যও টাকা দিচ্ছেন যা এখনও লেখা হয়নি; উত্তরে 'গার্ডিয়ান'-এ একজন লিখলেন—এখানে এমন লোকেদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে যাঁরা লেখকই নন। তারপর হয়ত এমন দিন আসবে যখন খবরের কাগজে পুস্তক সমালোচনা বিভাগে লিখতে হবে—অমুকের না-লেখা, অমুক কর্তৃক অপ্রকাশিত বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কিছু লিখতে পারলাম না।...'

লক্ষ্মী এখন পেপার-ব্যাক-এর তাকে। অথবা টেলিভিশন, থিয়েটার বায়স্কোপে। সে অঙ্গনে যাঁদের ছাড়পত্র মেলেনি তাঁরা আমাদেরই মত ছা-পোষা; প্রতিবেশীদের করুণা, প্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের সহানুভূতি আর—লক্ষ্মীছাড়াদের চিরকালের সান্ত্বনা,—

কমবয়সী বালিকাদের আগ্রহের পাত্র। তাঁদের কপাল ফেরাবার চেষ্টা অবশ্য হচ্ছে। আর্ট কাউন্সিল সমাজের তরফ থেকে দেশের শিল্পী সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব নিয়েছেন। বছরে হাজার হাজার পাউণ্ড উড়িয়ে থাকেন তাঁরা শিল্পের-হাওয়া শুদ্ধ রাখার জন্য। কবিতার পাঠক কম। প্রকাশক আরও কম। কাউন্সিল বই প্রকাশের জন্য 'যোগ্য' কবিকে টাকা দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অতঃপর কোন কোন ক্ষেত্রে গদ্য লেখকদেরও তা দেওয়া হবে। কোন লেখক যদি দেশের বাইরে গিয়ে ঘুরে এসে কিছু লিখতে চান তবে কাউন্সিল তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন। প্রকাশক যদি ৫০০ পাউণ্ড দিতে রাজী হন তবে কাউন্সিল দেবে আরও পাঁচশ' পাউণ্ড। চাই কি দরকার হলে হাজার পাউণ্ড। বছরে কুড়িটি করে এ ধরনের বৃত্তি দেওয়া হবে। এ সব ব্যবস্থা ছাড়াও বেচারা সাহিত্যসেবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের আন্দোলন হচ্ছে দেশে। একদল প্রস্তাব তুলেছেন লেখকদের করভার থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। অন্তত পক্ষে বই প্রকাশের দশ বছর পরে টেলিভিশন কিংবা সিনেমা থিয়েটার থেকে সে বই উপলক্ষে যে টাকা পাওয়া যাবে—সেটা করমুক্ত করা হোক। অন্য দল আন্দোলন করছেন লাইব্রেরি সদস্যদের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের জন্য। তাঁদের বক্তব্য শক্ত-মালাটের বই লাইব্রেরিগুলোই কেনে। অসংখ্য পাঠক হয়ত সেগুলো পড়েন, কিন্তু তাঁরা তার জন্য কোন পয়সা খরচ করেন না। পাবলিক লাইব্রেরি যে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে যুগ আর নেই। দেশের লোক লেখাপড়া শিখেছেন, পকেট তাঁদের পয়সাও আছে। সুতরাং বিনে পয়সার তাঁদের পড়তে দেওয়া হবে কেন ? তার চেয়ে সকলের কাছ থেকেই কিছু কিছু আদায় করা হোক। তাতে লেখক বাঁচবেন, বাঁচবেন ভাল বইয়ের প্রকাশকরাও।

এই আন্দোলনের ফল কী হবে জানি না। তবে লণ্ডন-এর

বইপাড়াগুলো ঘুরে ফিরে দেখে আমার ধারণা—ব্রিটেন-এ লেখকরা আপাতত মরছেন না। দোকানে দোকানে রাশি রাশি নতুন বই। এখন বছরে গড়ে ২৬ হাজারের ওপর নতুন বই ছাপা হয় ছোট্ট ওই দ্বীপপুঞ্জটিতে। তার মধ্যে ২০ হাজার কমপক্ষে নতুন 'টাইটেল'। সবই কাগজের ফুল,—সস্তার-সস্তা বাজে পেপার-ব্যাক নয়, কিছু কিছু নিশ্চয় ভাল বই। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ মানুষ নগদ পয়সায় বই না কিনুন, অ-সাধারণরা কিনে না-পড়ুন, বই এখনও বিক্রিও হয়। পেপার ব্যাক-এর কথা বাদ-ই দিচ্ছি। এক বছরে পেঙ্গুইন বই বেচেছে সাকুল্যে ২৫০ লক্ষ কপি, আর একটি কোম্পানি বেচেছে ২১০ লক্ষ কপি, তৃতীয় কোম্পানিটি—১০০ লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি। অন্যরাও নিশ্চয় কিছু না কিছু বিক্রি করছেন, নয়ত এইটুকু দেশে এখনও এগার শ' প্রকাশক বহালতবিয়তে আছেন কী করে? সে কি শুধু স্বভাববশত,—সংস্কৃতির মায়ায়?

স্বভাবে সব প্রকাশক স্বাভাবিক এমন কথাও নাকি বলা যায় না। 'রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস ইয়ার বুক'-এ স্পষ্ট সতর্কবাণী: বছরের পর বছর প্রতি সংস্করণেই আমরা লেখকদের সাবধান করে দিচ্ছি কোন কিছু—তা বই, প্রবন্ধ কিংবা যা-ই হোক, ছাপাবার জন্য কখনও টাকা দিও না। আজ এই সাবধানবাণী আরও জরুরী ইত্যাদি।' কেন, তা যেন আমাকে জানাবার জন্যই 'গার্ডিয়ান' কাগজে প্রকাশিত হল একটি প্রবন্ধ। লেখক ডান ওনীল নামে জনৈক কবি। 'গ্লোবাল পোয়েট্রি' নামে একটি সংকলনে নিজের কবিতা ছাপাতে গিয়ে কী ভাবে শেষপর্যন্ত এক-গাদা পয়সা খরচ হয়ে গেছে তাঁর, তারই কাহিনী সবিস্তারে বলেছেন তিনি। তিনি দেখিয়েছেন—তাঁর মত আরও দুশ উনচল্লিশজন কবিকে ছাপার হরফে নিজেদের কবিতা দেখিয়ে কমপক্ষে ৮০০ পাউণ্ড রোজগার করে নিয়েছেন এক ভুঁইফোড় প্রকাশক। এবং তিনি খবর নিয়ে দেখেছেন সেটা ওই কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত ৫০

তম সংকলন। রসিকতা করে তিনি লিখেছেন—আমার কবিতাটির নাম দিয়েছি—'নট এগেন',—আর কখনও নয়।

বেচারা প্রকাশকের বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আর একজন কবি ওই প্রবন্ধটি থেকেই তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়েছেন। তিনি একজন তরুণ সাংবাদিক। গোপন নেশা তাঁর কবিতা লেখা। লিখেছেন অনেক, ছাপাতে পেরেছেন মাত্র একটি কি দুটি; তাও অখ্যাত কোন ক্যানাডিয়ান না অস্ট্রে-লিয়ান সাপ্তাহিকে। তাঁর বাসনা স্বদেশের পাঠককে নিজের কবিতা পড়ানো। দেখে এসেছি তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই 'বব্' করে জমাচ্ছেন; আগামী গ্রীষ্মে ওই বদনামীর দরজায় দেখা যাবে এই অনামীকে। এক হাতে কবিতা, অন্য হাতে প্রকাশকের সমানদক্ষিনা।

শুধু অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম-ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, টাইমস-গার্ডিয়ান-নিউ স্টেটসম্যান, রয়াল লণ্ডন অপেরা—শেক্সপীয়র থিয়েটার, থ্রী-পিস-স্যুট আর রানীর-ইংলিশ নয়—চলতে চলতে অন্য দৃশ্যও চোখে পড়বে, অন্য ধ্বনি কানে ঠেকবে। সব মিলিয়ে সে এক অভিনব প্রেক্ষাগৃহ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যদি আমাদের এই বিশাল দেশে অন্যতম দ্রষ্টব্য হয়, তবে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য বোধহয় আজকের ব্রিটেন-এ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রেল স্টেশনে স্টেশনে পোস্টার: 'আর্ট নাউ'—আজকের শিল্পকলা। অত্যদ্ভুত সে দেওয়াল-ছবি। 'আধুনিক' বললে কিছুই বোঝানো যাবে না। 'অদ্ভুত' বললেও না। জেট প্লেনের লেজ, মেয়েদের উত্তমাঙ্গ, ছবি-আঁকার তুলি, ঘোড়ার চোখ, বাসের চাকা, ফুলের বোঁটা—ইত্যাদি বহুতর অনুপান দিয়ে তৈরি সে জিনিস। (প্রত্যেকটা আইটেম সম্পূর্ণ অন্য বস্তুও হতে পারে সেক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা অথবা কর্ত্রীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী) প্রদর্শনীর তালিকা থেকে যে কোন একটি বাছাই করে সেই তীর্থে চলে যান। সেখানে যা দেখা যাবে সে আরও চমকপ্রদ। অনুমোদিত অত্যাধুনিক শিল্পকীর্তি টেট-গ্যালারিতেও আছে। দর্শন কারুবিদ্যা এবং চারুবোধ—সব মিলিয়ে কোন কোনটি তার অবশ্যই দেখবার মত। কিন্তু এসব প্রদর্শনীতে কখনও কখনও যা চোখে পড়ে তা কখনও কখনও সত্যিই হৃদয়বিদারক। 'অ্যান্টি-আর্ট' শিল্পের ইতিহাসে অজ্ঞাত সংবাদ নয়। কিন্তু আজ কোন কোন শিল্পী স্পষ্টতই 'বড়ডাডা'কে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছেন। 'বড়ডাডা'কে স্মরণ করতে হল, কারণ পণ্ডিতেরা বলেন এসব শিল্পের শুরু 'ডাডাইজম'-এর আমলে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কিছু শিল্পীর বেপরোয়া বিদ্রোহে। সেদিনের ডাডা-পন্থীরাই আজকের এই বিদ্রোহীদের 'গ্রানডাডা'। ওঁরা যদি প্রস্রাব-ভাণ্ডে 'ফোয়ারা' লেবেল এঁটে প্রদর্শনীতে বসিয়ে দিয়ে এসে থাকেন, এঁরাও তবে কম যান না; —গৃহশয্যার নমুনা হিসাবে একটি ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে অজস্র বালিশ—কী ব্যাপার? এ বালিশগুলো নাকি শোয়ার-ঘরের আবহাওয়া তৈরীতে সাহায্য করবে!

চ্যারিং ক্রস রোড ধরে হাঁটছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি অন্য ধরনের বইয়ের দোকান। শো-কেস-এ কোনও চলতি বই নেই, অদ্ভুত নামের সব অপরিচিতের ভিড়। ওপরে সাইনবোর্ড: উৎকৃষ্টতর বই। দুয়ারে ঠেলে ভেতরে ঢুকে চক্ষুস্থির।—এগুলোও বই! সম্ভাব্য যত

আকারের বই হতে পারে তা তো আছেই, তার ওপর অজস্র বই—যা —আদৌ বইয়ের মত নয়। বলা চলে ছাপাখানা এবং বাঁধাইশালার কাটুম-কুটুম। কোনটি পানের মত ভাঁজ করা, ভাঁজ খুললে দেখা যাবে ভেতরে মশলা হিসাবে একখানি কবিতা ছাপা। তার অর্থ বোঝা যায় না কিন্তু মশলার ঝাঁঝ টের পাওয়া যায়। কোনও কাব্যগ্রন্থ উর্দুর মত ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে, কোনটি উল্টে পড়তে হয়, কোনটি কাৎ করে। শুনলাম এটি আভাঁ-গার্দ-দের দোকান। ইংরাজী ভাষায় বিশ্বের যেখানে যে যা উদ্ভট লিখছে এখানে তা লভ্য। বেরিয়ে আসছি, একটি তরুণ হাতে একটি কাগজ গুঁজে দিলেন। বললেন—আসবেন কিন্তু। কাগজটি পড়ে জানা গেল—দিনকয়েকের মধ্যেই এখানে একটি মহতী সভা হবে। বিশ্বের 'প্রকৃত শিল্পীরা' অনেকে এখানে সমবেত হবেন। সভায় আলোচ্য বিষয়ঃ 'ডেস্ট্রাকশান ইন আর্ট'; শিল্পে ধ্বংস। যথাসময়ে সে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। চ্যারিং ক্রসএর একটি ঘরে অজস্র দর্শকের সামনে দু' দিন ধরে তাণ্ডব নৃত্য হল। শিবঠাকুরের নাচ নয়, তাতে ধ্বংসের পরে সৃষ্টির কথাও আছে। এঁরা অনুষ্ঠান করে পিয়ানো ভাঙলেন, ভেড়া-মুরগী জবাই করলেন; মেঝেয় গাইতি দিয়ে গর্ত করে একজন শিল্পী বললেন—এই আমার ভাস্কর্য। একটি সুন্দরী মেয়েকে বসিয়ে তাঁর ওপর ঝুড়ি ভরতি কলা-মূলো-আবর্জনা ঢেলে দেওয়া হল—এই হচ্ছে শিল্প! ভক্তরা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিল—আঃ কী অপূর্ব!—কী অপূর্ব!

থিয়েটার-পাড়ায় আসুন। সেখানে কেবলই 'সাউণ্ড অব্ মিউজিক', শেক্সপীয়র আর শ' নন; লণ্ডনে সপ্তাহে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশখানা নাটক অভিনীত হয়। প্রতি মরশুমে নব নব পরীক্ষা। 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার'কে যেন বহুকাল পিছনে ফেলে এসেছেন নাট্যকাররা। 'দি হোম কামিং' (বিদেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরেছেন ছেলে। বনেদী পরিবারের কর্তা। পিতা স্বাগত জানালেন

ওদের। তারপর পুত্র-বধূর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অসামাজিক), 'কিলিং অব মিস্টার জর্জ' (পেরামবুলেটার-এ শায়িত একটি শিশুকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল দর্শকের সামনে) কিংবা অসবর্ণের নবতম—'এ পোট্রেট ফর মি' (পচনশীল ভিয়েনার পটভূমিতে দুই পুরুষের যৌনসম্পর্ক)—আরও কত কী! চিরাচরিত দর্শক আহত, মর্মাহত, শঙ্কিত। একই বেপরোয়া ভঙ্গী সিনেমায়। 'স্যাটারডে নাইট, সানডে মর্নিং', 'দিস স্পোর্টিং লাইফ', 'টেস্ট অব হানি' কিংবা 'টম জোন্স'—পুরানোর তালিকায়। অফিসের ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে মাত্র ২০ হাজার পাউণ্ড খরচ করে দুই তরুণ সাত বছরে তৈরি করেছেন আলোড়নকারী চলচ্চিত্র—'ইট হ্যাপেণ্ড হিয়ার।' ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ নাৎসীদের অধিকারে চলে গেছে, ইংরেজ নরনারী অতঃপর কেমন আচরণ করছে এই তাঁদের প্রতিপাদ্য। বক্তব্য : ফ্যাসিজম ইংরাজদের কাছে ঠিক তত অপ্রিয় নয়; এমন কি এদেশে ইহুদি-বিরোধী মনোভাবও সুপ্ত। দর্শক এবারও বলা নিষ্প্রয়োজন, আহত। তারপর বিখ্যাত 'মরগ্যান' এবং আরও নানাবিধ অস্বস্তিকর চিত্র। কাগজে পড়ছিলাম—ব্রিটেন সেখানেই থেমে নেই। তার স্টুডিওগুলোতেও আরও ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিন যখন 'দি কাউনটেস অব হংকং' বানাচ্ছেন, পোলানিস্কি তখন 'দি ভামপায়ার কীলারস' নিয়ে মগ্ন। 'কুল্ দে স্যাক'-এর চেয়েও নাকি চমকপ্রদ হবে সে ফিল্ম।

এসব ক্রোধের কথা, কিংবা—প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনী। 'পাব'-এ দেখেছি একদল কবি অদ্ভুত সব বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কাব্যপাঠ করেছেন। চেয়ার উপচে ভিড় ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেময়, হাতে হাতে উচ্ছ্বসিত পানপাত্র,—মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য। সম্প্রদায়টিকে বলা হয়—'বারো-পয়েটস'। যদিও সরকারী আনুকূল্য পেয়েছেন ওঁরা, তবুও কান পাতলে বোঝা যায়, ওঁরাও বিদ্রোহী দল। সমাজ-সংসার, রীতি-নীতিকে হেসে এবং

হাসিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই যেন ওঁদের মতলব। 'পাব'-এর শ্রোতা হয়ত এ কবিতার শব্দের চেয়ে ছন্দের ওপরই ভর করেন বেশি,—কিন্তু সন্দেহ নেই, ওঁরা বাক্য রচনা করেন বিদ্রোহীর আবেগ এবং নিষ্ঠা নিয়ে। নব্য সিনেমা থিয়েটার চিত্রকলা এবং কবিতায়—এ-ধরনের বিদ্রোহ অপ্রত্যাশিত নয়। দেশের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক প্রবাহে এ জাতীয় নবীন ধারা মোটেই বিস্ময়কর নয়, বলা চলে—অনিবার্য। এই সব উপনদীর অবদানে হয়ত বা ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক-চিত্র। হয়ত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর আমলের গৌরব হয়ে থাকবেন এই বিদ্রোহী শিল্পীর দলই। কেউ কেউ তাঁদের ইতিমধ্যেই সুখ্যাত,—কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত।

মগজে ছোট-বড়-মাঝারি, কল্পিত এবং অকল্পনীয় নানা কারণ সহ যাঁরা বিদ্রোহী, সকলে তাঁরা স্বভাবতই এখনও বিজয়ী নন। আলো থেকে দূরে হাততালির পরিধির বাইরে একান্তে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের সামনে দিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে দিব্যি চলেছে আর এক দলের জয়যাত্রা। তাঁরাও বাকি 'বিদ্রোহী',—প্রবল প্রাচীন বিরোধী, সনাতন এবং প্রচলিতের বিপরীতপন্থী—অনাচারী। কিন্তু সে অন্যদের ব্যাখ্যা। ওঁরা নিজেরা, এত কিছু বলেন না। মুখপাত্র হিসাবে কেউ কেউ মুখ খোলেন অবশ্য। (যথা: 'সুন্দর কি শুধু গাছপালা আর পাহাড়-পর্বতই?—এই ভাঙা গ্যাসপাম্পটা সুন্দর নয় কেন?' কিংবা 'এই হচ্ছে আনন্দানুভূতি।—এই হচ্ছে আজকের,—আধুনিককালের নয়,—জীবনকথা'; অথবা 'লোকেরা আমাদের বুঝতে পারে, তাই ভালবাসে।' ইত্যাদি) কিন্তু তাতে কোন বিশেষ সত্য জানা যায় না। শুধু এটুকুই বোঝা যায়—ওরা জনপ্রিয় হতে চায়। হতে পারেও। ওরা—'পপ'।

নব্য নাট্য অন্দোলনের অন্যতম নায়ক পীটার হল বলেন—

একদিকে 'হ্যামলেট', অন্য দিকে 'পপ-ডিস্ক' থেকে আজকের তরুণকে সত্যকারের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাও আমাদের একটা লক্ষ্য। কিন্তু যে-কোন দূরের দর্শক মানবেন সে লক্ষ্য এখনও অপূর্ণ; ব্যবধান শুধু 'টাইমস'-এর সঙ্গে 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' বা 'নিউ স্টেটসম্যান-এর' সঙ্গে 'টিট-বিটস'-এরই নয়, অন্য অঙ্গনেও পপ-এর জয়-জয়কার। গ্রীষ্মের লণ্ডনে চেলসির ফুটপাথে রেস্তোরাঁয় কিংবা সাউথ কেনসিংটন-এর প্রদর্শনীপাড়ায় তরুণ-তরুণীর অঙ্গে অঙ্গে পপ-পোশাক; যেন 'ভোগ' আর আমেরিকান হার্পারস-বাজারের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন রূপবান আর রূপবতীর দল। অনেকে ছবিতেও দুর্লভ। মিনি-স্কার্ট (হাঁটুর ওপর তিন থেকে ছয় ইঞ্চি উঠতে পারে), বেলবোটম ট্রাউজার, পেটেণ্ট চামড়ার দীর্ঘ বুট, শাদা কিংবা নক্সা কাটা মোজা তো কোন ছার; তারপরও আছে নানাবিধ। বিবরণ দুঃসাধ্য। ফলাফলটা শুধু শোনাচ্ছি। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এক পোশাকের ক্রিয়া যদি 'টোটাল-লুক', অন্যটির তবে 'ন্যুড-লুক'; আর একটি পোষাকের লক্ষ্য নাকি 'লিটল অরফ্যান অ্যান' সাজিয়ে তোলা। শুনেছি অন্তরীক্ষে আরও রকমারী চালু হয়েছে। কিছু নিজেদের উদ্ভাবন, কিছু সাগরের ওপার আমেরিকা থেকে থেকে ধার করা। তার মধ্যে আছে নাকি অ্যালুমিনিয়াম-এর পরচুলা, নিওন-ড্রেস, বৈদ্যুতিক তার খাটানোস্কার্ট-ব্লাউস এবং জ্যামিতিক নক্সার বিরাট কানের দুল। শুধু পোশাকে নয়, চুলের ছাটেও রীতিমত জনপ্রিয় পপ-ছাট। (সে ছাট সব সময় বীট্‌লদের মত নয়। 'বীটল'রা পপ-এর পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় মাত্র)। বইয়ের দোকানে যান, সেখানেও পপ-সাহিত্য 'কমিক'-এর ছড়াছড়ি। টেলিভিশন-এ 'ব্যাটসম্যান'-এর আসর জমজমাট। আমেরিকায় নাকি বাজারে হাজার স্মারক-পণ্য তার নামে। ব্রিটেনেও কম নয়। কিছু বালক বালিকা ইতিমধ্যেই 'ব্যাটম্যান' হতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে দুর্ঘটনায়।

অন্য আসরে দেশের তরুণ-তরুণীদের ক্রমাগত আনন্দলোক পাঠাচ্ছেন ক্যাথি ম্যাকগোয়ান। 'আই টি ভি'-তে তাঁর আসরের নাম—'রেডি স্টেডি, গো!' তাঁর নামে তরুণ-শহর উন্মাদ।

'পপ' গায়ক-গায়িকাদের নানা নাম, নানা গোষ্ঠী। 'বীটল'রা সুখ্যাত। তাঁদের কথা পরে বলছি। তারপরও আছে 'দি অ্যাকশান', 'দি হু', 'দি অ্যানিম্যালস', 'দি রোলিং স্টোনস', 'দি মাইণ্ডমেণ্ডারস' এবং আরও কত কী! রেকর্ড-এ দোকানে প্রতি সপ্তাতে নতুন চার্ট; নিত্য নতুন তারকার উদয় এবং প্রস্থান। কী গায় ওরা?—কেমন গায়? বিদেশী শ্রোতার পক্ষে চট করে তা বলা শক্ত। চুল, বাদ্য, পোশাক, হাত-পায়ের আন্দোলন, আস্ফালন, ভক্তদের চীৎকার—সব মিলিয়ে উপভোগ্য আসর। কিন্তু গানের মর্মোদ্ধার প্রায় দুঃসাধ্য। সে সব বুঝতে স্থানীয় শ্রোতার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাঁদের একজনকে অনুসরণ করে একজন গায়ক এবং তাঁর একটি গানের বিচার শোনা যাক। তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন: অজ্ঞদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন—'পপ'—পপুলার; আর 'ডিস্ক'—গ্রামোফোন রেকর্ড। সুতরাং অনুমান করা চলে ভক্ত না হলেও 'পপ' বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। এক সপ্তাহের 'মেলোডি মেকার' চর্চা করে তিনি পাঠককে জানাচ্ছেন: রেকর্ড বিক্রিতে চলতি সপ্তাহে যাঁরা প্রথম কুড়ি জনের বন্ধনীতে আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের মাত্র বয়স তিরিশের ওপরে। এক-তৃতীয়াংশ কুড়ির নীচে, এবং সর্বকনিষ্ঠটি মাত্র চৌদ্দয় পড়লেন! 'পপ'-এর অমরাপুরীতে বয়স্কদের জন্য বড়ই স্থানাভাব। ব্রিটেনে রাষ্ট্র এবং সমাজে আজ কমবয়সীদের আধিপত্য। শিল্পে, সাহিত্যে, টেলিভিশন-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাজনৈতিক দলে—সর্বত্র প্রথম সারির লোকেদের বয়স নাকি ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে। কিন্তু 'পপ'-রা এত বড় অঙ্ক মানতে চান না। শতাব্দীর কনিষ্ঠতম প্রধান মন্ত্রী হেরল্ড উইলসন তাঁদের কাছে

নাকি 'গুড ওল্ড 'এরল্ড!' একজন পপ-গায়ক টীনেজ-পার্টির টিকিটে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই পর্যন্ত করেছেন নির্বাচনে!

এ-হেন কচি-কাঁচা তরুণেরা কী গায় তার কথা এবার শোনা যাক। সে বছর অন্যতম পপ-গায়ক পল আন্‌কা। বয়স—ষোল। তার একটি গানের শিরোনাম—'ডায়না'। সে রেকর্ডটির বিক্রি তখন দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, নবীন গায়কের পকেটে এসেছে কমপক্ষে ১ লক্ষ পাউণ্ড। ঘরে বসে বাজিয়ে গায়কের কথা কয়টি উদ্ধার করেছেন লেখক। কয়টি সহজ সরল বাক্যে,—আই লাভ ইউ উইথ অল মাই হার্ট/অ্যাণ্ড হোপ উই উইল নেভার পার্ট/আই এম সো ইয়ং অ্যাণ্ড ইউ আর সো ওল্ড.../ও, প্লীজ স্টে বাই মি, ডায়না!—ও, প্লীজ—। ইত্যাদি। লেখক বলছেন—পল গাইতে জানে। গলায় বাধাবন্ধহীন আদিম উদ্দামতা—'জুভেনাইল অ্যানিম্যাল ভালগারিটি'। সুতরাং তার গান চলবে না কেন? (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা জন্য দ্রষ্টব্য—'ইংল্যাণ্ড হাফ্ ইংলিশ', লেখক—কলিন ম্যাকইনেস)। পপ সঙ্গীত সহজ, সরল; আবেদন তার প্রত্যক্ষ। অতএব শ্রোতা অজস্র। দেশের তরুণ-তরুণীদের একটা বিপুল অংশ 'পপ' গায়কদের বশ। ইদানীং এক্ষেত্রে নাকি একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংবাদ— ব্রিটেন অবশেষে নিজেদের 'পপ' গায়ক খুঁজে পেয়েছে। এতকাল সুর ভেসে আসত প্রধানত অ্যাটল্যাণ্টিক-এর ওপার থেকে, এখন এপার থেকেও ওপারে ডিস্ক ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

শুধু ডিস্ক নয়, অন্যান্য 'পপ'সম্ভারও নাকি আজ লণ্ডন থেকে রপ্তানি হচ্ছে আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ার রুডি গারনেরিখ যদি 'টপলেস' আবিষ্কার করে থাকেন, তবে 'অরফ্যান অ্যান' হাতে তুলে দিয়েছেন ব্রিটিশ পোশাক-শিল্পী মারী কুরাণ্ট। অন্যদের অবদানও কম নয়। তবে পপ-বিশেষজ্ঞ অথচ ভক্ত নন, এমন পণ্ডিতেরা বলেন—আবিষ্কর্তা আসলে ওরা নিজেরাই।

এ-সব ফ্যাশন-এর জন্ম নাকি অনেক সময়ই নাবালক নাবালিকাদের হাতে। এটা সেটা জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে কোন ত্রয়োদশী হয়ত উদ্ভট কিছু তৈরি করে সমবয়সীদের মধ্যে বিশিষ্ট হতে চেয়েছিল। তাই ক্রমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হল। কুটিরশিল্পের স্তর পেরিয়ে তখন শুরু হল ব্যাপক উৎপাদন। কোন্ সূত্রে যে 'পপ'-জগতে কী আসছে বলা শক্ত। টুইস্ট এসেছিল নাকি দক্ষিণ ফিলাডেলফিয়ার কোন কৃষ্ণাঙ্গ পল্লী থেকে; জনৈক কালো গায়কের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছিল গোটা দেশের তরুণ-তরুণী দল। (প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, লণ্ডন-এর পপ-আসরে কোন নাচ আজ সবচেয়ে চল এ বিষয়ে এক একজনের এক এক মত। এদের মধ্যে আমার কাছে যথার্থ মনে হয়, সেই বক্তা যিনি বলেছেন —লণ্ডন-এ আজ আর নাচের কোন বিশেষ নাম নেই।—ইউ জাস্ট্ ড্যান্স, ডু দি ড্যান্স, হোয়াটেভার ইউ ফীল লাইক!) তেমনই পয়সা বাঁচাতে গিয়ে কোন তরুণী হয়ত আর্মি নেভি স্টোর-এর সস্তার বাতিল পোশাকের পাহাড় থেকে জ্যাকেট কুড়িয়ে এনেছিল একখানা, তাই ক্রমে চল হয়ে গেল দেশময়। একজন 'পপ'-গায়ক টেলিভিশন-এর উজ্জ্বল, অসহ্য আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য আয়তকার সান-গ্লাস পরেছিলেন একদিন, সেই থেকে চল হল নবতম চশমা। বীটলদের একজনের গিন্নি হাতে বড় ঘড়ি পরে-ছিলেন, সুতরাং কব্জিতে কব্জিতে উদিত হল হাফ ক্রাউন সাইজের পুরুষালি ঘড়ি। এভাবেই এসেছে ডোরাকাটা ট্রাউজার, বিঘৎ-চওড়া কোমরবন্ধ এবং আরও নানা সজ্জাদ্রব্য।

স্বভাবতই দেশের উৎপাদন-ক্ষেত্রে 'পপ'-প্রভাব আজ রীতিমত স্পষ্ট। একটি মার্কিন কাগজে পড়েছিলাম, সে দেশে যত রকমের পোশাক-আসাক চালু আছে, তার মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ প্রকৃতিতে 'পপ'। তারপরও কিছু আছে যাকে বলা চলে 'মিন্-পপ', অর্থাৎ প্রায় 'পপ'। লণ্ডনের শো-কেসগুলোতে 'পপ'

প্রতিপত্তি কতখানি তার কোন হিসাব জানা নেই। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা বলেন—প্রভাব তার দরজির দোকান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর প্রসারিত। লণ্ডন তরুণের শহর। এ শহরের শতকরা ৩০ ভাগ নাগরিকের বয়স পনের থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। বয়স যাঁদের কুড়ির নীচে সংখ্যায় তাঁরা প্রায় ২৪ লক্ষ। তারুণ্যের তহবিলে উৎসাহের কোনদিনই অভাব ছিল না। কিন্তু আজকের লণ্ডন-এ কচি কাঁচাদের তহবিলে তৎসহ আছে নগদ পয়সা। প্রতি সপ্তাহে এরা প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে গড়ে তিন পাউণ্ড ইচ্ছেমত ওড়াতে সক্ষম! একজন ইংরেজ লেখক হিসাব করেছেন—এ অর্থের যোগফল কমপক্ষে ৩১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। এ বিত্তের ক্রয়ক্ষমতা অবহেলা করবেন সাধ্য কার! ওরা রেকর্ড ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক, বই ('কমিক' ইত্যাদি) ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিওগ্রাম, টেলিভিশন সিনেমা ইত্যাদি তো বটেই। ওদের সক্রিয় উৎসাহের ফলেই মোটর সাইকেল মিনি-গাড়ি বাণিজ্যে লক্ষ্মী অচলা, ওদের জন্যই কফি-বার-এর এমন স্ফূর্তি,—দেশে 'নরম' পানীয়ের ফোয়ারা! প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্রিটেনে তরুণ-তরুণীরা নাকি মামা মেসোদের মত মদ্যাসক্ত নন, তাদের পছন্দ 'কোক্' ইত্যাদি নরম পানীয়। অবশ্য সুরার বেনো জল ওদের জগতেও ঢুকছে। হালের খবর—১৯৬৯ সনে নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্রতি ব্রিটেন গড়ে ১৭৩ পাঁইট বীয়ার উদরস্থ করেছে। তার আগের বছর অঙ্কটা ৭ পাঁইট কম ছিল। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাবার জন্য সে বছর সাজা হয়েছে মোট ২৬৩৯২ জনের। ১৯৬৮ সনের তুলনায় এ বিষয়ে অগ্রগতি শতকরা ৩০ ভাগ! অবশ্য এমন হতে পারে—মাতালের সংখ্যা বাড়েনি, আগের তুলনায় ওঁরা এখন ধরা পড়ছেন বেশি সংখ্যায়। ১৯৬৭ থেকে গাড়ির চালকদের নিঃশ্বাস পরীক্ষা শুরু হয়েছে কিনা।

দেশের অর্থনীতিতে যাদের এত প্রভাব, সমাজ জীবনেও নিশ্চয়

তারা শূন্যভার অস্তিত্ব নয়। বীটল্'দের রাজ সম্মান লাভ তার একটা ইঙ্গিত মাত্র। বয়স্করা তরুণদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা অধ্যয়ন করছেন, নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেক সময় তাঁদের পিছু হাঁটছেন। প্রকারান্তে তাঁরাও আজ 'পপ'-এর পরিচর্যায় রত। তরুণ-তরুণীরা বড়দের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা পেলেই খুশি। তার বাইরে কিছু করতে গেলেই তারা শঙ্কিত। শোনা যায়, হোয়াইট হাউস-এ মিসেস কেনেডি 'ট্যুইস্ট'-এর বাজনা বাজাবার অনুমতি দেওয়ার পর থেকে 'ট্যুইস্ট' ক্রমেই আবেদনহীন হয়ে পড়ে। মেয়ের 'পপ' পোশাক মা যেদিন পরলেন সেদিন থেকেই সে পোশাকের মাহাত্ম্য ঘুচল। 'পপ'-পন্থীরা এসব অধিকার বরদাস্ত করেন না। তবুও প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। পণ্য 'পপ', ক্রেতা 'পপ' অনুরাগী কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী দল—বিজ্ঞাপনও অতএব ক্রমেই যেন আজ 'পপ'-মাধ্যম। 'পপ'-এর সেবা মানে দলে থাকা, আধুনিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া। অতএব ওদের ছবি বিক্রি হয়, গানও প্রশংসা পায়। কেননা, 'পপ' মানে আধুনিকতা—'এ গ্রেট ওয়ে অব বিয়িং নিউ!' 'পপ' বন্দনা অর্থ —উন্নসিকতাকে বিদায় দিয়ে 'জনতা-কালচার'কে গ্রহণ।

'পপ-কালচার' যথার্থ 'জনতা কালচার' কিনা সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু 'পপ' সেবায়েত ব্রিটিশ তরুণ-তরণীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেকেই আজ প্রায় নিশ্চিত। প্রথম বৈশিষ্ট্য আজকের তরুণ-তরুণীর মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ। এমন এক সময় ছিল যখন সৈন্যবাহিনী আর জেলখানা ছাড়া কুল-পরিচয় এড়িয়ে চলা যেত না। আজকের এই ডিস্কপাগল ব্যাটম্যান-দর্শক তরুণ-তরুণীর দল সে প্রসঙ্গ মোটে একটা আলোচনা করে না। 'পপ'-প্রেমে সব একাকার। দ্বিতীয়ত, এরা অন্যান্য গুরুতর লেখক শিল্পী সমাজের মত এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী নয়, উক্ত অভিভাবকদের সম্পর্কে নিস্পৃহ মাত্র। রাজ-

নীতিতে এদের উৎসাহ কম। তৃতীয়ত, এরা গতকালের ইংরেজ তরুণ-তরুণীর তুলনায় অনেক বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী (রাজনৈতিক অর্থে নয়)! যেখানেই ছেড়ে দাও ওদের—দিব্যি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবে। ওরা সুখী,—ওরা স্বাধীন, ওরা আনন্দিত। অতএব, কেউ কেউ বলেন—যতদিন ইচ্ছে চলুক না ওরা নিজেদের পছন্দমত,—ক্ষতি কী ?

অনেক বলেন—ক্ষতি কিছু আছে বইকি! রাজনীতি সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য, বয়স্কদের সম্পর্কে এই নিস্পৃহতা, এই সমাজ নিরপেক্ষতা, আত্ম-নির্ভরতা, অকারণ পুলকে ভেসে বেড়াবার জন্য ব্যাকুলতা যথাসময়ে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। 'পপ' অর্থ—জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে 'পপ-কালচার' বরাবরই ছিল, বরাবরই থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, অতঃপর জনপ্রিয় হবে কোন্ কালচার ? শূন্য-গর্ভ এই 'পপ'ই কী শেষ পর্যন্ত দখল করবে সংস্কৃতির তক্ত ? কবি অডেন বলেন—সেটা অসম্ভব নয়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আজ 'গ্রেসাম ল' চলেছে। ভাল জিনিস ক্রমে মন্দকে তাড়িয়ে আসর অধিকার করলে সেটা খুব বিস্ময়কর হবে না।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল 'বীটল'রা ভারতে চলেছেন। 'বীটল' না বলে বলা উচিত—'দেবতা'। 'পপ্'দের কুলদেবতা! এঁদের এই ভারতযাত্রা একদিন থেকে দেবতাদের মর্তে আগমনের সামিল। ব্রিটেন 'পপ'দের স্বর্গ। ভারত সে-তুলনায় নিছক মৃত্তিকার ধরণী।

দেবতারা স্বর্গে পরম সুখে দিনাতিপাত করছিলেন। সেখানে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। চাল ডাল নুন তেল সামান্য বস্তু, বাড়ি গাড়ি ব্যাংক-ব্যালান্সও অনেকেরই থাকে, তাঁদের তার চেয়েও লোভনীয় ধন সমুদয় ছিল। খ্যাতি ছিল, যশ ছিল। প্রভাব এবং প্রতিপত্তিতেও কমতি ছিল না। ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই হাজার হাজার কমবয়সী মানবী-মানবী ধ্বনি তুলতো—ঈ-ঈ-ঈ…… !

এত ভক্ত আর কোন দেবতা কোন কালে পেয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। দিন-রাত্তির তারা পিছনে লেগেই আছে। উঁচু দেওয়ালের আড়ালে আস্তানা, চারদিকে সিকিউরিটি গার্ড, এমনকি টেলিফোন নম্বরগুলো পর্যন্ত সযত্নে গোপন করা। তাহলেও উৎপাতের অন্ত নেই। ফলে, মনোহর বাহনগুলোর জানালায় ঘষা কাচ বসাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে অপ্সরাদের নৈশ আসরে উঁকি দিতে ইচ্ছে করে, দিয়েও থাকেন। কখনও 'দি ব্যাগ অব

নেইলস' কখনও বা 'দি স্পীক ইজি'তে দর্শন দেন ওঁরা। অপ্রত্যাশিত, নাটকীয় আবির্ভাব। কিন্তু ভক্তরা জানে না এর জন্য অন্তত সাত দিন আগে থেকে বসে বসে সামরিক কায়দায় পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। পলায়নের পথটি বহু আগে ভেবে রাখা আছে। তবু হয়ত গাল ছুটি অক্ষত রেখে গাড়িতে গিয়ে বসতে হলে পুলিশের সাহায্য দরকার হবে।

'আমরা যীশুর চেয়েও জনপ্রিয়'—বলেছিলেন নাকি ওঁদের একজন। তারপর অবশ্য ঘোষণাটাকে কিঞ্চিৎ মোলায়েম করা হয়েছে। দেবতারাও কখনও কখনও বিনয়ীও হয়ে থাকেন। কিন্তু ওঁরা প্রত্যেকে মনে মনে জানেন—জনপ্রিয়তায় ওঁরা অনেকেরই জামানত জব্দ করার ক্ষমতা রাখেন। আবির্ভাবের পর প্রথম তিন বছরে ডিস্ক-বন্দী ওঁদের কণ্ঠস্বর বিক্রি হয়েছিল কুড়ি কোটি প্রস্থ! 'আই ওয়াণ্ট টু হোল্ড ইওর হ্যাণ্ড'—আমি তোমার হাত ধরতে চাই সখী—নামে ওঁদের একটি ছন্দোবদ্ধ সুরেলাবাণী বিক্রি হয়েছে ৫০ লক্ষ কপি। কিছুদিন আগে বের হয়েছে একটি নতুন 'এল-পি,' প্রথম তিন মাসে বিক্রি—২৫ লক্ষ খণ্ড। এগুলো এক দিকের সংবাদ মাত্র, ওঁদের জনপ্রিয়তার আরও নানা নিশানা। ওঁরা জাত ব্রাহ্মণ নন, দেবকুলেও কার্যত নবাগত। তাহলেও বিশিষ্টদের মধ্যে রীতিমত খাতির ওঁদের। ক'বছর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ওঁদের। রাজবাড়িতে তৎকালে ওঁদের নিয়ে টানাটানি। বুড়ি রানীমাতা থেকে শুরু করে স্বয়ং রানী, তস্য ভগিনী সবাই তখন এঁদের ভক্ত। তরুণ রাজকুমার ওঁদের ছাঁদে চুল ছাঁটতেন, রাজকুমারী ওঁদের ঢঙে, ওঁদের পছন্দের ডিজাইনের মোজা পরতেন। শুধু তাই নয়, বনেদী দেবতাদের সঙ্গে এক আসরে বসে ভোজ খেয়েছেন এই অর্বাচীন লৌকিক দেবতাদের একজন। দারু বা শিলামূর্তি এখনও নির্মীত হয়নি বটে, কিন্তু মন্দিরে ওঁদের মোমের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে,

হাটে-বাজারে শো-কেসে শো-কেসে অসংখ্য প্ল্যাস্টিক মূর্তি ছাড়াও নানাবিধ স্মারক। ওঁদের একজন সেবার চুলে কাঁচি লাগালেন, মহামূল্য সে কেশদাম নিয়ে সেকি কাড়াকাড়ি! অবশেষে বিজয়ী হলেন কোন এক দেশের একটি জনতা-পত্র। তাঁরা ভক্তদের জন্য সে অমূল্য ধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন,—উচ্চমূল্যে। আর একবার একজন নতুন কোন একটি বাদ্যযন্ত্র হাত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় আলোড়ন। যন্ত্রটিরই যে খাতির বেড়ে গেল তা-ই নয়, বেড়ে গেল দেবতার মাহাত্ম্যও। টেলিফোনের পর টেলিফোন। আগেই বলা হয়েছে এই নবীন দেবতারা টেলিফোনটিকে সযত্নে গোপন রাখেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তবু ক্রীং ক্রীং এড়ানো সম্ভব হয় না। একজন তা-ই ভেবে-চিন্তে ফোন-ধরার জন্য অশরীরী কণ্ঠস্বর বহাল করেছেন। ফোনে দৈববাণীর মত কয়েকটি প্রশ্ন উচ্চারিত। যথা: কে তুমি? কী তোমার প্রার্থনা? ইত্যাদি। পাশেই থাকে টেপরেকর্ডার। ভক্তের মনের কথা সব যেখানে টুকে রাখা হয়। দেবতারা ফাঁকি দিতে জানেন। শোনা যায়, ইনিও কদাচিৎ এই সব আবেদনে সাড়া দেন,—রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন টেপ বাজিয়ে ওদের জয়ধ্বনি শোনেন। সব দেবতার মতই প্রশংসা শুনতে ভালবাসেন ওঁরা।

শুধু ছেলেছোকরাদের হাততালি নয় ওঁরা পক্ককেশ অবিশ্বাসী-দেরও শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের হেতু। সন্দিগ্ধরাও অবশেষে স্বীকার করেছেন—হ্যাঁ, এঁদের মহিমা আছে বটে। দেবলোকের অন্যতম সেরা সুরকার নেড নোরেম বলেছেন—ওঁরা আমারই সহধর্মী। আমরা একই ভাষায় কথা বলি, পার্থক্য যা সে শুধু উচ্চারণ-ভঙ্গীতেই। ওঁদের সর্বশেষ অবদান কানে শুনে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন—এ সঙ্গীত মর্তের যে কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সমকক্ষ। শ্যুবার্ট-এর গীতের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলতে পারে এই

'পপ'-দেবদের গানের। আর একজন প্রখ্যাত রসিকের মন্তব্য : আজকের সঙ্গীত সেখানে পৌঁছেছে ওঁরা সেখানেই আছেন। প্রখ্যাত মারকিন মনোবিজ্ঞানী বলেন,—এঁদের অবহেলা করা চলে না। এঁরাও এক ধরণের অস্তিবাদী বাস্তবের, অর্থহীনতার কথা বলছেন। আর একজনের মতে—ওঁরা শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেবার দেবতাদের একজন সুরের বদলে কলমে মুখ খুলেছিলেন, দেবলোকের সেরা সংবাদপত্র ঘোষণা করল—আমাদের ভাষা এবং কল্পনাশক্তি বিষয়ে যাঁরা সন্দিহান তাঁদের অনুরোধ করব এই পুঁথিটি অধ্যয়ন করতে। সে বৎসর একজন প্রকৃত দেবতার, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড-এর একখানা অনবদ্য জীবনকথাও প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিকেও হার মানতে হল উক্ত সংহিতার কাছে। এমন কি, স্বনামধন্য লৌকিক দেবতা জেমস বণ্ডও নতমস্তকে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। এতকাল ওঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ-পরায়ণ ছিলেন যাঁরা, তাঁরাও আজ মৌন। বোধ হয় সবাই কনভারটেড। জনৈক যাজক বলেন—স্পর্শকাতর মানুষের তন্ত্রীতে ওঁরা ঝংকার তুলেছেন, ওঁদের তুলনা নেই। স্বর্গীয় মাধুর্য ওঁদের সঙ্গীতে। এই নিঃসঙ্গতার যুগে মানুষের একাকীত্ব আর আতঙ্ককে আপন চেহারায় প্রকাশ করেছেন ওঁরা। যাজক ওঁদের সঙ্গীতা-বলী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেছেন। তারপরও কি বলা চলে না ওঁরা দেবতা ?

দেবতা। জন লেনন, পল ম্যাকার্টনি, রিঙ্গো স্টার এবং জর্জ হ্যারিসন—'বীটল'-অবতার' নামে পরিচিত 'পপ্' দেবচতুষ্টয় আজ উচ্চতর সমাজেও কার্যত দেব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন ছলে বলে কৌশলে যে কোনও পথে দেশের রাজা অথবা সম্রাটকে দীক্ষা দিতে পারলেই প্রজাবর্গের ধর্মান্তর ঘটত। ওঁরা সে পথে যাননি। আগে জনতার হৃদয় জয় করেছেন, নরগণের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা ক্রমে নিজেরাই

এগিয়ে এসেছেন। অবিশ্বাসী পল্ জনসন এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন : দেশ পালটাচ্ছে, সমাজ পালটাচ্ছে,—আমাদের কুলগুরুরা ভীত, সন্ত্রস্ত। পাছে লোকে বলে ওঁরা সেকেলে হয়ে গেছেন তাই ওঁরা হুল্লোড়বাজ ছোকরাদের অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করছেন। আদিতে 'বীটল'দের নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতির পিছনে হয়ত সত্যিই এটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু সমঝদার পর্যবেক্ষকরা বলেন,—সেকথা আজ আর সত্য নয়, 'বীটলস'রা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। নতুন করে আবার জন্মেছেন তাঁরা, নবীন রূপে, নতুন বেশে।

সর্বশেষ লং-প্লেয়িংটির মলাটে নিজেরাও সেকথা বলতে চেয়েছেন ওঁরা। ছবিতে দেখা যায় একটি কবর। ওপরে ছাঁটা-ঘাসে লেখা 'বীটলস্'। রসিকেরা বলবেন ওগুলো 'গ্রাস' বটে, কিন্তু যে ঘাস খেয়ে ঘোড়া ছাগল ইত্যাদি বেঁচে থাকে সে দুর্বাঘাস নয়, আসলে তা মারিয়ুয়ানার চারা। সে কবর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন একরাশ মানুষ। অনেক মুখই চেনা। মার্ক্স আইনস্টাইন, লরেন্স অব অ্যারাবিয়া, সোনি লিস্টন, মার্লিন মনরো ইত্যাদি। আর আছেন চার দ্বিগুণে আটজন 'বীটল।' চারজন তাঁদের মোমেগড়া প্রতিমা সম্ভবত মাদাম তুসোর যাদুঘর থেকে ধার করে আনা, অন্য চারজন বিচিত্র পোশাকে সকলের পুরোভাগে। ছবিতে তাঁরাই কেন্দ্রমণি। একদা চুলের বাহারের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন ওঁরা, কিন্তু এই নব্য-অবতারদের যেন—'গোঁফ দিয়েই যায় চেনা।' ছবির বক্তব্য : পুরানো দিনের 'বীটল'রা মরে গেছে। আমরা নতুন করে আবার জন্মলাভ করেছি।

তিন মাসে আড়াই লক্ষ কপি 'এল-পি' নিঃশেষ করে শ্রোতারা মেনে নিয়েছেন—হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আদি-অনুরাগীদের বয়স বেড়েছে, কিন্তু দেবতাদের মতই অনন্ত যৌবন যেন এই চারিটি ইংরাজ তনয়ের। অসাধ্য সাধন করেছেন ওঁরা,

আবার তারুণ্য ফিরিয়ে এনেছেন। সঙ্গীতের যে নবলোকের চৌকাঠের ওপারে আজ তাঁরা দণ্ডায়মান, অমরত্ব সেখান থেকে নাকি অতি সন্নিকটে। একবার সেখানে পৌঁছালে বরাতে চিরস্থায়ী আসন। পপ-দের পরিবর্তশীল পৃথিবীতে দৈবাৎ এমনটি ঘটে। নিত্য সেখানে আকাশে হাউই উঠছে, ফাটছে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে নভোমণ্ডলে কোন শুকতারা সন্ধ্যাতারা নেই, কেবলই ধূমকেতু। তারই মধ্যে এই স্থায়ী নক্ষত্রের গৌরব, 'বীটল'রা ভাগ্যবান বই কি!

দেবদুর্লভ ভাগ্য অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও। 'বীটল'রা আজকের পৃথিবীর অন্যতম ধনবান চার শিল্পী। লক্ষ লক্ষ রেকর্ড, ফিল্ম, টেলিভিশনে দর্শন দান, গানের বই অন্য পুঁথির রয়ালটি ইত্যাদি নানাসূত্রে বিরামহীন অর্থ বৃষ্টি চলেছে ওঁদের শিরে। রেখে ঢেকে বললেও জর্জ আর রিঙ্গোর হাতে আছে নাকি কম করেও মাথাপিছু ৩০ লক্ষ ডলার! ম্যাকার্টনি আর লেনন গান লেখেন! সুতরাং তাঁদের ব্যাঙ্কের রিপোর্ট আরও একটু ভাল। ওঁদের আছে নাকি মাথাপিছু ৪০ লক্ষ ডলার। এসব অনুমান। অনেকে বলেন,—ওঁদের হাতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা থাকাও অসম্ভব নয়। দেবতারা, অতএব অনেক দেবরাজ বা রানীর চেয়েও সচ্ছল।

থাকেনও ওঁরা সেভাবেই। দেবতা চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনজন বিবাহিত, ঘরে দেবী আছেন। তাঁদের নিবাস লণ্ডনের শহরতলী ওয়েব্রিজে। শহর থেকে সেখানে পালাতে চল্লিশ মিনিটের বেশি লাগে না। চার দেবতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর নাকি জন। সবচেয়ে রহস্যময় তিনি, সবচেয়ে সৃষ্টিশীল। জন ক্রমেই নাকি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন, জনতা থেকে দূরে দূরে থাকছেন। নেশা তাঁর লেখাপড়া। জন সুশিক্ষিত। সব সময়ই তিনি বই নিয়ে, বসে থাকেন শিল্প সাহিত্যে তাঁর অতিশয় আকর্ষণ। রাসেল থেকে গীনসবার্গ—জন নাকি বিস্তর পড়েছেন। নিজেও লেখেন কিছু কিছু।

প্রধানত কবিতা। তার চেয়েও বড় খবর—জন নাকি কবিতা বোঝেন। তিনি থাকেন একটি টিউডর বাগান বাড়িতে। সেখানে সুখের যাবতীয় বন্দোবস্ত সুসম্পূর্ণ। মায় একটি সুইমিং পুল। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী সিনথিয়া। তিনি শিল্পী, কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রী। চার বছরের একটি খোকা আছে তাঁর কোলে। জন লেনন পোশাক-পরিচ্ছদে একটু অদ্ভুত। যাত্রাদলের দেবতাদের মত জামা-কাপড় তাঁর; ব্রোকেড, ভেলভেট, জরিতে সে সব জবরজং সজ্জা। গৃহসজ্জায়ও একদিক থেকে জন অনন্য। তাঁর ঘরে টেলিভিশন সেট আছে পাঁচটি। টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি অগুন্তি।

অদূরে থাকেন রিঙ্গো, দলের ড্রামবাদক। বয়স—এখন উত্তর তিরিশ। তাঁর ধরন-ধারন সম্পূর্ণ অন্যরকম। 'বীটল'রা যখন গানের আসরে বসেন রিঙ্গো তখনই বাদ্যযন্ত্রে হাত দেন, অন্তবর্তী সময়ে হাত পাকাবার কোন চেষ্টা নেই তাঁর। তস্য পত্নী মরেন আগে ছিলেন লিভারপুলে হেয়ার ড্রেসার। ওঁদের দুই ছেলে। রিঙ্গোর বাড়িতেই অন্য দেবতাদের আড্ডা। পনের কামরার বিরাট বাড়ি, বিশাল চত্বর। গাছের ডগায়ও একটি ঘর তৈরী করেছেন রিঙ্গো। কারও যদি ইচ্ছে করে তবে তিনি সেখানে বসে ধ্যান করতে পারেন। পাতালেও ধ্যানের জায়গার অভাব নেই। রিঙ্গোর বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ সেখানে একটি এয়াররেড সেলটার আছে, আর আছে—'উড়ন্ত কাক' নামে একটি পানশালা।

তৃতীয়—জর্জ। জর্জ হ্যারিসন। বয়স—২৪। আমাদের এই উপাখ্যানে তিনি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুর। মাত্র কয় বছর আগে বিয়ে করেছেন জর্জ। স্ত্রী ভূতপূর্ব মডেল প্যাট্রি সুদর্শনা। জর্জ নিজেও রূপবান। গুণেও 'বীটল'দের মধ্যে তিনি অন্যতম। সাদা রঙের একটি বিরাট বাংলোয় সুখেই ছিলেন ওঁরা, জর্জ আর তাঁর নববিবাহিতা পত্নী। হঠাৎ কী থেকে কী হল, জর্জের মধ্যে

বিবাগীর লক্ষণ দেখা গেল। তিনি ভারত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, বিশেষত ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে। শোনা যায়, প্রেরণা—রবিশঙ্করের একটি রেকর্ড। মুগ্ধ জর্জ সেতারের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আঙ্গাদি নামে একজন ভারতীয়ের কাছে তিনি এই আশ্চর্য বাদ্যযন্ত্রটিতে প্রথম পাঠ নিলেন। তারপর ছ'মাস ভারতে কাটিয়ে গেলেন। গুরু তখন স্বয়ং রবিশঙ্কর। জর্জ এখন সেতারে ওস্তাদ না হলেও রীতিমত সুশিক্ষিত। তাঁর প্রেরণায় 'বীটল'রা নিজেদের সঙ্গীতে সেতারের বাদ্য যোগ করেছেন। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জর্জের উৎসাহেই তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীত এবং দর্শনের দিকে। জর্জ মনে করেন—ভারতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা সম্ভব। ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা করার ফলেই তিনি জেনেছেন—'বীটল'রা এখনও শৈশবে। তাঁদের সামনে অফুরন্ত পথ। জর্জের বাড়ির বাইরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত নানা চিত্রে এবং কার্টুনে বিচিত্রিত। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে কমপক্ষে এক ডজন গীটার এবং সেতার। বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে জর্জের তুলনা নেই। দিনরাত্রি সুর সাধনা করেন তিনি। তবুও তৃপ্তি নেই। ক্ষ্যাপার মত সঙ্গীতের আলোতেই কী যেন খুঁজছেন তিনি। বন্ধুরাও এক এক সময় যেন চিনে উঠতে পারেন না ওঁকে। এই নবীন তপস্বীই নাকি প্রথম তুলেছিলেন কথাটা। আধ্যাত্ম সাধনা, মানসিক প্রশান্তি—আমাদের কি তবে সত্যিই এসবের কোন প্রয়োজন নেই? উত্তর খুঁজতে গিয়েই পাওয়া গিয়েছিল মহর্ষি মহেশ যোগীকে।

তাঁর কথা পরে। আগে চতুর্থ সাধকের কাহিনীটি শোনা দরকার। তিনি পল। বয়স—২৮। স্নিগ্ধ, সুদর্শন, সদা হাস্যময় পলকে বলা যেতে পারে দলের মুখপাত্র। তিনি বাচাল, সামাজিক, চালাক এবং গীতিকারও বটেন। ক্লাব, নৈশভোজ, সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল, বান্ধবী—কিছুতেই তাঁর অরুচি নেই। আপাতত

তাঁর প্রিয় বান্ধবী অভিনেত্রী জেন অ্যাসার। কাগজে মাঝে মাঝে যুগল মূর্তিতে প্রকাশিত হন ওঁরা,—দেশময় তখন গুজবের ঝড় বয়ে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য বিয়ে করেছেন তিনি লিণ্ডা নামে একটি মেয়েকে। শহরেই উঁচু দেওয়ালঘেরা একটি বাড়িতে পল বাস করেন। কিন্তু দুনিয়ার সর্বসমস্যার মীমাংসা তাঁর ঠোঁটের ডগায়। পল নাকি 'এল এস ডি'ও চেখে দেখেছেন। এর মত তুরীয় আনন্দ নাকি আর কিছুতে নেই। পল বলেন—'এল এস ডি' জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। আমরা আমাদের মগজের দশ ভাগের এক ভাগকে বড়জোর কাজে লাগাই। ভেবে দেখ বৎসগণ, বাকি নয় ভাগকে যদি কাজে লাগানো যায় তবে কী কাণ্ডটাই না হবে। পল-এর অভিমত, রাজনীতিকরা যদি 'এল এস ডি' সেবন করতেন তাহলে বিশ্বের কোন সমস্যাই থাকত না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ—ইত্যাদি দুর্ভাবনা সব মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত!

'এল এস ডি' ওঁদের ব্যবস্থাপত্রে একটি দাওয়াই মাত্র। গানে ওঁরা যে কথাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তারও মর্মবাণী যেন এই মায়ালোকের মহাত্ম্য প্রচার। '৬৫ সনে ওঁরা গান রটিয়েছিলেন—'নোহায়ার ম্যান।' তার প্রথম কলি—'ডাজ নস হ্যাভ এ পয়েন্ট অব ভিউ, নো'জ নট হোয়ার হি ইজ গোয়িং টু!' অর্থাৎ—সে মানুষের কোন মতামত নেই, সে জানে না কোথায় চলেছে। গায়ক জানতে চাইছেন—'ইজ নট হি এ বিট লাইক ইউ অ্যাণ্ড মি?' আমরাও কি তারই মত নই? পরের বছর ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'পেপার ব্যাক' লেখকদের। অন্য গানেও একই বক্তব্য যেন। ওঁদের গানের নায়িকা ইলিনর রিগবী স্বপ্নলোকে বাস করেন। মুখে মুখোস পরে তিনি জানলায় এসে একটু দাঁড়ান। তাঁর আসল মুখটি থাকে দরজার পাশে একটি পাত্রে। ম্যাকেঞ্জি সারমন লেখেন তখন, সে সারমন কেউ শোনে না—ইত্যাদি। পরবর্তী গানের একটি কলি,—'ইট ইজ গেটিং

হার্ড টু বি সামওয়ান···।' নতুন রেকর্ডের একটি গান—'সি ইজ লিভিং হোম।' বাবা মেয়েটিকে সবই দিয়েছিলেন—অর্থের বিনিময়ে যা লভ্য সব। তবুও মেয়ে গৃহত্যাগী হল। কারণ সুখ দিতে পারেন জনক। টাকায় সুখ মেলে না। গান শুনে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মার্কিন 'হিপি'র মুখও—ম্যান, এ যে আমাদেরই কাহিনী।

অ্যাটলান্টিকের ওপারে এই 'বীটল' চতুষ্টর 'হিপি'দেরও দেবতা। খুঁজলে প্রাণের মানুষের সন্ধান মেলে না। সৎগুরু সন্ধানী 'হিপি'রাও ইতিমধ্যে বিস্তর মনেরঠাকুর খুঁজে নিয়েছে। তাদের দেবতারা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি না হলেও তেত্রিশ অবশ্যই। প্ল্যাটো, টমাস মোর, থেরো, গান্ধী। বুদ্ধ, হাক্সলি, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের জনৈক ইহুদি পয়গম্বর ইতালীয়ান সন্ন্যাসী, সেইন্ট অ্যাসিসি—আরও কত কে! কিন্তু 'পুষ্প শিশুদের, অন্যতম প্রিয় ঠাকুর 'বীটল'বর্গ। কেন না, 'বীটল'রা যে শুধু 'এল-এস-ডি' চোখ দেখেছেন তা-ই নয়, যে 'স্টেইট' বা বিষয়সর্বস্ব সমাজের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহ তথা প্রেমধর্মের প্রস্তাবনা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সুখী 'বীটলরা'ও। 'হিপি'রা বিদ্রোহী হয়েছে কুবের-দর্শনের বিরুদ্ধে। উৎপাদন-বিক্রয়-মুনাফা, লক্ষ্য—লক্ষ্য পূরণ সমস্যা—সমস্যা-পূরণ—ইত্যাদির জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রবৎ খাটতে রাজি নয় তারা। তারা তথাকথিত বুদ্ধিবাদী, ডলার কেন্দ্রিক সমাজকে ত্যাগ করে সন্নাসী হতে চায়। সে মোক্ষলাভের পথে অন্যতম সহায়ক 'এল-এস-ডি' আর 'গ্রাস' বা ম্যাক্সিকোর গঞ্জিকা। সমাজ বন্ধন কাটিয়ে 'হিপি'কে এই 'পিল্'টিই অতি দ্রুত নির্বাণের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।—তাই কি বলেননি 'বীটল'রা? ওঁদের কবরে তবে মারিয়ুয়ানার চারা কেন? তাছাড়া অতীতকে মাটি চাপা দিয়েছেন তো ওঁরাও। একজন 'হিপি' আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের অতীতকে কবর দিয়ে হাতে পুষ্পধনু নিয়ে উদিত হয়েছিল নাকি 'লাভ-ইন' বা প্রেম মেলায়!

ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন—আমেরিকার পক্ষে এই পুষ্পশিশুর দল লাল আলোর সংকেত। সম্ভবত এঁদের অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু 'বীটল'রা সংকেত সমগ্র পশ্চিমের অশান্ত মনের।—'এল এস ডি' আর গঞ্জিকাই কি মুক্তির শেষ পথ? গৌরবের শীর্ষে বসে ভাবতে বসলেন দেবগণ।

সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ভারত প্রত্যাগত জর্জ হ্যারিসন। নতুন করে প্রশ্ন চিহ্নের মত সামনে এসে দাঁড়ালেন ভারতীয় সাধক মহেশ যোগী। যোগী বললেন—বৎসগণ, শান্ত হও। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। তাঁকে লাভ করতে চাও? তবে এসো আমার সঙ্গে। 'এল এস ডি' মোক্ষের পথ নয়, যন্ত্রণা তাতে আরও বাড়বে মাত্র।

ওঁরা কান পাতলেন। তার পর মন্ত্রমুগ্ধের মত যোগীর সঙ্গে ধ্যানে বসলেন। ধ্যান যখন ভাঙল, চেঁচিয়ে উঠলেন রিঙ্গো—'আই ফিল গ্রেট!' সবই পেয়েছিলাম আমরা, অর্থ যা দিতে পারে—সব। তারপরও অতৃপ্তি ছিল। এবার তা মিটল।' এমন যে দুঃশীল পল, তিনিও কাঁদলেন,—মহর্ষির সঙ্গে আগে দেখা হলে 'এল এস-ডি' হাতে তুলে নিতে হত না আমাদের। জর্জ হ্যারিসন বললেন—'আমাদের সামনে অতঃপর অনন্ত ভবিষ্যৎ।'

বিশ্বময় আলোড়ন, স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন দেবতারা। 'বীটল'রা সন্ন্যাসী হতে চলেছেন। আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল। দৈনিক দর্শনীর প্রতিশ্রুতি—১০ লক্ষ ডলার। একদিনে দু' জায়গায় গাইতে হবে। ওঁরা জানেন, এ সব ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়। ১৯৬৪ এবং '৬৫ সনেও রাশি রাশি ডলার নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন ওঁরা। হ্যারল্ড উইলসন বলেছিলেন—সাবাস! তিনি ওঁদের শিরোপা দিয়েছিলেন—'আমাদের সেরা রপ্তানীদ্রব্য।' কিন্তু এবার রাজি করানো গেল না বালক চারটিকে। লোকে

কানাকানি করল—কারণ, মহর্ষি। মহেশ যোগীর পরামর্শ মত ছ'মাসের ছুটি নিয়ে ভারতে আসতে চান ওঁরা। হৃষিকেশের শান্ত পরিবেশে ধ্যানে বসে নিজেদের জানতে চান। অধ্যাত্ম-সাধনা হয়ত ভক্তের কাছে স্বর্গ সাধনা, কিন্তু সাধারণ সাহেব মেম যাঁরা লিভারপুলের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের এই বালক চারটিকে ধীরে ধীরে সুখস্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছেন, তাঁদের চোখে অনিবার্য-ভাবেই এই সিদ্ধান্ত আবার মর্তের ধূলিতে প্রত্যাবর্তনের সামিল। —নয় কি? পল-এর বাবা ছিলেন সামান্য একজন সেলসম্যান। জন-এর বাবা সংসারপলাতক, তিনি মাসীর কাছে মানুষ। জর্জ বাস ড্রাইভারের ছেলে, রিঙ্গো ডক শ্রমিকের। দারিদ্র্যের শৈশব ওঁদের সকলের। সে সব দুঃস্বপ্নের দিন যখন গত, অখ্যাত, অবজ্ঞাত বালকেরা যখন প্রায় দেবতায় পরিণত, তখন নিজেদের হাতে গড়া সুখের সাম্রাজ্যটি ভেঙে দিয়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীর পিছু ধাওয়া করা, —'ফুলস! ফুলস!' নিশ্চয় লিভারপুলের 'দি ক্যাভ্যান' নামে সেই পানশালাটি যেখানে ওঁদের প্রথম আবির্ভাব, সেখানে বীয়ার-ভাণ্ড হাতে নিয়ে অনেক দরিদ্র নারী পুরুষ ধিক্কার দিচ্ছে ওঁদের—'মূর্খ! মূর্খ!'

নির্বোধ বলবেন ওঁদের হয়ত এ দেশের সাধারণ মানুষও। অবশ্য রাজকুমার সিদ্ধার্থের মত ওঁরা কেউ বুদ্ধ হতে চাননি। নবীন তপস্বীরা সাধনা অন্তে আবার নিজ নিজ কাজেই ফিরে যাবেন, কথা তা-ই। তবু স্বর্গ শান্তি ইত্যাদি সম্পর্কে গরিবের ধারণা একটু অন্য রকম হলে সেটা বিস্ময়কর কিছু নয়। কিন্তু উপায় নেই। দেবতারা মর্তে নেমে আসতে বদ্ধপরিকর। শুধু 'বীটল' চতুষ্টয় নন, আসছেন আর এক সম্প্রদায় 'রেলিং স্টোন'রাও। তদুপরি অভ্যাগতের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন—ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা পত্নী হলিউড নায়িকা মিয়া ফারো। মিয়ার সঙ্গে আসবেন তস্যা কনিষ্ঠা ভগিনী—শ্রীমতী প্রুডেন্স। ওদিকে মনে

আজ অনেকেরই নাকি শান্তি নেই,—আত্মা অতৃপ্ত। ডেনমার্ক থেকে নিউজিল্যাণ্ড—পৃথিবীর পঁয়ত্রিশটি দেশে নাকি একজন ভারতীয় যোগী শান্তির সন্ধান দিয়েছেন লক্ষ মানুষকে। হয়ত হৃষিকেশ কিংবা কাশ্মীর থেকে শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরবেন এঁরাও। অথচ তাজ্জব ব্যাপার,—ভারত নিজে কিন্তু তবুও অশান্ত।

এ অশান্তি বলা নিষ্প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ দূর হয় যদি এক আধ ডজন নয়, ঝাঁক ঝাঁক 'বীটল' 'হিপি' ইত্যাদি পশ্চিম থেকে মাঝে মাঝে এক চক্কর এদিকে ঘুরে যান। আমাদের পয়সার বড়ই দরকার।

কিন্তু 'বীটল'দের তরফ থেকে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা বোধহয় অতঃপর কম। প্রথমত, হৃষিকেশ বাসের পর বিন্দুমাত্র বৈরাগ্য উদিত হয়নি ওঁদের মনে। এখনও ওঁরা নাকি সমান আসক্ত। কিন্তু বাদ সাধছে বয়স। 'বীটল'রা আর সেই কচি কাঁচা বালকদল নন, তাঁদের বয়স হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমে দেখা দিচ্ছে স্বাতন্ত্র্যবোধ। একজন দল ছেড়েছেন। অন্যরাও নানাভাবে বিব্রত। জন লেনন চিত্রশিল্পী সেজেছেন। জাপানী পত্নী য়ুকো ওনোর (Yoko One) সঙ্গে তাঁর যৌন-জীবন নাকি শিল্পী লেনন-এর কাছে একমাত্র আঁকবার বিষয়। সুতরাং, অচিরে যদি শোনা যায়, দেবতারা স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছেন তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। সিংহাসন নিশ্চয় শূন্য থাকবে না, ততদিনে নিশ্চয় আবির্ভূত হবেন নতুন দেবদল।

বস্তুত ইঙ্গিত সেদিকেই। ১৯৭০-এর অক্টোবরের সংবাদ—'বীটল'রা পতনোন্মুখ। লণ্ডনের সেভিল রো-এ 'বীটল'দের যৌথ প্রতিষ্ঠান অ্যাপল হেভ কোয়ার্টার-এর মাথায় কৃষ্ণপতাকা উঠছে। সম্প্রদায় হিসাবে 'বীটল'রা মৃত। তা-ই এই শোক। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, চার বীটলের এখন চার গোঠ। চারজনে একটি ফিল্ম তুলেছিলেন। নাম—'লেট ইট বি'। সম্প্রতি তার প্রদর্শনী শুরু

হয়েছে। ভক্তরা আশা করেছিলেন—অন্তত প্রথম রজনীতে চার বীটলকে একসঙ্গে দেখা যাবে। সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাঁরা অবশ্য এখনও সঙ্গীত চর্চা ছাড়েননি, কিন্তু দল ছেড়েছেন। ম্যাকার্টনি আর তাঁর স্ত্রী লিণ্ডা তাঁদের দুই সন্তানকে নিয়ে আস্তানা গেড়েছেন স্কটল্যাণ্ডে। সেখানে ওঁরা খামার চালান, ম্যাকর্টনি গানও লেখেন। জর্জ হ্যারিসনের গানের এক অ্যালবাম তৈরী হচ্ছে, শিগগিরই বাজারে বের হবে। জন লেনন আর তাঁর জাপানী সহধর্মিনীর বর্তমান ঠিকানা লস এঞ্জেলস। ম্যাকর্টনি দল ছাড়ার পর-ই উধাও হন তিনি। রিঙ্গোস্টার অবশ্য এখনও খুব সক্রিয়। তিনি আর তাঁর স্ত্রী মারন দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে হ্যাম্পষ্টেডেই আছেন। দুটো ফিল্ম তুলেছেন ইতিমধ্যে। শেষখানার নাম—'দি ম্যাজিক খ্রীষ্টিয়ান'। রিঙ্গো এখনও নিয়মিতভাবে অ্যাপল হেড-এ যাতায়াত করল। কিন্তু একথা জানেন—বিবাগীদের দলে ফেরার সম্ভাবনা অতিশয় কম। পপ-সঙ্গীতের এক জার্নালে ম্যাকার্টনি সরাসরি লিখেছেন—'আপনাদের প্রশ্ন: বীটলরা কি আবার এক হবে? এর সোজা উত্তর—না।'
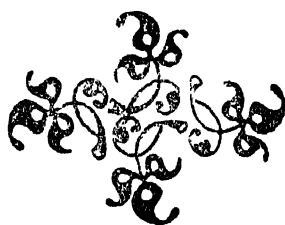
'কিছুদিন পরে বিলাত গমন করিলাম এবং দেখিলাম যে ইংলণ্ড বাঙ্গালীদের অধীনে থাকিয়া আর এক মূর্তি ধারণ করিয়াছে। কলেজ ও স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রধানত বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের আলোচনা হইতেছে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকেরা বিজেতাদিগের রীতিনীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মনে করিয়া তষরের জোড় পরিধানপূর্বক টিকি রাখিয়া সম্বুকের নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ছাত্রদের পড়াইতেছেন। ...ইংলণ্ডের আচার ব্যবহারেও অনেক পরিবর্তন দেখিলাম। সংস্কৃত শাস্ত্রে উদ্ভিদ ভোজন ও মদ্যপান হইতে বিরতির গুণ কীর্তিত আছে। সেই গুণ বর্ণন করিয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোক মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাঙ্গালী বিজেতারা মাছ ও পাঁঠা খাইয়া থাকেন ইহা দেখিয়া মাংসের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁঠা ও মাছ খাইতেছে।...লোকে ইংরাজী পিকেল ও সাস পরিত্যাগ করিয়া আঁবের আচার ও কাসুন্দি বিলক্ষণ প্রিয় জ্ঞান করিয়া খাইতেছে ও প্রতি বৎসর আঁবের আচার ও কাসুন্দি বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতেছে। ...অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঞ্জনের মধ্যে সুক্তনী, চড়চড়ি ও ফুলবড়ি ভাজার অধিকতর আদর দেখিলাম। তৈল মর্দন গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইস্টকর, কিন্তু দেখিলাম অনেক সাহেব

তৈল মর্দন আরম্ভ করিয়াছেন।...আরও দেখিলাম তাঁহারা চুরুট পরিত্যাগ করিয়া হুঁকায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। .'

আরও অবিশ্বাস্য সব দৃশ্যাবলী। বিবিরা 'গাউন অপেক্ষা সাটীকে সৌন্দর্যসাধক জ্ঞান করিতেছেন' 'অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং পল্লীগ্রামের যে সকল চাষা তাহা অবলম্বন করে না তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠলোকেরা গ্রাম্য (Pagan) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন।' শুধু তাই নয় 'কবর না দিয়া মৃতদেহ সৎকার করা হইতেছে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রচনার নাম—'আশ্চর্য স্বপ্ন।' লেখক—রাজনারায়ণ বসু। প্রকাশকাল—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রায় শতবর্ষ পরে আজ যদি কোন দর্শক ব্রিটেনে গিয়ে হাজির হন তাহলে তিনি সবিস্ময়ে দেখবেন কীপলিং বিলকুল ঠকে গেছেন, বিব্রত বোধ করছেন আমাদের প্রমথ চৌধুরীও। জয়জয়কার রাজনারায়ণের। তাঁর গণনা প্রায় নির্ভুল।

লোকে বলে কোন স্বপ্নই ষোলআনা ফলে না। খুঁতধরা বুড়োরা হয়ত বিচার করে বললেন—রাজনারায়ণ বসুর স্বপ্নও ফলেছে বড়জোর সোওয়া পাঁচ আনা। কেননা, তিনি লিখেছিলেন ইংলণ্ড একজন বাঙ্গালী 'বাইসরয়'-এর অধীন থাকবে। তা আর হল কোথায় ?—আফটার অল হাইকমিশনারকে তো আর আমরা 'বাইসরয়' বলতে পারি না! তিনি লিখেছিলেন—সাহেবেরা পাঁঠা খাবে। সত্য এমন কি লণ্ডনেও এখানে ওখানে আজকাল 'হালাল গোস্' বিক্রি হচ্ছে সে তো জবাই করা খাসি মাংস। পাঁঠা আর খাসি কি এক হল ? ঠিক তেমনই তিনি সাহেবদের তৈল মর্দনের কথা বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবরাও যে সোনার অঙ্গে তেল মেখে তা রোদ্দুরে ভাজবেন তেমন কথা তো কোথাও বলেননি। ইত্যাদি ইত্যাদি!

সমালোচনার ধারা শুনেই বুঝতে পারছেন বোধ হয়, ষোলআনা নয়, রাজনারায়ণ বসুর স্বপ্ন ফলেছে আঠারো আনা।

অক্সফোর্ডে অবশ্য কোন টিকিধারী নস্যভক্ত শ্বেতপণ্ডিতের দেখা পাইনি আমি, কিন্তু পথে ঘাটে সর্বত্র দেখেছি বাৎসায়নকৃত সেই সুখ্যাত পুঁথিটি। সেটা কি সংস্কৃতানুরাগের প্রমাণ নয়? তাছাড়া অনঙ্গরঙ্গেরও বেশ বিক্রি! হিন্দুধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহের কথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সাক্ষাৎ প্রমাণ নবীন তপস্বী তপস্বিনীগণ। যোগচর্চার ধুম প'ড়ে গেছে নাকি চতুর্দিকে। সংবাদ—উত্তোরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। লণ্ডন এখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। পিকাডেলি, অক্সফোর্ড সার্কাস, চ্যারিং ক্রস, ইউস্টন —সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বসন, গৌর ললাটে ফোঁটা তিলক।

নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গে ধুতি কোর্তা, সন্ন্যাসিনীর শাড়ি। সকলের মুখে এককথা—'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।' এই নাম কীর্তনের সুর দিয়েছেন বীটল-প্রবর জর্জ হ্যারিসন। এখন মুখে মুখে ফিরছে নাম-সংকীর্তন। শোভাযাত্রাও বের হচ্ছে মাঝে মাঝে। রথ যাত্রা, দোল যাত্রা—উৎসবও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাড়ম্বরে।

লণ্ডনে এই কৃষ্ণপ্রেমিকদের আবির্ভাব—১৯৬৬ সনের জুলাই মাসে। 'কৃষ্ণ কনসাসনেস সোসাইটি'র তখনই জন্ম। শুনেছি এই কৃষ্ণচৈতন্য আন্দোলনের প্রবক্তা জনৈক বঙ্গ সন্তান। নাম— শ্রী এ. সি. ভক্তিবেদান্ত। বয়স—চল্লিশ। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু ভক্তদের একজনের মুখে বিস্তারিত শুনেছি। সোসাইটির তেইশটি শাখা স্থাপিত হয়েছে আমেরিকা, কানাডা, জাপান, জার্মানী এবং ব্রিটেনে। লণ্ডনে তেইশতম কৃষ্ণ মন্দিরের দুয়ার খোলা হয়েছে ১৯৬৯ সনের ১৪ ডিসেম্বর। সোসাইটির একটি ছয়তলা বাড়িও আছে নাকি। ওঁরা হঠাৎ কেন এমন কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠেছেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার এখানে সুযোগ নেই। ডানিয়েল বেল-এর 'দি এণ্ড অব ইডিওলজি' কিংবা হার্বার্ট মারকিউস-এর 'ওয়াজ ডায়মেনশন্যাল ম্যান'-এ তার

কিছু ব্যাখ্যা মিলতে পারে। আপাতত খবর এটাই—লণ্ডন কৃষ্ণ ঠাকুরের প্রেমে হাবুডুবু।

শুধু আসন প্রাণায়াম আর নামৈব কেবলম নয়, আরও গভীরে ডুবতে চাইছেন নাকি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রজাবর্গ। নব্য কবি সাহিত্যিক নাট্যকারদের রচনায় নাকি উঁকি দিচ্ছে পূর্ব দেশের ধ্যান। মম হাক্সলি যেখানে ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধার থেকেই ফিরে গেছেন, ক্রিস্টোফার লগ কিংবা জন আরডেন নাকি সেখানে সৌখিন মজদুরিতে রাজি নন—ইংলণ্ডকে তাঁরা সেই স্বর্গে জাগরিত করতে চান—জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। বিলাতি পুষ্প-শিশুরা এজন্য স্বজাতির মস্তিষ্কে নিজ হাতে নির্দয় আঘাত হানতেও প্রস্তুত।

আঘাত হানা হচ্ছেও। 'অবজার্ভার' কাগজে দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন সিরিল ডান। বিষয়—যোগ। মস্ত মস্ত চিকিৎসকরা একবাক্যে বলছেন—যোগাভ্যাস দেহমনের পক্ষে পরম উপকারী। এসব সওয়ালে নাহয় বিজ্ঞানের ছোঁয়া আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান খানা-গানা নিয়ে যে পাগলামি চলেছে সেকেলে সাহেবরা তা দেখে সত্যিই নাকি চিন্তিত! সেতার এখন আর অদেখা অশ্রুত কোন বাদ্যযন্ত্র নয়, বীটলরা তো বটেই, রোলিং-স্টোন প্রমুখ অন্যান্য জনপ্রিয় পপ-সম্প্রদায়ে এল-পিতে তার ঝংকারকে সাদরে ঠাঁই দিয়েছেন। ইদানীং নাকি সানাইও রীতিমত সমাদৃত। তার চেয়েও গুরুতর সংবাদ—ওঁরা নাকি আমাদের রাগরাগিণীর সমজদারি প্রায় আয়ত্ত করে এনেছেন।

খাওয়ার টেবিলেও একই উলোট-পুরাণ। রাজনারায়ণ বসু আবের আচারের জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন, এই দর্শক এমন সাহেবও দেখেছেন যিনি পাঁপরভাজার লোভে তেল পুড়িয়ে তিরিশ মাইল ছুটে যেতেও পিছুপা নন। ডেলি মেল-এর খবর—তিরিশ

বছর আগে লণ্ডনে তিনটি ভারতীয় রেস্তরাঁ ছিল কি না সন্দেহ এখন সেখানে তাদের সংখ্যা কমপক্ষে—তিনশ।

খাবারের কথা স্বতন্ত্র! সাহেবদের মধ্যেই চলতি রসিকতা—ব্রিটেন যে শেষ পর্যন্ত বিদেশী হানাদারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে তার পেছনে একমাত্র কারণ আমাদের খাদ্য। এমন বিস্বাদ খাদ্য আর হয় কি? ওঁরা, অতএব অন্য ধরনের কোন খাদ্যের সন্ধান পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন! কারি কিংবা কাবাবের প্রতি ওদের দুর্বলতা তাই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পোশাক সম্পর্কে একথা বলা চলে না। সে বর্মটি তাঁরা এমন কি সাহারায়ও ছাড়তে রাজি হননি। আর আজ? বিবিরা তো 'সাটি' পরছেনই শুধু বারাণসীতে নয়, গ্রীষ্মে কোর্তা পরিহিত সাহেব টেমস তীরেও লভ্য। শোনা যাচ্ছে—ক্রমেই সেখানে গলাবন্ধ কোটের কদর বাড়ছে এবং কেতাদুরস্ত সাহেবরাও আজ 'এশিয়ানলুক' দেবার জন্য সিরিয়াসলি ব্যস্ত। ইঙ্গিত তার অন্যত্রও স্পষ্ট। লণ্ডন টাইমস-এর ফ্যাশনপাতায় পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছে ভারতীয় পোশাক ও স্টাইল। টাইমস প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বদলে খবর ছাপছে,—এই সংবাদের চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর এই ঘটনা। অনেকের কাছেই এ—বিপ্লব। চার্লস-এর মাথা কাটা যাওয়ার চেয়েও চাঞ্চল্যকর।

মিনি-বিপ্লব ওরফে টুকিটাকি পরিবর্তন আরও অনেক ঘটেছে। সাহেবেরা থলোহুকোয় তামাক খাচ্ছেন না বটে, কিন্তু শোনা যায় নব্য আমেরিকানদের মত বেশ কিছুসংখ্যক নবীন ইংলিশম্যানও গাঁজা ধরেছেন। সিগারেট থেকে এক লাফে গঞ্জিকা,—ডবল প্রমোশন বই কি! ওদিকে রীতা ফারিয়ার মাথায় মুকুট তুলে দিয়ে ওঁরা যদি জানিয়ে থাকেন কৃষ্ণাঙ্গী-ভেনাসতত্ত্ব আর গুজব মাত্র নয়, তবে জনৈক আমেরিকান সাংবাদিক জানাচ্ছেন, তিনি

নিজের কানে শুনেছেন ভারতীয় বাস কণ্ডাক্টার শ্বেতাঙ্গিনী যাত্রীকে বলছেন—'লুভ'। তারপরও কি আপেক্ষ করতে হবে 'বাইসরয়' নেই বলে! যে যাই বলুন, আমার সন্দেহ নেই—আমাদের ইংলণ্ডবিজয় প্রায় সমাপ্ত।

এ বিজয় যাঁরা সম্পূর্ণ করেছেন তাঁরা সকলেই অবশ্য বাঙালী নন। তবে রাজনারায়ণ বসু জানলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হতেন যাঁদের রণকৌশলের জন্য আজ ব্রিটেনের মাটিতে ভারতের বিজয় পতাকা উড়ছে সেই প্যারাস্যুট বাহিনীটি পুরোপুরি বাঙালীদের নিয়ে গঠিত। সরকারী হিসাব সংখ্যা সারল্যে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। হিসেবটা কয়েক বছর আগের। ইতিমধ্যে নিশ্চয় আরও গেরিলা অনুপ্রবেশ করেছেন। কেউ পাচকের ছদ্মবেশে, কেউ ছাত্রের, কেউ বা চিকিৎসক কিংবা কারিগরের পোশাকে। তাছাড়া যাঁরা কোনমতে একটা ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছেন মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাঁরাও নিশ্চয় ফৌজের কলেবর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং ভারতীয় ফৌজ হয়ত এতক্ষণে দুই লাখে পৌঁছে গেছে। এদের সঙ্গে যোগ করতে হবে সহোদরপ্রতিম পাকিস্তানীদেরও। তারা আরও দেড় লাখ। তদুপরি আছেন জ্ঞাতিভাই ক্যারিবিয়ান-এর আগন্তুকরা; তাঁরা পাঁচ লাখ। তৎসহ যোগ করতে হয় এশিয়া, আফ্রিকার অবদান আরও দেড় লক্ষ। সব মিলিয়ে দশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ! সর্বশেষ খবর, ওঁরা মিলিয়নের অঙ্ক পার হয়ে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন।

* এক মিলিয়ন, তথা দশ লক্ষ মানুষ ছোট্ট ব্রিটেনের কাছেও নাকি নস্যতুল্য! (কিছু কিছু দুঃসাহসী এখনও তাই বলছেন।) কেননা, ব্রিটেনের জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটির উপর। কৃষ্ণাঙ্গরা অনুপাতে এখনও শতকরা দেড় ভাগের বেশি নয়। মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ যদি সব লালে লাল করে দিয়ে থাকতে পারে ব্রিটানিয়া যদি তরঙ্গকে পর্যন্ত হার মানিয়ে থাকতে পারে তবে একশ'

অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সনও কি পারবে না দেড়জন কালোকে বশে রাখতে? যুক্তিটা অকাট্য। শ্বেতসাগরে কৃষ্ণাঙ্গরা এখনও সত্যিই বিন্দুমাত্র। তবু যে হার মানতে বাধ্য হলেন ওঁরা, গোপনে বলছি,—সে শুধু বাঙালীদের জন্য। আরও স্পষ্ট করে বলব? শ্রীহট্ট আর চট্টগ্রামের বাঙালদের জন্য। আর সব রণক্ষেত্রের মত ব্রিটেন জয়ের লড়াইয়েও শিখদের অবদান অনস্বীকার্য। ব্রিটেনে প্রতি পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন পঞ্চনদীর তীর থেকে আগত। কিছু-কাল আগে অ্যালবার্ট হলে তাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্বেতকন্যা পামেলা উইলাম ওরফে শ্রীমতী মনজিৎ কাউর সে-সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক। তিনি সগর্বে জানিয়েছেন—ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই গুরুদ্বার স্থাপিত হয়েছে পঁয়ত্রিশটি—আমি মনে করি, এদেশে ধর্মবিশ্বাসী শিখ যত আছেন খ্রীষ্টান তত নেই! শিখ-ধর্মের জয়যাত্রা নিশ্চিত।' অবদান আছে নিশ্চয় গুজরাটীদেরও। কিন্তু বাঙালীর কৃতিত্বের কাছে সবাই যেন ম্লান। শুধু একটি তথ্য বলি। গার্ডিয়ান-এর অভিমত ইংরাজী ভাষায় 'কারি' শব্দটির প্রথম আবির্ভাব ১৫৯৮ সনে। উনিশ শতকে ভারতীয় 'কারি' চেখে দেখার জন্য বিজ্ঞাপনও ছাপা হত বিলিতি কাগজে। বলা হত 'কারি'র অনেক গুণের মত একটি—'ইহা সৃষ্টি কর্মে সহায়ক।' তবু যে 'কারি' সেদিন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি তার পিছনে একমাত্র কারণ: তাহেরভাই, রহিমুদ্দি, এনায়েত মিঞা এঁরা কেউ তখনও এ পাড়ায় স্থায়িভাবে ছাউনি ফেলেননি। আর ব্রিটেনে যত 'ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ' টেকনিক্যালি বললে তাদের চৌদ্দ আনাই যদি পাকিস্তানী তবে মাদ্রাজ-কারি, মোগলাই-কারি ইত্যাদি যাবতীয় 'কারি'ই শ্রীহট্টের কারিগরদের সৃষ্টি!

এঁরা কেউ একদিনে আসেননি। ছত্রী সৈন্যদের মতই এসেছেন কখনও একা, কখনও বা দু'তিনজনের ছোট্ট দল সাজিয়ে।

আগে এসেছে সিলেটের বাদল, তারপর তার ছোট ভাই, তারপর ভাগ্নে, তারপর মামা, ক্রমে মামার শালা পিসের ভাই। প্রথমে আলিহুসেন, তারপর তার ফুপা ভাতিজা। স্বজনেরা ফুরিয়ে গেলে নিমন্ত্রণের চিঠি গেছে গাঁয়ের লোকের নামে। পাঞ্জাব অঞ্চলেও মোটামুটি একই রীতি। প্রথমে নিঃশব্দে টুপটাপ ঝরে পড়লেন ক'জন, তাঁদের বলা চলে—অ্যাডভান্সগার্ড। তাঁরা পজিশন নেওয়ার পর ইশারায় ডাকেন অন্যদের। ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান গড়ে উঠেছে এভাবেই। নিন্দুকেরাও বলেন না ইংরেজরা কাপুরুষ। সপ্তদশ অশ্বারোহীর পায়ের শব্দ কানে আসামাত্র দুয়ারে খিল দেবেন মোটেই তাঁরা সে পাত্র নন। দুয়ার তাঁদের এমনিতেই অষ্টপ্রহর বন্ধ থাকে। টেলিভিশনের নামে খোলা থাকত একমাত্র বাইরের দুয়ারটাই। বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র হারম্যাজেস্টির তরফে কড়া পাহারা মোতায়েন হল সেখানে। প্রথমে '৬২র আইন, তারপর আরও নানা ধরনের প্রাচীর। হায়, তবু নিয়তিকে ঠেকাতে পারলেন না ওঁরা, পরাজয় যেন অবধারিত।

পরাজয় সর্বক্ষেত্রে। সবচেয়ে প্রকট বোধহয় নৈতিক পরাজয়। সাহেব 'সুবিচার' দেখাতে পারছেনা। সাহেব বর্ণ বৈষম্যের দায়ে।

তার জের ওখানেই নেমে থাকেনি। নানা ব্যাধির লক্ষণ দিকে দিকে। কালোরা আপন আপন এলাকায় থাকে। যথা লণ্ডনের সাউথল কিংবা ল্যাডাব্রাক গ্রোভ, বার্মিংহামের স্পার্কব্রুক বা বালসাল এলাকা কিংবা ম্যানচেস্টারের মস্ সাইড। সে-সব বস্তিতে পূর্বদেশের যাবতীয় ব্যাধি; দারিদ্র্য, শিশু-মৃত্যু, অপুষ্টি, হিংস্রতা, উন্মাদনা, মাদকাসক্তি,—ইত্যাদি। বৃহত্তর সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। আত্মীয়তা স্থাপিত হচ্ছে অন্ধকারে,—পতিতালয়ে, মাদকদ্রব্যের চোরা কারবারে, সস্তা আমোদের গ্রীনরুমে। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে ক্রমে জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভও।

যাদের জন্ম ব্রিটেনের মাটিতে, যাদের শিক্ষা এদেশের স্কুলে কলেজে তারাও অবশিষ্ট সমাজের চোখে সম্পূর্ণ আপন নয়। সুতরাং, নিজেদের মধ্যে নির্ভরতা বাড়ছে। জন্ম নিচ্ছে—কালোদের নিজস্ব ক্লাব, দোকান, ধার-করার কেন্দ্র ইত্যাদি। নির্বাচনেও ইদানীং তারা নিজস্ব প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছে। এ সব ইংরাজের পক্ষে পরাজয় বই কি!

একথা মনে করবার কোন কারণ নেই ইংরেজ বিনা যুদ্ধে হার মেনেছে। যুদ্ধ হয়েছে। ঘোরতর যুদ্ধ। এখনো হচ্ছে। পার্লামেণ্টে, রাজনীতিতে, কলে কারখানায়, অফিসে আদালতে, পথে ঘাটে—সর্বত্র। যুদ্ধ হয়েছে হৃদয়ের মধ্যিখানেও। কানু-বিনা-গীত নেই, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জীবনেও আজ শয়নে, স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণচিন্তা চমৎকারা। ইমিগ্রেশান, ইনটিগ্রেশন, রেস রিলেসনস—চিন্তা বিবিধ।

সত্তরের নির্বাচনে টোরিদের বিজয়ের পর চিন্তা আরও বেড়েই গেছে। বিশেষত ওই নির্বাচনে টোরি পক্ষে অন্যতম লড়িয়ে ছিলেন—ইনক পাওয়েল। তিনি তো কালোদের দেশ ছাড়া করতে পারলেই খুশি। অনেকের ধারণা টোরিরা এতদূর যাবেন না। তবে নির্বাচনী ইস্তাহারের যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে শ্রমিকদলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে ওদের আচরণ একটু অন্য রকম হবেই। শ্রমিকদলের নীতি ছিল—একবার 'জব ভাউচার' নিয়ে ব্রিটেনে ঢুকতে পারলে কৃষ্ণাঙ্গরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখানে থেকে যেতে পারবে। তখন সে অন্য দেশের পাসপোর্টধারী হলেও ব্রিটেনের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। টোরিদের কথা—'জব ভাউচার' কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য মাত্র এক বছরের জন্য দেওয়া হবে। পর পর চার বছর সে অনুজ্ঞা হাতে রাখলে পর পঞ্চম বর্ষে সে বিশেষ নাগরিক অধিকারের দাবি জানাতে পারবে। ইনক পাওয়েল আরও এককাঠি উপরে। তাঁর কথা—

কমনওয়েলথ নাগরিকদের 'জব ভাউচার' দেওয়া চলবে না। যারা এদেশে আছে তারাও পুরো নাগরিক অধিকার পাবে না। শ্রমিক দল কমনওয়েলথ-এর কর্মীদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে এদেশে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। টোরিরা পরিবারের সংজ্ঞা আরও ছোট করতে চাইবেন। শ্রমিক আমলে কোনও বহিরাগত স্বদেশে ফিরতে চাইলে এবং এ-ব্যাপারে তার অক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে সরকারী সাহায্য মিলত। টোরি নীতি হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা, লোককে দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা। ইনক পাওয়েল চেয়েছিলেন—ফিরে যাওয়াটাকে বাধ্যতামূলক করতে। এসব ভবিষ্যতের কথা। আপাতত আজকের রণাঙ্গনের দিকেই একবার তাকানো যাক।

সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রটিকে ভাগ করা যায় চারটি ফ্রণ্টে ;—বাড়ি, কাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা। সাহেবদের যথেষ্ট ভাল বাড়ি নেই। অদূর ভবিষ্যতে ওদের নাকি পঞ্চান্ন লক্ষ নতুন বাড়ি দরকার। দেশে এখনও প্রায় দশ লক্ষ পরিবার আছেন যাঁরা অন্য পরিবারের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বাস করেন। বিলিতি চোখের সেটা অসহ্য পরিস্থিতি। তারই মধ্যে এসে কড়া নাড়তে শুরু করছেন আগন্তুক দল। উঁকি দিয়ে মুখটি দেখে আবার দুয়ারে খিল আঁটছেন ল্যাণ্ডলেডি,—দুঃখিত, মাপ করতে হবে। এটা প্রতিপক্ষের রণকৌশলের একদিক। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে—শতকরা ছাব্বিশটি বাড়ির বিজ্ঞাপনেই আকারে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয় 'কালোদের জন্য নয়'। ১৯৬৭ সনে আর এক সরকারী সমীক্ষায় জানা যায়—তিন ভাগের দুইভাগ বাড়িওয়ালাই কালোদের বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি নন। সরকারী বা কাউন্সিল-এর বাড়িতেও একই অবস্থা, কুড়িজন কালোর মধ্যে একজন সে-বাড়ি পায় কিনা সন্দেহ। পেলেও নিম্ন শ্রেণীর কাউন্সিল-বাড়িতে,—শহরের এক কোনে। মতলব আসল বাড়িগুলো কৃষ্ণ-মুক্ত রাখা। অন্যরা জবাব দেন অন্যভাবে। ল্যাণ্ডলেডি সবিনয়ে

এবং সহাস্যে বলেন—আমার কোন আপত্তি নেই, আমি বাড়ি ভাড়া দিয়ে খাই, ভাড়াটে পেলেই হল, মুশকিল এই পড়শিদের নিয়ে!

এস্টেট এজেন্টরাও কোন না কোন অজুহাতে পাশ কটিয়ে যেতে পারলেই খুশী। তা যাঁর খুশী তিনি পিঠ ফিরিয়ে থাকুন, এভাবে কি আর জুলিয়াস সীজারদের ঠেকিয়ে রাখা যায়? থাকার মত জায়গা পেলাম না, এই ওজুহাতে কি আর কোন আলেকজাণ্ডার কাজ শেষ না করেই কোনদিন ঘরে ফিরেছেন? ভাড়া পাওয়া যায়নি, উত্তম, তবে এবার বাড়ি কিনেই ফেলা যাক। সেখানেও নানাভাবে প্রতিরোধ চেষ্টা। কিনতে চাইলেই পছন্দসই এলাকায় বাড়ি পাওয়া যায় না। অন্তত একটি শহরে সিটি-কাউন্সিল কৃষ্ণাঙ্গদের ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ ওরা সাদাদের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ি কিনে ফেলছে। পাওয়া যায় প্রধানত সেইসব এলাকায় যেখান থেকে সাদারা উৎকৃষ্টতর কোন অন্য পল্লীতে সরে যাচ্ছে। অথবা ভিক্টরীয় আমলের ত্যক্তপ্রায় বাড়িগুলো। যথা বার্মিংহামের বলসাল হীথ। সেখানেই হলগ্রীনে কোন কৃষ্ণাঙ্গ বাড়ির মালিক হতে পারছেন না। বীয়ার-এর মগে চুমুক দিয়ে হলগ্রীনের শ্বেতবাসিন্দা সগর্বে বললেন—ওপাড়ায় হচ্ছে না। আসুক না একটি কালো পরিবার। দেখবে পরদিন সকালে বারো আনা সাদা পরিবার ওখান থেকে সটকে পড়েছে! প্রতিরোধের হেতু একাধিক। কালোরা এলে এলাকার মান কমে, ফলে দামও। তার হেতু—ওদের পরিবারের কোন মাপ নেই। কাচ্চাবাচ্চায় বাড়ি ভর্তি। তাছাড়া, আগে যে বাড়িতে ছিল একটি পরিবার সেখানেই হয়ত বাস করবে বারো-ঘর। ওরা বাড়ির যত্ন করতে জানে না, বাগানের মর্ম বোঝে না, পড়শিদের কথা ভাবে না। তদুপরি হেঁসেল নির্গত ওই গন্ধ। বার্মিংহামের এক মহিলা বলেছিলেন—ওই দেখ, জানালায় পর্দার জায়গায় সায়া ঝুলছে! নিজের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যও দেখতে হবে!

আপত্তি ওদের সব কিছু সম্পর্কেই। এক জায়গায় অভিযোগ

উঠেছিল—ভারতীয়রা সাধারণ স্নানাগারগুলো শুকিয়ে দিচ্ছে। 'ওরা আমাদের মত স্নান করে না। প্রথমে গরম জলে গা রগড়ায়, তারপর আবার তা করে। তৃতীয় বালাতিতে তবে ওদের স্নান সারা হয়! 'সুতরাং, উচিত ওদের থেকে পয়সা আদায় করা।

পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ—ওদের যৌন জীবন যাচ্ছেতাই। ওরা শোবার ঘরে মেয়েদের কাপড় ছেড়ে বিছানায় আসতে বলে! পাকিস্তানীদের এই ঘরের খবরটি দিয়েছিলেন যিনি তিনি কিন্তু কোনও পাক-ললনা নন, একজন শ্বেতাঙ্গিনী।

বাড়ির মালিক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, পল্লীবাসীরা আপত্তি তোলেন, ধার দেনেওয়ালা কোম্পানিগুলো চড়া সুদ দাবি করে, কখনও কখনও 'আফগান ব্যাঙ্কের' মত টাকা দেওয়ার আগে সেলামিও আদায় করে! ইসলিংটন-এ একজন নাইজেরিয়ান অভিযোগ করেছিলেন বাড়ি ভাড়া পাওয়ার আগে তাঁকে বিস্তর সেলামি দিতে হয়েছে। নগদ দিতে হয়েছে আশী পাউণ্ড, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন তিন হাজার দু'শ নারকেল! তবুও ওঁরা বাড়ি কেনেন। ত্যক্তবিরক্ত ক্ষুব্ধ বধূ অবশেষে শাশুড়ি পদে উত্তীর্ণ, স্বভাবতই বাড়ির মালিক হিসাবে ভাড়াটেদের প্রতি তাঁদের আচরণ সব সময় সহানুভূতিসূচক নয়। তা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না,—রেলের কামরায় ঠাঁই নিয়ে মারামারি করে নির্বোধেরাই। অন্তত কিছু কিছু ভারতীয়ের তা-ই অভিমত।

কর্মক্ষেত্রেও তাই! হঠাৎ এভাবে পররাজ্য-আক্রমণের পিছনে স্বদেশীদের ঠেলাঠেলি যদি একটি কারণ হয়, তবে সন্দেহ নেই সেই 'পুস'-এর সঙ্গে কিছু কাজ করেছে সাগরের ওপারের 'পুল' তথা আকর্ষণ। আমাদের ইতিহাস সাক্ষী, কোন বৈদেশিক হামলাই পুরোপুরি বিদেশীদের কেরামতি নয়,—স্বদেশে অনুকূল হাওয়াও ছিল বই কি। ভারতীয় আক্রমণকারীরা সেসব ভেবে চিন্তেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এখানে। শূন্যস্থানগুলো পূরণ করাই ছিল ওঁদের

মতলব। সে মতলব পূর্ণ হয়েছে বটে, তবে আংশিক ভাবে। কাজ ওঁরা পেয়েছেন, কিন্তু সব সময় মনের মত কাজ নয়। প্রতিরোধের কৌশল এখানেও রকমারি। অনেক জায়গায় 'কোটা' আলাদা করে রাখা হয়েছে,—শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি কালো নিতে পারবে না! কালোদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নানাবিধ। যথা: ওরা কাজ করতে চায় না, ওদের দেখলে সাদা শ্রমিকেরা আপসেট হয়ে যায়। ওরা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে চায় না, খাবারের জিনিসে ওদের হাত দিতে দিলে খদ্দেররা মনক্ষুণ্ণ হন, কাউণ্টারে ওদের দাঁড় করিয়ে দিলে জেনানারা দোকানে ঢুকতে চান না, ইত্যাদি। একজনের খোলাখুলি কথা—তুমি কি মনে কর কোন 'হাফ-কাস্টকে' গাড়ির সেলসম্যান করলে কাজ হবে? আমি বলছি একখানা গাড়িও বিক্রি হবে না।

অতএব ওঁরা সাধারণত সাধারণ, অতি সাধারণ কাজ পান। রাস্তা সাফাই, ইঁট তৈরী, বাড়ি তৈরী কাপড়ের কলে শ্রমিকের কাজ, বাস ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার—এক কথায় কালোরা প্রধানত দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে পাউণ্ড শিলিং অর্জন করেন। বিশেষত, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা। ওঁদের মরদেরা যদি রেল-বাসের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, মেয়েরা তবে দায়িত্ব নিয়েছেন ব্রিটেনকে সাদা রাখবার। তাদের অন্যতম পেশা—কাপড় ধোলাই। ভারতীয়রাও শ্রমিকবাহিনীতে আছেন। তবে অন্য কাজেও কেউ কেউ ঠাঁই পেয়েছেন। পোস্ট অফিস, হাসপাতাল, কোন কোন সরকারি দফতর—কালো মুখ কিছু কিছু সবখানেই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ভারতীয় আর পাকিস্তানী ডাক্তার-সাহেবদের। একটি গল্প বলি।

'ডেইলি মিরার'-এ একজন শ্বেতাঙ্গ পাঠকই দেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন এই গল্পটি। সেদিন সকালে ডাক্তারের জন্য আমরা সার্জারিতে অপেক্ষা করছি। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এক পাকিস্তানী এসে সোজা এগিয়ে গেল ডাক্তারের ঘরের দিকে। আমি আর পারলাম না, ছুটে গিয়ে বললাম—উই আর বিফোর

ইউ। ইউ টেক ইওর টার্ণ।—আণ্ডারস্টাণ্ড? লোকটি হেসে বলল—নো, ইউ আর আফটার মি।- মি ডক্টর।—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

কালোরা কাজ পাচ্ছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও খুব উঁচু আসনে নয়। গার্ডিয়ান-এর একটি রিপোর্টের শিরোনামা—ওয়েস্ট অব ইণ্ডিয়ান গ্রাজুয়েটস। তাতে সাউথল-এ এক হাজার ভারতীয় গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁরা স্কুল মাস্টারী করার যোগ্যতাও রাখেন। কিন্তু স্কুল মাস্টারের কাজ পেয়েছেন মাত্র জনা দশেক! একই খবর অন্যত্র। এম এ বিটি ডাকপিয়নের কাজ করছেন, ইংরাজীর এম এ টাইপিস্ট হয়েছেন। ছোট পদে আছেন যাঁরা ভবিষ্যতে তাঁরা উঁচুপদ পাবেন এমন সম্ভাবনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কৃষ্ণাঙ্গের সামনে মই বিশেষ নেই। শ্রমিকদের একাংশ কালোদের অধীনে কাজ করতে চান না। মালিকেরাও নাকি মোটেই কৃষ্ণাঙ্গপ্রেমিক নন। কিছুকাল আগে (এপ্রিল, ১৯৬৭) এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পাঁচশ মালিক স্তরের শ্বেতাঙ্গকেও জেরা করা হয়েছে। ফলাফল কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গের ভাষারই 'অভাবিত'। একজন মালিক বলছেন—'নো ব্ল্যাক বাস্টার্ডস ওয়ানটেড!' অন্য একজনের সাফ কথা—'নিজেদের দেশে ফিরে যাও না কেন বাছাধন?'

ওঁরা তবু ফিরছেন না। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। নানা রোগের ডিপো ওঁরা। ম্যালেরিয়া, অ্যানিমিয়া, যক্ষ্মা, বসন্ত, কুষ্ঠ, যৌনব্যাধি—কী না হয় ওদের? শ্বেতাঙ্গ মহলে একটি খুব জনপ্রিয় অভিযোগ—ওরা দেশে যৌন ব্যাধি ছড়াচ্ছে। কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে নাকি ওসব রোগ দেখা দিচ্ছে। (আশ্চর্য এই ব্যাধিগুলোরই এককালে ভারতে নাম ছিল 'ফিরিঙ্গী-ব্যাধি'!) এত সব রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা, সে কি চাট্টিখানি কথা?—তার চেয়ে, হেলথ ইনসিওরেন্স-এ আমরা বরং আরও দুটি 'বব' দিচ্ছি জাহাজে তুলে ওদের পার করে দিয়ে আসা হোক

—দাবি করছেন কোন কোন উদ্বিগ্ন শ্বেতাঙ্গ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে ভাবিত অনেক শ্বেতাঙ্গ অভিভাবকের মনের কথাও তা-ই। ১৯৫৬ সনে লণ্ডনে বিদেশী ছাত্র ছিল আট হাজার। প্রাথমিক স্কুলগুলোতে কালো-বালকেরা তখন প্রতি পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ পিছু একজন, সেকেণ্ডারি স্কুলে শতকে এক। ১৯৬৪ সনে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটত্রিশ হাজার। শহরের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে প্রতি নয়জনের মধ্যে একজন কালো মানিক! কোন কোন শহরে কোন কোন স্কুলে শতকরা চল্লিশ জন ছাত্রই কালো। সত্তরের এই দশকে লণ্ডনের কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতি ছয়জন স্কুল বালকের মধ্যে একজন হবে—'ব্ল্যাক-ব্রিটন'। এদের পাল্লায় পড়ে ছেলেরা গোল্লায় যাবে না কি? —শ্বেতাঙ্গ জননীর প্রশ্ন।

সুতরাং থেকে থেকে হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়: 'ব্ল্যাকস ইনভেড ব্রিটেন!' 'রেডস কাউণ্ট অন ব্ল্যাকস!' 'ব্ল্যাকস সীক হোয়াইট ওম্যান!'

'আমেরিকা পোরিং নিগ্রো ট্রুপস ইন টু ব্রিটেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলো 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট নিউজ' নামক একটি কাগজ থেকে উদ্ধৃত। কাগজটি খুব চালু ছিল ১৯৫৯ সনে। হালে এ ধরণের ধ্বনি শোনা যায়নি এমন নয়। '৬৫ সনে ব্রাইটনে জনৈক রেমণ্ড বামফোর্ড 'রেসিয়াল প্রিজারভেশন সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গড়েছিলেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার নাকি সে কি শাখা বিস্তার। দু'হাজার সদস্য ছিল সেই শ্বেতসংঘে। ওদের মুখপাত্র ছিল একটা, প্রচার সংখ্যা—দশ লক্ষ! সাদাদের বাঁচাও আন্দোলনের আর এক নেতা জেমস ডয়েল। তাঁরও নিবাস ব্রাইটন। তবে কর্মকাণ্ড ওঁদের তামাম দেশময়। বার্মিংহামে ওদের কাগজ ছিল দুটি 'মিডল্যাণ্ড নিউজ' আর 'ক্রিশ্চিয়ান রিভিউ।' কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামা—'ইজ উইলসন কম্যুনিস্ট?' 'স্টুপিড হোয়াইট মেন' 'লেপ্রসি

ওয়ার্নিং' ইত্যাদি। ম্যানচেস্টারেও এ ধরণের কাগজ ছিল একটা। নাম—'ম্যানচেস্টার ফ্রী গেজেট।' ডেলি মেল-এর সংবাদ (আগস্ট ১৯৬৬): চেশায়ারে টাইপ-করা হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হচ্ছে। তার নাম—'বাইবেলের শিক্ষা।' প্রচারকের বক্তব্য: জাতি ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। ঈশ্বর ইচ্ছা করেই কিছু মানুষকে সাদা করে গড়েছেন। সৃষ্টিকালেই তিনি বলে দিয়েছেন—সাদারা শ্রেষ্ঠ।

'চার্চ টাইমস'-এ জনৈক পত্রলেখকের প্রশ্ন—হে ঈশ্বর, কালোদের কেন সৃষ্টি করলে? 'ডেইলি মেল'-এ আর একজনের জিজ্ঞাসা—আদম এবং ইভ দু'জনেই শ্বেতবর্ণ ছিলেন তবে এই কৃষ্ণাঙ্গ দল এল কোথা থেকে? 'ব্রিটেনকে সাদা রাখ' এই উদ্দেশ্য নিয়ে দেশময় একটি সংঘ গড়ে তোলা হয়েছে '৬৬ সনের জানুয়ারিতে। তার নাম—ন্যাশনাল ইয়ুথ মুভমেন্ট। সদস্যদের বয়স চৌদ্দ থেকে একুশ। আসলে এটি চরম জাতীয়তাবাদী দল ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির একটি শাখা মাত্র। ওদেরও কাগজ আছে একটি। তার নাম 'বাগলার।' তাতেও আগ্নেয় সব রচনাবলী। ওঁরা যে সব সময় কলম হাতে লড়ছেন তা নয়, কখনও কখনও ক্রোধ সত্যি সত্যিই আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। দাঙ্গার কাহিনী নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা সর্বজনবিদিত। ব্রিটেন তা এড়াতে পারেনি। টুকিটাকি দাঙ্গা, এবং নিগ্রহের ঘটনা এখনও ঘটছে। 'রেস রিলেশান্স অ্যাক্ট' চালু হওয়ার পরেও তার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে আসরে আবির্ভূত হয়েছে 'স্কীনহেড্স'। তাদের 'পাকিবাসিং'-নামক বিচিত্র খেলার কথা আগেই বলেছি।

অবশ্য কোনও কোনও শ্বেতাঙ্গ সলজ্জভাবে কৈফিয়ৎ দেন—এসব ঘটনার সঙ্গে সাদা কালো প্রশ্ন জড়ানো ঠিক নয়। এসব নিছক গুণ্ডামি।

কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহের ঘটনা নিত্যই ঘটছে। কয়েকটি নমুনা: জনৈক জ্যামাইকান তাঁর ইংরেজ স্ত্রীকে নিয়ে ইয়ার মাউথ-এর একটি

হোটেলে গিয়েছিলেন। ওরা বলেছেন—এ হোটেল কালোদের জন্য নয়।…জনৈক ভারতীয় একটি 'পাব' থেকে শুকনো গলায় ফিরে এসেছেন। ওরা বলেছে—আমরা ইণ্ডিয়ানদের সার্ভ করি না।… স্মলহীথ থানা এলাকায় একজন ইস্টবেঙ্গল ম্যানকে আক্রমণ করা হয়েছে।…ত্থ'জন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক বলছে তারা কালোর অধীনে কাজ করবে না।…একটি কালো বালককে দত্তক নিয়েছিলেন এমন এক শ্বেতাঙ্গ দম্পতির বাড়ি আক্রমণ…মুদিওয়ালা বলেছে কালোদের কাছে আমি জিনিস বিক্রি করি না…লিস্টারে একজন কৃষ্ণাঙ্গ গৃহস্থের দরজায় জ্বলন্ত ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে, তলায় লেখা—ফ্রম 'কু-কুক্লস-ক্লান' টু 'অল ব্ল্যাক বাস্টার্ডস'। গুরনাম সিং নামে একজন শিখের কাছে চিঠি গেছে—তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। নীচে লেখা—'ইওরস ইন হোয়াইট সুপ্রিমেসি—'।…'মিস্টার এক্স অব স্মেথিক' শের আলিকে জানাচ্ছেন—আমি আমার সৈন্যদের বলে দিয়েছি—'বার্ন হিম আউট!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজের পাতায় প্রতিদিন 'প্রতিরোধ-সংবাদ।' কিন্তু আগন্তুকবাহিনী তবু অকুতোভয়। একের পর এক দুর্গ জয় করে চলেছেন তাঁরা। লণ্ডন সমেত আটাশটি ছোট বড় শহর আজ বলা চলে তাঁদের অধিকারে। কমপক্ষে তিন হাজার করে কৃষ্ণাঙ্গের বাস সেখানে। কোন কোন শহরে তাঁরা মোট জনতার শতকরা আট ভাগ কোথাও বা কালোর অনুপাত ফিফটি ফিফটি! স্বভাবতই ছায়া পড়েছে তার শহরের চেহারায়ও। দোকানে দোকানে ভারতীয়দের পছন্দের পণ্য ঠাঁই পাচ্ছে। পান মশলার দোকান বসেছে। লাউ কুমড়ো, কাচের চুড়ি, রসগোল্লা—বিলাতে কিছুই আজ আর দুষ্প্রাপ্য নয়। ক্লাবের নাম—'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড' অথবা শ্রীহট্ট সম্মেলনী…। রেকর্ড বাজছে ক্লাবে, খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে হিন্দী গানা—আ যাও প্যায়ারে মনকি মোর! সাইন-বোর্ডে হচ্ছে হিন্দী উর্দু হরফ। এমন কি বাংলাও। লণ্ডনের

কেন্দ্রে বাংলা সাইনবোর্ড—'গঙ্গা'। এলাকায় অন্যতম প্রিয় রেস্তরাঁ সেটি। মালিক, বলা অনাবশ্যক, বঙ্গজ।

এই বিজয় ভারত সন্তানেরা শুধু আপন হিম্মতে সম্পন্ন করেছেন, বলতে পারলে হয়ত তাঁদের কানে শোনাতে ভাল, কিন্তু দেখে শুনে স্বীকার করতেই হবে সাহেবরা যে হেরে গেলেন তার একটা কারণ সাহেবরা নিজেরাই। ওঁরা অদ্ভুত জাত। ইংরাজের চরিত্র সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল (দ্রষ্টব্য—'এক্সপ্লোরিং ইংলিশ ক্যারেকটার' লেখক—জিওফ্রি গোরের।) তাঁরা বলেন—এমন লাজুক জাত আর হয় না। ওঁরা নিজেদের মধ্যেই নিজেরা গুটি সুটি থাকতে চান,—'কিপ দেমসেলভস টু দেমসেলভস!' ওপাড়ার লোকও ওদের কাছে 'স্ট্রেনজার'—পরদেশী। ওঁরা নিজেরাই বলেন, এক পাড়ার লোক অন্য পাড়ায় গিয়ে স্থির হয়ে বসতে কমপক্ষে দশটি বছর চাই। পাড়ায় অচেনা সাদা মুখ দেখলে সাদারা চমকে ওঠেন, মনে মনে বলেন—এই আপদের দল আবার এল কোথা থেকে। গোরের লিখেছেন—ইংরাজরা দেশের ভেতর এলাকা বদল করে না তা নয়, কিন্তু আমেরিকান যদি বলে—দেখ, কত লোক এখান থেকে চলে গেল, তবে এঁরা বলবেন—দেখ, কত মানুষ একই জায়গায় ঠায় রয়ে গেল! ভারতীয় বা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের দেখে এঁদের পক্ষে দুয়ারে খিল এঁটে দেওয়া তাই বিস্ময়কর নয়। এই লাজুকতারই সুযোগ নিয়েছি আমরা। তার 'হোম. স্যুইট হোম'-এর শান্তি বিঘ্নিত না হলে কোন ইংরাজ কারও সঙ্গে বিবাদ করতে যায় না। সুতরাং সমস্যা যখন ওপাড়ায় তখন এ পাড়ার গৃহস্থ চুপচাপ।

কালোর ছায়া অবশেষে নিজের অঙ্গনেও পড়ল যেদিন সেদিন সাজ সাজ রব পড়ল বটে, কিন্তু তখন আবার উঁকি দিল বিবেক। ইংরাজের চরিত্রের এই আর একদিক, বিবেকের দংশন। সকলের হয়ত নয়, কিন্তু সর্ব আমলে দেখা গেছে কিছু সাহেব বলছেন—

'ইট ইজ নট ফেয়ার।' কালোদের পক্ষে অতএব সওয়াল করার লোকের অভাব নেই। অনেকের মতে সেই 'ঘরশত্রুদের' জন্যই হার মানতে হচ্ছে ওদের।

কাগজে কাগজে, বেতারে, টেলিভিশনে, পার্লামেণ্টে—সর্বত্র সোচ্চার এই 'ঘরশত্রুর' দল। বি বি সি-র মাইক্রোফোন-এর সামনে মুখ রেখে শ্বেতাঙ্গ মহিলা বলছেন—আমরা অত্যন্ত নীচ। আসলে আমরা কালোদের দোষ দিই নিজেদের নোংরামি গোপন করার জন্য। কে একজন শ্রমিক বলেছিলেন—কালোরা কাজ করতে চায় না। দেখবে, শুক্রবার সব এসে ভিড় জমাচ্ছে বেকার-ভাতার জন্য। অনুসন্ধানকারীর দল চলে গেলেন সেখানে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী দিচ্ছেন—হাঁ, কালোরাও আসে বই কি! তবে আমার থেকে জেনে নাও সাদাদের তুলনায় ওরা দেবদূত! সেবার দাঙ্গা হল। বিখ্যাত কাগজে কার্টুন—হাসপাতালে আহত শ্বেতাঙ্গদের চিকিৎসা করছেন কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার আর নার্সের দল,—ছবির নীচে মন্তব্য: ওঁরা শত্রু সন্দেহ কি! ক'জন বাঙালী ছেলেকে মারধর করে একটি টাইপরাইটার কেড়ে নিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ ছোকরার দল। 'গার্ডিয়ানে' ছাপা হল তাঁদের চিঠি। ফাইল উল্টে দেখছিলাম, ক'দিন পরে আরও একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। লেখকরা শ্বেতাঙ্গ। তাঁরা বলছেন—ছিঃ ছিঃ একি লজ্জার কথা! আমরা ওঁদের একটি টাইপরাইটার কিনে দিচ্ছি। ওই কাগজেই খবর দেওয়ালে বিরাট লিখন—'সেণ্ড দি ব্ল্যাকস হোম!' লেমিংটনের এক বৃদ্ধ যাজক হাজার দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে তার পার্শে আপন হাতে তুলিতে লিখছেন—'ফাদার ফরগিভ আস।'

কালোদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার চেষ্টায় লিবারেল-ব্রিটেনের উদ্যম কখনও কখনও অবশ্য হাস্যকর। একজন সাহেব লিখেছেন: আমরা, সাদা মানুষেরা যখন হাসি তখন হাসবার জন্যই হাসি, হাসিকে নিয়ন্ত্রণ করি। কালোদের বেলায় ঠিক তার উলটো, ওরা

যখন হাসে তখন বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ে। একটা কারণ হয়তো এই, ওদের দাঁত খুব সাদা, এবং সে জন্য ওরা এভাবে গর্ব প্রকাশ করে। আর একটা কারণ, আমার মনে হয়, বয়স হলেও ওরা শিশুই থেকে যায়। সেজন্যই শ্বেতাঙ্গদের উচিত শিশু-প্রতিম প্রথম এই কৃষ্ণাঙ্গ দলের দায়িত্ব নেওয়া।

আর একজনের উপাখ্যান শুনুন। আর্মস্ট্রং জোন্সকে 'কমনার' বললে অনেক সাহেব অভিমান করেন,—কেন, এই শব্দটার কি কোনও বিকল্প নেই? কিন্তু 'নিগার' নিয়ে যেন কারও বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা নেই। কাগজে পড়ছিলাম সার জেরাল্ড রিপোর্টারদের বলছেন—আমি যখন 'বিগ বাক্ নিগার' বলি তখন কালোদের প্রশংসাতেই বলি, ওদের অপমান করার জন্য নয়।—'নিগার' মানে নিগ্রো, 'বাক্' মানে বেশ বড়সড় পুরুষালি চেহারার,—তাই না?

আর একদিন কাগজেই দেখছিলাম—কাউকে 'কাউ' বা গরু বললেও ঠিক অপমান করা হয় না। কারণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনেক ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে—'দি কাউ ইজ এ ক্লিন অ্যানিমেল।' দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের একটি সুইমিং পুল-এ কালোদের স্নান করা বারণ। তাই শুনে খবরের কাগজের রিপোর্টার ছুটলেন সে দিকে। ম্যানেজারের ব্যাখ্যা—একে তোমরা কালার-বার বলছ কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা বোধহয় জান না—এখানে মেয়েরাও স্নান করে, আর তাঁদের গায়ের রঙ সাদা!

এ জাতীয় নানা উদ্যম ও উদ্যোগ। পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিচ্ছেন—২০০০ অব্দে দেশটা কালায় ছেয়ে যাবে সেটা গুজব, আমরাও সংখ্যায় বাড়ব। ব্রিটেনের দশাও ভবিষ্যতে আমেরিকার মত হবে, সে যুক্তির উত্তরে তাঁরা—বলছেন আমেরিকার এমন হয়েছে কেন, জান?—কালোদের প্রতি অবিচার করেছে বলে। সমাজতাত্ত্বিকেরা দেখাচ্ছেন—ব্রিটেন এক কূপমণ্ডুক। ছোট দেশ তো সুইজারল্যাণ্ডও তারা যদি এত এত বাইরের লোক

নিয়ে বাস করতে পারে তবে আমরা পারব না কেন? জাতি পাতি বিচার এক ধরনের বর্বরতা। অবশ্য কারও কারও অভিযোগ উইলসনও আসলে এক ধরনের 'রেসিস্ট' তাঁর কালো-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই তার প্রমাণ। এই অভিযোগ 'রেস রিলেসানস অ্যাক্ট' চালু করার পরও পুরোপুরি তুলে নেওয়া হচ্ছে না। আইন বৈষম্যের সব এলাকাগুলো স্পর্শ করেনি। কেনিয়ার ভারতীয়-পাকিস্তানীদের নাকের ডগায় দুয়ার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বরং বদনাম আরও বেড়েছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। আশ্চর্য এই, হাউস অব কমন্স এ তবু সেদিন এই 'কালো বিল'-এর বিরুদ্ধে ভোট পড়েছিল মাত্র বাষট্টিটি! তাহলেও একথা মানতেই হবে নানা মহলের আন্তরিক চেষ্টার ফলে সন্দেহের হাওয়া ক্রমে হালকা হয়ে আসছিল। সত্তরের নির্বাচন উপলক্ষে হাওয়া আবার উত্তাল। রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্ণ-বৈষম্যকে কাজে লাগাতে গিয়ে কত বছর আগে স্মেথিক এর স্বনামধন্য পিটার গ্রিফিথস নাজেহাল হয়েছিলেন। এখন নাকি সে আশঙ্কা নেই। দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যবধান ক্রমেই কমতির দিকে। অবশ্য দুই দলেই এমন এক গোষ্ঠী রয়েছে যাঁদের বিশ্বাস, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। —অ্যাঙ্গল, সেক্সন জুট ডেন নরম্যান এবং শেষ পর্যন্ত এই ধর আইবিশম্যান সবাইকে যখন মেনে নিয়েছি আমরা, তোমাদেরও নেব। ধৈর্য ধর। কালোর প্রতি শ্বেতবন্ধুর প্রতিশ্রুতি।

বি বি সি জানাচ্ছে—এ প্রতিশ্রুতি ফাঁকা কথা নয়। তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন দশজনের মধ্যে আটজন ইংরেজ এখন বলছে—কালোদের সঙ্গে কাজ করতে তাদের কোন আপত্তি নেই। দশজনে সাতজন বলছে—আপত্তি নেই ওদের সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে থাকতে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বিয়ে-শাদির ব্যাপারে। দশজনের দুজন মাত্র বলেছে—কালো জামাই মেনে নিতে রাজি! একজনের স্পষ্ট কথা: কোনও ইংরাজ মেয়ের পক্ষে

বিয়ে করা মানে জাতির অপমান। ক্রমবর্ধমান এই পাপচার নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা দরকার।

সবচেয়ে স্পর্শকাতর ওরা এই শেষোক্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে। আপত্তি অন্যতর সাদাদের ক্ষেত্রেও প্রবল। কিন্তু কালোদের প্রসঙ্গে প্রবলতম! কালো-বিরোধী আন্দোলনে, বলতে গেলে উত্তেজনার প্রধান উৎস এই সাদা-কালোর বিয়ে। ওদের অভিযোগ—কালোরা আমাদের মেয়েদের কেড়ে নিচ্ছে সাদা-কালো মিশতে মিশতে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত আর সাদা থাকবে না। দেশ হাফ-কাস্ট-এ ছেয়ে যাবে। দুই দল এক হওয়া মানে 'টু গেট দি ওয়ার্স্ট অব দি টু রেসেস', এর মধ্যে নেই আমরা। একজনের সাফ কথা—আফটার অল ইট ইজ এ ব্রিটিশ রেস লেট আস কীপ ইট হোয়াইট।' অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুজবও প্রচারিত হচ্ছে! কালোরা অবলা সাদা মেয়েদের ওষুধ খাইয়ে বশ করছে। পিটার গ্রিফিথস পর্যন্ত লিখেছেন—সেদিন মাঝ রাত্তিরের পর দুটি সাদা তরুণীকে কালোদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম! কোন কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে দেখলে লোকে আড়ালে হাসে। কানাকানি করে। অনেকের নাকি বিশ্বাস কালোর সংসর্গে একবার গেলে কালিমা নাকি আর ঘুঁচে না। তাদের ধারণা—পরে সাদার সঙ্গে বিয়ে হলেও যে-কোন সময়ে কালো সন্তান কোলে আসতে পারে। ধারণাটি পুরানো। উনিশ শতকে একে বলা হত—'টেলিগনি' (Telegony) বিজ্ঞানীরা আট দশক আগে জানিয়ে দিয়েছেন একটা সংস্কার। তবু নাকি ভয় কাটছে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন বাপ মায়েরাই, —কন্যারা নন। সরকারীভাবে সাদা কালোর বিয়ে অবশ্য খুব হচ্ছে না। কার্ডিফ-এর কোন কোন এলাকায়, নাবিকদের সংসার অবশ্য নানা রঙে রঙীন, লিভারপুলেরর কোন কোন জেলাও।

কিন্তু একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মিডল্‌ বারোতে বারো হাজার কৃষ্ণাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সাদা-কালোর পরিণয়ের ঘটনা মাত্র চল্লিশ। এতে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের আশ্বস্ত বোধ করার কোন হেতু নেই। কেননা, তাজমহল হোটেলের কর্মী হাসেম আমাকে সখেদে বলেছে—'তুইটা মেম আমারে শাদি করনের লাইগ্যা, কি কইবাম আপনেরের,—কি ঝুলাঝুলি!' বললাম—তা হলে করছো না কেন? উত্তর—'ইংলিশ গার্ল মাইনষে ঘরে আনে? জারমান আইলেও একটা কথা ছিল!' ওরা এখন শ্বেতপাত্রীদের মধ্যেও বদ্যি বামুন কায়স্থ রাঢ়ি অথবা বারেন্দ্র খুঁজছে।

হাসেম বানিয়ে বলেছে এমন মনে করার বোধ হয় কোন কারণ নেই। বিস্তর ইঙ্গিত মিলছে ইংরাজের এই শেষ দুর্গটির পতনও বোধহয় অবধারিত। ছোট্ট দুটি উক্তি।

'কালো অতুলনীয়। সাদা মানুষ যেন দুধের বোতল; কনভেয়ার বেল্ট বেয়ে চলেছে। ঘেন্না ধরে গেছে ওদের ওপর। 'কালোরা উষ্ণ, অন্তরঙ্গ। সাম লাইফ ইট হট, উই লাইক ইট ব্ল্যাক!...'

'ওরা সবাই ইংরেজদের চেয়ে ভাল!—কেন?—দে আর মোর প্যাসওনেট। দে কিস বেটার। ইংলিশ বয়েজ কিস উইথ দেয়ার মাউথ ওপেন,—অ্যাঃ! শুধু কি তাই?

English boys take so long to come to the point. You know what they want, but they hum and haw and it takes them two months before they screw up enough courage to ask you for a walk!

প্রথম জবানবন্দীটি লণ্ডনের পাতাল নিবাসী জনৈক পসারিণীর দ্বিতীয়টি ব্রাইটনের এক অষ্টাদশীর। সে কলেজে পড়ে।

॥ সমাপ্ত ॥